প্রথম অধ্যায়

সেবাসংযম-প্রতিমা মা

১

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। সকাল প্রায় সাতটা। ছোট জিতেন কর্মস্থলে গিয়াছেন। রাত্রিতে এখানে থাকেন জগবন্ধুর সহিত। বিনয়ও থাকেন। মনোরঞ্জন মাঝে মাঝে থাকেন।

শ্রীম দ্বিতলের বারান্দায় 'আশ্রমে' বসিয়া আছেন। কাছে বসা জগবন্ধু ও মণি। অভাবের তাড়নায় মণির মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। তাহার স্নানাহার ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছেন অন্তেবাসীকে। অন্তেবাসী নিজহস্তে রন্ধন করিয়া মণিকে খাওয়ান আর নিজে খান। মণি একা থাকিলে সারাদিন দক্ষিণ হস্তের মুষ্ঠি দ্বারা নিজের অঙ্গে আঘাত করেন।

মনোরঞ্জন আসিয়াছেন। একটু পর একটি বালক কতকগুলি লেংড়া আম লইয়া আসিল। বড় জিতেন শ্রীম-র সেবার জন্য পাঠাইয়াছেন। শ্রীম ছেলেটির সহিত দুই একটা মিষ্টি কথা বলিয়া তাহাকে একটি আম দিয়া বলিলেন, তুমি আমাদের 'thank you' (ধন্যবাদ) জানাবে জ্যেঠামশায়কে। আর আমটা খেয়ে ফেল। তারপর জগবন্ধু, মনোরঞ্জন ও মণিকেও আম খাইতে দিলেন।

দেখিতে দেখিতে অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি আসামে থাকেন, ডাক্তারী করেন।

আজ ২৯শে মে ১৯২৪ খ্রীঃ। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল। বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা একাদশী ১৯।৩৯ পল। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (মনোরঞ্জনের প্রতি) — আপনি এক্ষুনি খেয়ে ফেলুন আমটা। (খোসাটা ফেলিয়া দিতেছেন দেখিয়া) ফেলবেন না, ফেলবেন

না। নিচে গিয়ে খেয়ে আসুন। ওখানে জলের কল আছে। (একটু পর সেবকের প্রতি) দেখে আসুন দেখি সব ফেলে দিল কিনা। বোকা, আমের খোসাতেই মিষ্টি। আমরা খাই। যে এইটে রক্ষে করতে পারে না সে আরও ভাল জিনিস দিলেও রক্ষে করতে পারবে না। যে mentality-তে (মনোভাবে) আমের খোসা ফেলে দেয় সেই mentality-তেই অন্য ভাল জিনিসও ফেলে দিবে, রাখতে পারবে না। Extravagance (অমিতব্যয়িতা) একটা পাপ। ঠাকুর কাশীপুর বাগানে রয়েছেন অসুস্থ। সাবু খাবেন। একজন ছয় টুকরো লেবু নিয়ে এলো। ঠাকুর দেখেই বিরক্ত হয়ে বললেন, একি, এক টুকরো হলে হয়, অতগুলি কেন? ভক্তরা কত কষ্ট করে রোজগার করে এখানে দেয়! রাগ করলেন।

একদিন যোগেন স্বামীকে — তখনও স্বামী হন নাই — পান কিনতে বাজারে পাঠিয়েছেন। আলমবাজার। ইনি এক পয়সায় সাতটা পান এনেছেন। আর একজন বললে, দশটা পাওয়া যায় এক পয়সায়। অমনি বললেন, যা গিয়ে ফিরিয়ে দে। তোর যদি পয়সা অত বেশী হয় ঠিক ঠিক এনে না হয় পাড়ার লোককে বিলিয়ে দে। ঠক্‌বি কেন? ও একটা mentality (অভ্যাস) হয়ে যায়। মহামায়ার আক্রমণে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

মা ঠাকরুন গুচ্ছির দিলে রাগ করতেন। একদিন একজন অনেক সব জিনিস দিয়েছিলেন। মা বললেন, এত সব কেন? যার যেমন অবস্থা তেমনি দিলে বেশ। বেশী দিলে কি বেশী তুষ্ট হবেন? এটা যে extravagance (অপব্যয়)! একটা vulnerable point (বিরুদ্ধ সমালোচনা-ক্ষেত্র) আছে। সে point (নির্দিষ্ট পরিধি) ছাড়ালেই extravagance (অপব্যয়)। বেশী দিলেই কি বেশী ভালবাসা পাওয়া যায়?

কালীঘাটে একটি ছেলে এমন সব কথা কইতো, শুনলে অবাক্ হয়ে যেতো লোক। মাত্র ছ'বছরের শিশু — Godgifted (দৈব-শক্তিসম্পন্ন)। একদিন তাকে দেখতে গেলাম, সঙ্গে আমাদের বন্ধু

সতীশ মুখোপাধ্যায়। মা কালীর সামনে ভোগের অনেক জিনিস রয়েছে দেখে ঐ ছেলেটি বললে, মা এ সবে তুষ্ট নন — অন্তরের ভাবে তুষ্ট, ভক্তিতে তুষ্ট। শুনে আমরা অবাক! সুরেন নাম ছিল তার। এখন বড় হয়েছে, বিলেত ঘুরে এসেছে। চট্টগ্রাম কলেজের প্রফেসার। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে আসার কথা হচ্ছিল। আপত্তি উঠেছে, ব্রাহ্মণ না হলে হবে না। তা'হলে বিলিতি সাহেব হয়েছিলেন কি করে?

শ্রীম (মণিকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তদের প্রতি) — তিনি যখন ভাতের ব্যবস্থা করে দেন তখন cautiously (সাবধানে) না চললে কষ্ট অনিবার্য। তিনি বুদ্ধি দিয়েছেন কেন? না, তার best application (সদ্ব্যবহার) করবে বলে। সব উড়িয়ে দিলাম আর মুখে বললাম, তিনি যাই করেন তাই হবে — এ হলে দুঃখ ভোগ করতেই হবে।

সেবক — আমাদের একজন ফ্রেণ্ড আছেন, এ কথা বললে বলেন, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, ঈশ্বর জানেন।

শ্রীম (সহাস্যে ব্যঙ্গ করে) — হাঁ, তিনিই জানেন। কেন, তিনি তো তোমায় মন বুদ্ধি দিয়েছেন। তা খাটাও না কেন? এ কথা বললে তিনি শুনেন না।

আমাদের একজন কুটুম্ব আছে। তার ভাগে দুলাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছে। বাড়ির জন্য আরও কি সব পেয়েছে। রোজ বড়বাজার থেকে খাবার আসতো, মিষ্টি, সন্দেশ, বরফি, রসগোল্লা। বেশী হলে ফেলে দিত বাসি বলে। কিন্তু শেষে কি হলো? না, জামাইয়ের অন্ন খেয়ে বেঁচে আছে। উনি হলেন ডি. গুপ্তর নাত জামাই। পঁয়ত্রিশ টাকা পায় ওখান থেকে। এত সব টাকা-কড়ি ছিল যখন, সে সময় যা-তা করেছে। এখন ভুগছে। থাকে সময় না দেখলে এমন হতে হয়। এ সবই মা'র প্রসাদ। প্রসাদ গ্রহণ না করলে মাকে অবমাননা করা হয়। তার শাস্তি দুর্ভোগ।

একবার একজন সাধু দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। ঠাকুর মায়ের যে প্রসাদি লুচি পেতেন তা ঐ সাধুকে পাঠিয়ে দিলেন। সাধু রেগে ঐ

সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তিনি গোঁড়া বৈষ্ণব। দেবীর প্রসাদ খান না। ঠাকুর শুনে বড় রাগ করলেন। বললেন, 'শালা, মায়ের প্রসাদ ফেলে দিলে! ওকে যদি কেউ মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুব প্রহার করে তবে আমার খুব আহ্লাদ হয়।' তারপর তাই হলো। মালী, কি কার সঙ্গে ঝগড়া হলো, মেরে মেরে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলে।

তেমনি এ সব প্রসাদ। আশুবাবুকে মা কত দিলেন — টাকা-কড়ি, মান-সম্ভ্রম, পেন্‌সান, অবসর, বাড়ি ঘর, গাড়ী — সব। এ সব ছেড়ে তবুও গেলেন। মা আর কতবার দিবেন।

একজন ভক্ত শ্রীম-র হাতে আনিয়া আজের 'ফরওয়ার্ড' দিলেন। শ্রীম এই কয়দিন অনেকগুলি দৈনিক কাগজ পড়িতেছেন। আশুবাবুর জীবন-চরিত জানিবার জন্য ব্যাকুল। কাগজে চোখ বুলাইতেছেন আর হেডিং পড়িতেছেন। 'স্ত্রীলোকদের কাউন্সিলে ঢোকার কথা হচ্ছে।' 'বিলেতে পার্লামেন্টেও ঢোকার চেষ্টা চলছে।'

আর রক্ষা নাই। ভক্তরা প্রাণ খুলিয়া রাজনীতি আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। বিশ্রী রকমের কোচদাদের মত কথা বাড়িয়াই চলিয়াছে। শ্রীম নয়নহাস্যে মজা দেখিতেছেন। হঠাৎ চঞ্চল শিশুকে যেমন মা ফিরাইয়া আনেন তেমনি শ্রীম নিমেষে কথার মোড় ফিরাইয়া দিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কিন্তু মা ঠাকরুনের জীবন কিরূপ ছিল? কি শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁকে ঠাকুর, যখন কামারপুকুরে ছিলেন? কামারপুকুরে গিয়ে মাকে নিয়ে যেন গৃহস্থ আশ্রমের অভিনয় করলেন। লোকে মনে করতে লাগলো, গদাই এবার সংসারী হ'ল। কিন্তু তিনি মায়ের সঙ্গে সদা-সর্বদা ঈশ্বরীয় কথা কইতেন। কি ক'রে মা ঈশ্বরীয় জীবন যাপন করতে পারেন সর্বদা সেই উপদেশ, সেই শিক্ষা দিতেন। ঈশ্বরদর্শন মানব-জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, কি ভাবে জীবন যাপন করলে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, কি ক'রে ঈশ্বরভক্ত সংসারে সকলের সঙ্গে বাস ক'রেও মনে সর্বদা ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ভক্তি জাগরূক রাখতে পারে, এই সব আলোচনা দিন রাত্রি করতেন। আবার লৌকিক শিক্ষাও তিনি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভক্ত হবে সর্ববিষয়ে সুদক্ষ।

যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যার সঙ্গে যেমন তার সঙ্গে তেমন — স্থান, কাল, পাত্র বিচার ক'রে চলার শিক্ষা দিয়েছেন।

মা'র জীবন থেকে এ দু'টি শিক্ষা আমরা পাই — ব্রহ্মচর্য আর ঈশ্বরে তন্ময়তা। সংযম আর সেবা। ভগবান-বৈ তিনি কিছুই জানতেন না। সর্বজীবে ভগবানদর্শন করে তাঁর সেবা করতেন দিনরাত। মা যা বলে গেছেন সবই তো মন্ত্র। বড় বড় ইংরাজী জানা বিদুষী মেয়েরা — নিবেদিতা প্রভৃতি জোড়হাত করে বসে থাকতেন তাঁর পায়ের নিচে। এর অর্থ এই — মডার্ন ভাব, মডার্ন শিক্ষা তাঁর কাছে মাথা নীচু করে আছে।

স্মিত-বদনে শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সহাস্যে) — একজন ঠাকুরকে বললেন, ওকে (মাকে) মহাভারত পড়িও না। ওতে পঞ্চ-স্বামীর কথা আছে। স্ত্রীলোকেরা কেউ কেউ পঞ্চ-স্বামী করতে চায় কিনা! অমনি বন্ধ করে দিলেন মহাভারত। রামায়ণ পড়তে বললেন — আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে রামায়ণই পড়। ওটা ছেড়ে দাও। এর মানে, বই পড়ে কি হবে? ঈশ্বরকে ডাকাই আসল কাজ।

সন্ধ্যার পর শ্রীম ঠনঠনের মা কালীকে দর্শন, প্রণাম ও চরণামৃত গ্রহণ করিয়া ভক্তসঙ্গে মর্টন স্কুলে ফিরিতেছেন। সিটি কলেজের কাছে আসিয়া একজন ভক্তকে বলিলেন, আপনি kindly (দয়া করে) একে (নরেন্দ্রকে) হেয়ার প্রেস, মুড়ি-মুড়কির দোকান — ঠাকুরের এই সব আদি লীলাস্থল দেখিয়ে আনুন।

বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে লাহাদের বাড়ির বিপরীত ফুটপাথে — এখন যেখানে হেয়ার প্রেস, সেখানে খোলার ঘরে ঠাকুর প্রথম কলিকাতা আসিয়া থাকিতেন। তারই পশ্চিমে ঝামাপুকুর লেনের মোড়ের বিপরীত দিকে ছিল ঠাকুরের বড় ভাই রামকুমারের সংস্কৃত চতুষ্পাঠী। এখন সেখানে একটি রাধাকৃষ্ণ মন্দির। পূর্বে ছিল মুড়ি-মুড়কির দোকান।

শ্রীম-র আদেশে ভক্ত নরেন্দ্রকে প্রথমে এই দুইটি লীলাস্থল দেখাইলেন। তারপর আরও চারটি, ঝামাপুকুরের লীলাস্থল দেখাইলেন — রাজেন মিত্রের বাড়ি ও ২৭নং ঝামাপুকুর লেন। এখানে বিজয় গোস্বামীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন ঠাকুর। আর দিগম্বর মিত্রের প্রাসাদ এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। ভক্ত মর্টন স্কুলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শ্রীম দ্বিতলে 'আশ্রম'-গৃহে বসিয়া আছেন — মেঝেতে মাদুরের উপর। আর চারিদিকে ভক্তগণ। 'কথামৃত' পাঠ চলিতেছে। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা।

২

মর্টন স্কুল। 'আশ্রমের' বারান্দা, দ্বিতলে। এখন সকাল সাতটা। শ্রীম বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। পাশে অন্তেবাসী প্রভৃতি বসা। একটু পর শ্রীম 'ফরওয়ার্ড'-এ আশুবাবুর নানা গুণের কথা পড়িতেছেন। পড়া শেষ হইলে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — এদিককার great man (বড় লোক) কে? না, যার যত বেশী টাকাকড়ি, মান-সম্ভ্রম, বিদ্যাবুদ্ধি, বাড়িঘর, গাড়ী-ঘোড়া আছে। আর পরমহংসদেব কাকে বলতেন great man (বড় লোক)? যার ঈশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তি আছে, আন্তরিক যে তাঁকে ডাকে। এদিককার এদের যদি great man (বড় লোক) বল, তাহলে at the risk of your ideal (নিজের আদর্শকে খাট করে) বল। Ideal (আদর্শ) ছোট হয়ে যাবে। ও বলবার যো নাই। দশজনে বলে তাই আমরাও বলি, তা বললে আদর্শ নীচু হয়ে গেল। সে কেমন? ঠাকুর বলতেন, ব্রাহ্মণের বিধবা, পঁচিশ বছর ধরে ব্রহ্মচর্য পালন করে শেষে বাগদী উপপতি করলো।

এই কাগজ-টাগজ পড়া কেন? না, তাঁর কাজ দেখবার জন্য। দেখ না আজকালকার educational system (শিক্ষা-প্রণালী) কেমন। ছেলেবেলা থেকেই ছেলেরা শিখে কি? না, টাকাকড়ি, মান-সম্ভ্রম লাভ করে 'অমর হইয়া রহিব।' বিদ্যাসাগর মশায়ের বইতেও

এসব আছে। এতে আর কেমন করে ভাল হবে ছেলেরা? বিবেকানন্দ বলতেন, ‘ওগুলি ভুলে গেলে বাঁচি, কিংবা বমি করে ফেলে দিতে পারলে বাঁচি, বদরসগুলি।’

দেখ না, গুরু না থাকলে কি হয় তার দৃষ্টান্ত এই (আশুবাবু)। গুরু ভেদ বলে দেন। গুরু থাকলে ভয় নাই। তাই অল্প বয়স থেকে গুরুলাভ করলে বহু বিপদ কেটে যায়। ভাগ্যিস আমরা অল্প বয়সেই গুরুলাভ করেছিলাম। খুব fortunate (সৌভাগ্যবান) বলতে হবে। আমাদের সাতাশ বছর বয়সে গুরুলাভ হয়।

জগবন্ধু — আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে সদ্‌গুরু লাভ হয়।

শ্রীম — হাঁ। সে ইচ্ছাও তিনি দেন। সংস্কার থাকলে সে ইচ্ছা হয়।

শ্রীম (স্বগত) — ছেলেরা বললে, দু’ তিন লাখ টাকা পাওয়া যাবে, কেস্‌টা (case) নেও বাবা। আর আমরাও শিখতে পারবো। তিনিও এদের তেমনি শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — তাই ব্রহ্মচর্য শিক্ষা খুব দরকার। এর সঙ্গে সংযম, সত্য, সন্তোষ, এ সব এসে যায়। তারপর বিবেক-বৈরাগ্য, এসব কথারও অর্থবোধ হয়। সৎ অসৎ বিচার করাকে বিবেক বলে। ঈশ্বর সত্য, সংসার অসৎ অনিত্য, একে বলে বৈরাগ্য। এ সব চিন্তাধারার অভাব রয়েছে বর্তমান শিক্ষায়। প্রাচীন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অর্থাৎ গুরুগৃহে এ সব শিক্ষালাভ হতো। ফরেস্ট ইউনিভারসিটিতে গুরু-শিষ্য একসঙ্গে থাকতো। তখন দেখেশুনে হাতে এনে শিক্ষালাভ হতো।

আরামবাগের ভক্তের প্রবেশ। তিনি আসন গ্রহণ করিয়াই প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন।

আরামবাগের ভক্ত — সংসারে ভক্তের আসক্তি হয় কেন?

শ্রীম (সবিস্ময়ে) — কি বললেন?

আরামবাগের ভক্ত — সংসারে ভক্তের আসক্তি হয় কেন?

শ্রীম — আপনি জানেন যে লোকটির কথা বলছেন, তিনি ভক্ত?

আরামবাগের ভক্ত — আজ্ঞে হাঁ।

জগবন্ধু — Contradictory (পরস্পর বিরুদ্ধ)!

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, যে মিছরী-পানার আস্বাদ পেয়েছে অর্থাৎ ভক্তির আস্বাদ পেয়েছে, সে চিটেগুড়ের পানা খেতে চায় না। অর্থাৎ তার এদিককার ভোগ ভাল লাগে না। যে খাঁটি ভক্ত তার সংসারে আসক্তি থাকে না। যদি বা দেখা যায় সংসারে আছে, সে কেবল উপরে উপরে। ভিতর ফাঁকা। লোকশিক্ষার জন্য থাকে সংসারে।

আমরা আর কতটা দেখতে পারি? মার্টিনিউ বলেছেন, মানুষের ভিতর ladder of impulses (ভাবনার স্তর) আছে। আমরা সিঁড়িতে যতটা উঠেছি ততটাই বলতে পারি। এর উপরের খবর বলবো কি করে? তেমনি ঈশ্বরের অনন্ত কাণ্ডের খবর কতটা আমরা জানতে পারি?

শ্রীম আরামবাগের ভক্তের ব্যক্তিগত সংবাদ লইতেছেন — সংসারে কে কে আছেন, বিবাহ করেছে কিনা, লেখাপড়া কতদূর করেছে ইত্যাদি।

শ্রীম — আপনার পরিবারের দীক্ষা হয় নাই। দীক্ষা দিইয়ে দিন। ঠাকুর বলতেন, মেয়েরা ব্রত, উপবাস, পূজা-অর্চা, সৎগ্রন্থ পাঠ, এ সব করবে। আর দেখা হলেই দুজনে ঈশ্বরীয় কথা কইবে।

ঠাকুর বলতেন, বরং চৌদ্দ সের বীর্য বের হয়ে যাক্, তাও ভাল, তবুও একটা সন্তান না হয়। সন্তান না হওয়াই ভাল। এই দেখুন না, এখন বেশ আছেন। জমির ভাত আর মাস্টারীর কয়টি টাকাতে বেশ চলে যাচ্ছে। কিন্তু ছেলেপুলে হলে বাধ্য হয়ে বেশী রোজগারের উপায় দেখতে হবে। এই শান্তিটি আর থাকবে না। তারপর কি শুধু এই! ছেলে হলে তার শিক্ষা, মেয়ে হলে তার বিয়ে আছে। আবার কুপাত্রে পড়লে আরও কত কষ্ট। তাই বলতেন, সন্তান যাতে না হয়। হাঁ, আর যদি একান্ত না পারা যায় তা হলে না হয় একটি, বস্। তারপর ভাইবোনের মত থাকা।

ভক্তটি প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি) — মণীন্দ্রবাবুকে বলবেন, আপনার পত্র পেয়েছেন। আমাকে উত্তর পাঠিয়ে দিয়েছেন। পত্র আর দেন নাই। আমিই পত্র হয়ে এসেছি। এ পত্রে কথা কয় (হাস্য)।

কথামৃত ছাপা হইবে। কোন্ প্রেসে দেওয়া যায়, কাগজ কোথা থেকে খরিদ করা, এ সব কথার পরামর্শ করিতেছেন জগবন্ধুর সঙ্গে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সকল ধর্মের মিলনমন্দির জগন্নাথ পুরী

১

মর্টন স্কুল। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। শ্রীম দ্বিতলের ‘আশ্রমে’ মেঝেতে মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। স্টুডেন্টস্ হোম থেকে প্রীতিচৈতন্য আসিয়াছেন, তারপর ডাক্তার অক্ষয় আর শুকলাল। মণি ও অন্তেবাসী এখানে থাকেন। সুরপতি তাঁহার পিতা ও এক ভাইকে লইয়া আসিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বড় জিতেন, ছোট জিতেন, মোটা সুধীর, ছোট রমেশ, ডাক্তার বক্সী, বলাই, বিক্রমপুরের ভক্ত প্রভৃতি আসিয়া জুটিলেন।

শ্রীম সুরপতির পিতার সহিত পারিবারিক কথা কহিতেছেন — কয় ছেলে, কে কি করে, নিজে কি করেন এই সব। পিতার বয়স ষাটের কাছে। তিনি বলিতেছেন, ছেলেরা থাকিলেও কাজকর্ম সব তাঁহাকেই করিতে হয়।

শ্রীম (সুরপতির পিতার প্রতি) — কেন, ছেলেরা যখন লায়েক তখন আপনি অবসর নিলে পারেন। আমাদের বুড়োদের কি চৈতন্য হয়! দেখুন না, আশুবাবুকে। অত সুবিধা করে দিলেন ঈশ্বর, তবুও আবার দুই-তিন লাখ টাকার জন্য পাটনায় গেলেন। এমন কেউ ছিল না বারণ করে। ছেলেরাও বলছে, নেও বাবা নেও। নিজেদের ট্রেনিং নাই। তাই ব্রহ্মচর্য (আশ্রমের) দরকার। ওদের শিখিয়েছিলেন অর্থকরী বিদ্যা। তাই ওরাও ও-কথাই বলছে। বিবেক-বৈরাগ্য শিক্ষা হয় না ব্রহ্মচর্য আশ্রমের শিক্ষা না পেলে। বিবেক মানে সৎ অসৎ বিচার। তিনিই নিত্য আর সব অনিত্য এটা বৈরাগ্য। আজকালকার educational system (শিক্ষা-প্রণালী) বড্ড খারাপ।

সুরপতির পিতা — ঈশ্বরের নাম তীর্থে গিয়ে করা ভাল, কি বাড়িতে থেকে ভাল?

শ্রীম — সে গুরুকে জিজ্ঞেস করবেন। আমরা কি তা বলতে পারি? আমাদের বুদ্ধি কতটুকু! গুরুকে মানুষবুদ্ধি করলে কিছুই হবে না। মনে করতে হয়, ঈশ্বরই এই রূপ ধারণ করে আমাকে এই মন্ত্রটি দিলেন। 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥'

সুরপতির পিতা — গুরুর শরীর না থাকলে কাকে জিজ্ঞাসা করা?

শ্রীম — গুরুবংশের অপর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। ঠাকুর একটি গল্প বলতেন; একজনের গুরুর উপর ঈশ্বর-ভাবনা থাকায় ঈশ্বরদর্শন হয়েছিল। আবার গুরুকেও ঈশ্বরদর্শন করিয়েছিল।

এক বিধবা ছিল, বড় সরলা। তার গুরুর বাড়িতে পৈতে। শিষ্যরা সকলে মিলে উৎসবের সকল দ্রব্যাদি দিবে। বিধবাও বললে, সে দই দিবে। উৎসবের দিন ছোট একটি খুরিতে করে আধসেরটাক্ দই নিয়ে সে এলো। গুরুর বাড়িতে দুশো লোক খাবে। গুরু ঐ টুকুন দই দেখে লাথি মেরে খুরিটা ভেঙ্গে ফেললো। আর রাগে বললো, তুই নদীতে গিয়ে ডুবে মর। আমায় আজ এমনভাবে অপ্রস্তুত করলি হতভাগিনী? বিধবার কাছে গুরু সাক্ষাৎ ঈশ্বর। সে তখনই নদীতে ডুবতে গেল। কিন্তু যত এগিয়ে চলছে জলে ডুবার জন্য, জল আর হয় না। কোমর জল সারা নদীতে। তখন ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে আর বলছে, ভগবান, এই কি করলে, আমার গুরুবাক্য রক্ষা হল না! তখন ভগবান দর্শন দিয়ে ঐরূপ আর এক খুরি দই দিলেন আর বলে দিলেন, যত ঢালবে তত দই পড়বে। গুরু ঐ খুরিটা তার হাতে দেখে আবার ক্রোধে তিরস্কার করলে। বিধবা তখন খুরিটা উল্টিয়ে ধরলো। তখন বাড়ির অঙ্গন সব দইয়ে ডুবে গেল। গুরু তো অবাক! রইলো পড়ে তার ছেলের পৈতে আর ব্রাহ্মণ ভোজন। শিষ্যাকে বললো, মা, যে তোকে এটা দিয়েছে তাঁকে একবার আমায় দেখাবি। শিষ্যাকে

নিয়ে তখন নদীতীরে চলে গেল। ভগবান শিষ্যাকে দর্শন দিলেন। তখন শিষ্যা প্রার্থনা করলো গুরুকে দর্শন দিতে। ভগবান বললেন, সে হয় না। তার এই প্রথম জন্ম। আর তোর শেষ জন্ম। অনেক কান্নাকাটার পর গুরুকে একটিবার দর্শন দিলেন। এই গল্প থেকে এই শিক্ষালাভ হয়, গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করতে হয়।

শ্রীম (সুরপতির পিতার প্রতি) — দীক্ষা নেওয়া কি ফ্যাসান, দশজনে নিচ্ছে আমিও নিলুম! ঠাকুর বলতেন, ঝিনুক হাঁ করে বসে আছে, কখন স্বাতী নক্ষত্রের জল মুখে পড়বে। যেই পড়লো অমনি সোঁ করে অতল জলে ডুবে গেল। কেন? না, মুক্তা হবে যে ঐ একবিন্দু জলে। গুরুমন্ত্র তেমনি। গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়ে খুব নির্জনে চলে যেতে হয় কিছুদিন। দীক্ষার পর ক্রাইস্ট চল্লিশ দিন নির্জনবাস করেছিলেন বনে। 'জন দি বেপটিস্ট' দীক্ষা দিয়েছিলেন। কি খাবেন, কোথায় শোবেন এ সব কিছুই চিন্তা ছিল না। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন এই চল্লিশ দিন, কেউ তা জানতেও পারলো না।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ হইতেছে।

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, লোকের কথা আর কেন বল! কেমন জান লোক সব? একজন একটা কুয়া খুঁড়ছে। খানিকটা নীচে পাথর বের হয়ে গেল। অমনি ওটা ছেড়ে দিল। আর একস্থানে খুঁড়ছে। ওখানে বেরল বালি। ওটাও ছেড়ে দিল। আর একস্থানে খুঁড়ে পেল একটা গাছের গুঁড়ি। ওটাও ছেড়ে দিল। এ ব্যক্তির আর কুয়া খোঁড়া হল না। জলতৃষ্ণাও গেল না। তেমনি হয়ে পড়েছে দীক্ষা নেওয়া — যেন ফ্যাসান! রোখ্ চাই, বিশ্বাস চাই।

আমাদের বুড়োদের কথা আর বলবেন না। আমরা এত দেখছি তবুও কি আমাদের চৈতন্য হয়? আমরা কেমন জানেন? যেমন সাপের মুখে ব্যাঙ। ব্যাঙের খানিকটা শরীর সাপের মুখে, আর মুখটা রয়েছে বাইরে। সামনে একটা মাছি বসা। সে ওটাকে খেতে চেষ্টা করছে। নিজে যে সাপের মুখে, এক্ষুণি যে তাকে গিলে ফেলবে সে কথা ভুলে গেছে। আমাদের অবস্থাও তাই। মৃত্যুর মুখে যে আমরা

রয়েছি সে কথা ভুলে গেছি। টাকা টাকা করে সংসার নিয়ে মত্ত হয়ে আছি। দেখুন, সারদা মিত্র, আশু চৌধুরী, আশু মুখার্জী, তিন তিনটে example (দৃষ্টান্ত) — জজিয়তি ছেড়ে আবার ওকালতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। সবই অর্থের জন্য। আমাদের চৈতন্য হয় কৈ এত দেখে শুনেও? জাপানের ভূমিকম্পের সময় একটু চৈতন্য হয়েছিল। মুসলমানদের এতিমখানা ভেঙ্গে তেতাল্লিশটি শিশুর মৃত্যুর সময়ও একটু চৈতন্য হয়েছিল। আবার সব ভুল হয়ে গেল। যে কে সেই। এই দেখুন না, এই দুই আশুবাবুই কয়দিনের মধ্যে গেলেন। আশু মুখুয্যেমশায় নাকি বলেছিলেন পাটনায়, বেঘোরে আমার প্রাণটা গেল। কেন এসেছিলাম এখানে। আহা! কি মূল্যবান প্রাণ!

মহামায়া সব ভুলিয়ে দেন। এতসব দেখেও আমরা ভুলে রয়েছি। তাঁর মহামায়ার এমনি জোর। তাই ঠাকুর প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন। মা-কালীর মন্দিরের সামনে নাট মন্দিরের চাতালে বসে ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন — 'দেহসুখ চাই না মা। লোকমান্য চাই না মা। অষ্টসিদ্ধি চাই না মা। শতসিদ্ধি চাই না মা। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর এই কর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।' খ্রীস্টভক্তদের মত এইটি আমাদের 'লর্ডস প্রেয়ার' — ভগবদ্ প্রার্থনা।

শ্রীম আবার ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। আবার কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কর্ম কর্ম লোক করে। কর কর্ম। ঠিক ঠিক কর্ম করতে পারেন যিনি সিদ্ধ হয়েছেন। তিনি জানেন কোন্ কর্মে বন্ধন আর কিসে মোক্ষ। নেহাৎ কর্ম করতে হলে সিদ্ধপুরুষের অধীনে থেকে কর্ম কর। তাতে বন্ধনের ভয় কম। ভক্তির কর্ম ভাল।

কর্ম কি লোক ছাড়তে পারে? জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ, প্রার্থনা এ সবই কর্ম। তবে এ সব ভক্তির কর্ম। বন্ধনের ভয় কম। ভয় আছে সর্বদা। কোথা থেকে 'আমি'টা এসে সব পণ্ড করে দেয়। তাই শরণাগত হয়ে সদা প্রার্থনা — মা, ভুলিও না।

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশির ঘোষ মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে যেতেন। তিনি বেশ রসিক পুরুষ ছিলেন। একটি গল্প করতেন। একজন দেবীর তপস্যা করছে। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবী বললেন, বর লও। ভক্ত বললে, মা, ভারতের স্বাধীনতা দাও। তথাস্তু, বলে দেবী চলে যাচ্ছেন। যাবার সময় বললেন, তবে চারশ' বছর পর হবে। ভক্ত ত্রাসে বললে, ওমা, আমি যে তখন থাকবো না (সকলের হাস্য)! মহামায়া এই 'আমি' ঢুকিয়ে দেন — জানতেও পারে না লোক কি করে ঢুকলো। মহামায়ার কৃপা ছাড়া এই 'আমি'র হাত থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ঠাকুর তাই সঙ্কেত বলে দিয়েছেন, 'থাক শালা দাস-আমি হয়ে।'

আগে ঈশ্বরলাভ, কি কর্ম? আগে ঈশ্বরলাভের জন্য কর্ম। তারপর তাঁর দর্শন হলে, যদি তিনি আদেশ করেন তবে কর্ম করা। তা'তে বন্ধন নাই।

'বিশপ অব নরফোক' 'লণ্ডন টাইমস'-এ বেশ লিখেছিলেন। প্রথমেই বললেন, আমি জানি, আমি যা বলতে যাচ্ছি এতে অনেকে অসন্তুষ্ট হবে। তবুও না বলে পারলাম না। সত্য কথা বলতেই হবে। তিনি বললেন, এই যে তোমরা সব চার্চ করছো আর চাঁদা তুলছো এতে কি হচ্ছে? না, পরের টাকা দিয়ে নিজের সুবিধা হচ্ছে। চার্চের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্য উত্তম ঘর, ফার্‌নিচার, মোটর কার, চাকর-চাকরাণী—এ সব হচ্ছে। Apostolic Christianity (ক্রাইস্টের শিষ্যদের আচরণ) কি এইরূপ ছিল?

২

এখন সন্ধ্যা সাড়ে আটটা। ভাগবত পাঠ হইতেছে।

গোমতী-তীর। নৈমিষারণ্য আশ্রম। অতি পবিত্র, নির্জন স্থান। এখানে দ্বাদশবার্ষিকী সত্রে ভারতের সকল মুনিঋষি, তপস্বী একত্রিত হইয়াছেন। ব্যাসাসনে উপবিষ্ট পুরাণ-বক্তা সূত গোস্বামী। সূত গোস্বামী সমবেত মুনিবরদিগকে ভাগবতধর্মের বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কত সব কাণ্ড হয়ে গেছে ঐ সব মহাতীর্থে! কলিকাল এসে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করলেন। এখন যাগযজ্ঞ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ — এ সব সাধনা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই ভাগবতধর্ম বলছেন। ইহা ভক্তিযোগের অঙ্গ। একে শরণাগতি-যোগ বলা হয়।

ঠাকুরও বলেছেন, এখন যুগধর্ম ভক্তিযোগ। ভগবানের সঙ্গে একটা পাকা সম্পর্ক পাতিয়ে থাক শরণাগত হয়ে। কেন এ ব্যবস্থা? না, এ সময় লোকের আয়ু কম, অন্নগত প্রাণ, মন দুর্বল, সত্য রক্ষা করতে পারে না। এ অবস্থায় শরণাগত হয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? শরণাগতি-যোগ। শরণাগতি-যোগ মানে, নিজের দোষ নিজে জেনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা। ঈশ্বরকে ছেড়ে দিয়েও থাকতে পারে না, আবার তাঁর দেওয়া উত্তম ধর্মব্যবস্থাও পালনের শক্তি নাই! এই অবস্থায় শরণাগতি ছাড়া উপায় নাই। মনপ্রাণ সব ঈশ্বরে সমর্পণ করে সংসারে তাঁর দাস হয়ে থাকা উচিত। তাও পারছে না। কি করা উচিত আর করছি কি, এ বিচারও হয়েছে। এই সঙ্কটে তাঁর শরণ নেওয়া। প্রার্থনা করা, প্রভো, তোমার পাদপদ্মে আমার মন প্রাণ টেনে নাও। দোষ সব ক্ষমা কর।

ঈশ্বরের সঙ্গে একটা ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা। সংসারে কত রকম সম্পর্ক আছে — পিতা মাতা ভাই বন্ধু — এর একটা বেছে নিয়ে সেটা ঈশ্বরের সঙ্গে লগ্ন করা। আর সর্বদা ঐ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে সকল ব্যবহার করা; ডাকা, খাওয়ানো-পরানো সব। আমি তাঁর দাস, পুত্র, সখা, মাতা এর একটা হলেই হ'ল। একেই ভাগবতধর্ম বলে।

ব্রজ-গোপগোপীদের ছিল এই সম্পর্ক। ঈশ্বরের সঙ্গে শুদ্ধ প্রেম-সম্পর্ক।

রাত্রি এখন দশটা। কেউ কেউ চলিয়া গেলেন। শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গুরু সকলকে গুহ্যকথা বলেন না।

পাত্র দেখে তবে বলেন। কঠোপনিষদে 'শ্রেয়' আর 'প্রেয়'র কথা আছে — ঈশ্বরানন্দ আর বিষয়ানন্দ। যম নচিকেতাকে 'প্রেয়' নেবার জন্য বার বার বললেন। তিনি নিলেন না। 'শ্রেয়' চাইলেন। বললেন, 'প্রেয়' দিয়ে করবো কি? ওটাতো বরাবর থাকবে না। চাইতুম, তুমি যদি সামনে না থাকতে। তুমি তো সব হরণ করে নিয়ে যাবে। তাই 'শ্রেয়' চাই। এর মানে, মৃত্যু যে এই শরীরটা নিয়ে যাবে, তখন কে করবে বিষয়ভোগ? স্ত্রীপুত্র, রাজ্য, ধন-ঐশ্বর্য সব পড়ে থাকবে। সঙ্গে যাবে না কিছুই। সঙ্গে যাবে কেবল 'শ্রেয়' অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ। এই কঠোর পরীক্ষায় পাশ হওয়ায় যম তুষ্ট হয়ে বললেন, হাঁ বাছা, তুমিই ব্রহ্মজ্ঞানের যথার্থ অধিকারী। কি বীর! তিনদিন উপবাসী হয়ে পড়ে রইল, প্রেয় সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলো, তখন যম দিলেন ব্রহ্মজ্ঞান — উপযুক্ত পাত্র জেনে।

ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত কে — বেশ একটি গল্প বলে ঠাকুর বোঝাতেন। হাটে গেছে একজন গরু কিনতে। সঙ্গে নিয়ে গেছে একজন expert (অভিজ্ঞ লোক)। একটা গরু দেখতে বেশ সুন্দর আর হৃষ্টপুষ্ট। তার দাম জিজ্ঞেস করলে, বলে পাঁচ টাকা। আর একটা গরু দেখতে তত ভাল নয়, তার দাম বললে পঁচাত্তর টাকা। ক্রেতা বললে, সে কি কথা! এটার দাম অত কেন? ওটার চাইতে এটা দেখতে খারাপ। বিক্রেতা বললে, বেশ তো, তুমি ওটাই নেও না — পাঁচ টাকারটা। তখন expert (বিশেষজ্ঞ) বললে, এই দেখ কেন দামের তফাৎ। সে প্রথমটার ল্যাজে হাত দিতেই সেটা আরামে চোখ বুজে রইল। আর দ্বিতীয়টা ল্যাজে হাত পড়তেই ছিনিমিনি খেয়ে লাফিয়ে উঠলো। তেমনি মানুষ। সবই ঐ পাঁচ টাকার গরুর মত। আরাম চায় খালি। পঁচাত্তর টাকার মানুষ কয়টা মিলে?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর আর একটি গল্প বলে রোখ্ কাকে বলে তা বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এক কৃষক জমিতে জল আনবে খাল কেটে। মাটি কাটতে কাটতে অনেক বেলা হয়ে গেল। পরিবার মেয়েকে পাঠিয়ে দিলে বাপকে ডেকে আনতে আহারের

জন্য। কৃষক এলো না — মাটিই কাট্‌ছে। তারপর পরিবার নিজেই গেল — বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলো — ঘরে গিয়ে নেয়ে-ধুয়ে আহার করতে। দু'একবার বললে, না। জল এনে খাব। তবুও স্ত্রী জেদ করে বলছে, না এখনই চল। খেয়ে এসে কাজ করো। তখন রেগে কোদাল নিয়ে তেড়ে এল মারতে — তবে রে শালী, জল না আনলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। তখন ছেলেপুলে খাবে কি? তারপর সারা দিন মাটি কেটে জমিতে জল এনে তখন বাড়ি ফিরলো। পরিবারকে প্রসন্ন হয়ে বললে, কৈ গো, দাও না এবার তেল টেল, নেয়ে আসি। তখন তেল মালিশ করে, তামাক খেয়ে, নেয়ে এসে আহার করে। এখন নিশ্চিন্ত। তাই আরামে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে।

গুরু এমনি রোখ্‌ওয়ালা শিষ্য চান — করবো নয়তো মরবো, এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শিষ্য। তখন সব গুহ্য কথা বলেন। সবাইকে বলেন না।

যদি বল, আমাদের শক্তি কোথায় এরূপ হওয়ার? তার উত্তর — তাই তো গুরুকরণ! গুরুর শক্তির সঙ্গে নিজেকে জুতে দেওয়া — যেমন এঞ্জিনের সঙ্গে গাড়ী। তখন গুরুর শক্তিতে ভগবান লাভ হয়।

মহামায়ার সঙ্গে পারবার যো নেই। তাই তাঁর শরণাগত হয়ে বলা, মা, ভুলিও না। একদিকে গুরুশক্তি অপরদিকে প্রার্থনা, এই করে তাঁর দর্শন হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কলকাতায় পূর্বে ঘোড়ার ট্রাম ছিল। দুটো ঘোড়া গাড়ী টানতো। মোড় পার হওয়ার সময় আর একটা ঘোড়া জুতে দিতো। একে বলা হতো champion horse (সঙ্কটবিজয়ী ঘোড়া)। এইটিই হলো গুরু। নিজের শক্তিতে কুলোয় না বলেই গুরুর শক্তির সহায়তার দরকার। গুরুর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। ঈশ্বরই গুরু। মানুষ-গুরুতেও ঈশ্বরবুদ্ধি চাই।

শ্রীম মত্ত হইয়া গান ধরিলেন।

গান। দয়াল গুরুর নামে ভাসাও রে তরি মন আমার।

যদি পড় রে আবর্ত জলে ঊর্ধ্বে দুই বাহু তুলে,
বল হরি রইলে কোথায় ভবের কাণ্ডারী। ইত্যাদি।

এই তেজবীর্যহীন কলিকাল। এখন গুরু না হলে উপায় নাই। তাই ভগবান এইমাত্র গুরু হয়ে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। ঠাকুর জগদ্‌গুরু। তাঁর আশ্রয় নিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে চল। তিনি যে বলছেন, 'আমায় ধর। ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব আমি।'

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের 'আশ্রম'। সকাল ন'টা। শ্রীম বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। পাশে জগবন্ধু, নরেন্দ্র ও একটি বালক। একটু পরই বিক্রমপুরের কালী মাস্টার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীম তাঁহার সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (কালী মাস্টারের প্রতি) — ঠাকুর কেশব সেনের ওখানে গেছলেন। ফিরে এলে ভক্তরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন দেখলেন? প্রথম ঠাকুর কোনও উত্তর দেন নাই; পীড়াপীড়ি করায় বললেন, কেমন দেখলাম জান? পঞ্চবটীতে একদিন কতকগুলি বাঁদর দেখলাম চুপচাপ বসে আছে, উকুন বাচছে, বেশ শান্তশিষ্ট। ঝাউতলা থেকে ফিরে আসার সময় দেখি, দারোয়ানরা সব লাঠি নিয়ে ওদের তাড়া করছে। আর বাঁদরগুলো এ গাছের ফল, ও গাছের ফল খেয়ে খেয়ে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। আগের মত আর শান্ত নাই।

তখন তো দেখলাম সব শান্ত হয়ে বসে আছে। কিন্তু যখন সমাজ-মন্দির থেকে বেরোবে তখন চারদিকে আবার দৌড়াদৌড়ি করবে। একে ও গালি দিবে, এর নিন্দা ও করবে, মিথ্যা কথা বলবে।'

পরে আমাদিগকে গল্পচ্ছলে এ সব কথা বলে আনন্দ করতেন।

৩

রাত্রি আটটা। শ্রীম দ্বিতলের 'আশ্রমে'র ঘরে মাদুরের উপর বসিয়া আছেন পূর্বাস্য। তিনদিকে অনেক ভক্ত। বড় জিতেন, মণি, অক্ষয় ডাক্তার, বড় অমূল্য, মোটা সুধীর, বিক্রমপুরের ভক্ত, জগবন্ধু প্রভৃতি আছেন। কর্পোরেশন স্ট্রীটের একজন শিক্ষকও একটু পর

একজন সঙ্গীসহ আসিয়া বসিয়াছেন।

বড় জিতেন ঁজগন্নাথের টাট্‌কা প্রসাদ আনিয়াছেন। শ্রীম পায়ের চটি জুতা ছাড়িয়া, প্রসাদের পাত্রটি যুক্ত করে ধরিয়া মাথায় ঠেকাইলেন ও এককণা মুখে দিলেন। ভক্তগণও দর্শন-স্পর্শন ও প্রণাম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ সকলে ধারণ করিতেছেন। ঠিক এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন চারিজন সন্ন্যাসী বেলুড়মঠের — স্বামী অরূপানন্দ, নির্বেদানন্দ, সদ্ভাবানন্দ ও সন্তোষানন্দ। শ্রীম তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া বসাইয়া আনন্দে ঁজগন্নাথের মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এই মহাপ্রসাদ একেবারে টাট্‌কা। আজই লোক এসেছে পুরী থেকে। ঠাকুর বলতেন, কলিতে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। গঙ্গাজল আর বৃন্দাবনের রজঃকেও বলতেন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। তাঁর কি দৈবদৃষ্টি ছিল আমরা কি করে বুঝবো। নিজের বিছানার পাশে একটি বটুয়াতে মহাপ্রসাদ থাকতো। রোজ সকালে প্রণাম করে একদানা খেতেন। ভক্তদেরও দিতেন। কেউ নিতে না চাইলে বলতেন, ‘খাও, এতে ভক্তিলাভ হয়’। স্বামীজীকে দিতে গেলে প্রথম নেন নাই। পরে যখন বললেন ‘তুই দ্রব্যগুণ মানিস তো — ত্রিফলা খেলে পেট ছাড়ে আর আফিং খেলে আঁটে? তেমনি এই মহাপ্রসাদ। এ খেলে ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি বাড়ে’। তখন স্বামীজী খেলেন।

অনেকবার বলেছেন আমাদের, ‘আমিই পুরীর জগন্নাথ’। আমাদের কয়েকবারই পুরী পাঠিয়েছিলেন। কি করতে হবে এসব বলে দিতেন। একবার বলে দিলেন, জগন্নাথকে আলিঙ্গন করবে। মহা ভাবনায় পড়লাম কি করে হয়! তখন আলিঙ্গনের সময় নয়। শেষে এক বুদ্ধি তিনি মনে জাগ্রত করে দিলেন। অনেকগুলি রেজকি পয়সা, কিছু টাকাও ছিল, পকেটে করে নিয়ে গিয়ে সব নিচে ছড়িয়ে ফেললাম গর্ভমন্দিরে। পাণ্ডারা সব ঐসব কুড়ুচ্ছিল আর আমি এই ফাঁকে রত্নবেদীতে উঠে আলিঙ্গন করলাম। কেউ কেউ দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে উঠলো। আমি ফস্‌ করে নেমে প্রদক্ষিণ করতে

লাগলাম। অন্ধকারে কেউ বুঝতে পারলে না — কে!

যিনি আমায় বলে দিয়েছিলেন তিনিই বুদ্ধি দিলেন আবার তিনিই পাণ্ডাদের ভিতর লোভ দিয়ে ওদের সরিয়ে দিলেন। এখন ভাবলে অবাক হই, কি করে এ অসীম সাহসের কাজ করেছিলাম!

ঠাকুরের শরীর থাকতে কয়েকবারই আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে যেতেন না। বলতেন, ওখানে গেলে এ-শরীর থাকবে না। তাই নিজে যেতেন না। আবার চৈতন্য অবতারের সব স্মৃতি রয়েছে কিনা! সেই সব পূর্ব-লীলার কথা স্মরণ হলে মহাভাবে শরীর চলে যেতে পারে তাই যেতেন না। গয়াতেও যান নাই। বলেছিলেন, ওখানে গেলে শরীর যাবে। ওখান থেকেই নারায়ণ মানুষ হয়ে এসেছেন, তাই।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — এমনি রং ধরিয়ে দিলেন ঠাকুর — জগন্নাথের টাট্‌কা প্রসাদের জন্য হাওড়া পুলের উপর গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। পুরী থেকে যাত্রী আসছে। প্রসাদ চাইলে কেউ দিত, কেউ বলতো অনেক বান্ধন-ছান্ধনের মধ্যে রয়েছে মশায়, এখন খোলা যাবে না (হাস্য)।

ঐ পুরীতে কত কাণ্ড হয়েছে! বুদ্ধদেবের স্মৃতিও রয়েছে। এখনও তাঁর একটি মূর্তি আছে সূর্য-মন্দিরে। দেয়াল দিয়ে ঢেকে রেখেছে। পাণ্ডারা বলে, ভৈরবের মূর্তি। কিন্তু আসলে ওটা বুদ্ধমূর্তি। ওখানে বুদ্ধদেবের দন্ত-মন্দিরও নাকি ছিল।

আবার কেউ কেউ বলে, জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের relics (দেহাবশেষ) আছে। নব কলেবরের সময় ঐটি পুরানো জগন্নাথের মূর্তি থেকে খুলে নূতন মূর্তির ভিতর রাখে। কেউ এটিকে আবার বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ বলে। পুরাণের মতে এটি নাকি শ্রীকৃষ্ণের নাভি। বার বছর পর নব কলেবর হয়।

শঙ্করাচার্য গোবর্ধন মঠ করেন ঐ মন্দিরেই। এখন যেটি ছত্রভোগের ঘর সেটি নাকি আদি গোবর্ধন মঠ। পরে অন্যত্র যায় মঠ। রামানুজও সেখানে গিছলেন। এখনও সেখানে রামানুজী বৈষ্ণবরা

বেশ প্রভাবশালী। আবার মাধ্বাচার্যও এসেছিলেন। চৈতন্যদেব তো মাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব। দেখা যাচ্ছে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত সকল মতেরই স্থান ওটি। বৌদ্ধরাও সেখানে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন তো বিশাল হিন্দুধর্মের অঙ্গ। মুসলমান আর খ্রীস্টানদের প্রভাব বুঝি ওখানে পড়ে নাই! কালাপাহাড় খালি ধ্বংসই করেছে মন্দির। ধর্মপ্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই।

মুসলমান আর খ্রীস্টানগণ ওখানে প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও তাদের সামাজিক উদারতার প্রভাব সেখানে লক্ষিত হয়। ওখানে ঐ মন্দিরে সাধারণভাবে জাতিভেদ নাই। সব জাতের লোক যাচ্ছে, একসঙ্গে বসে মহাপ্রসাদ খাচ্ছে। শুনতে পাওয়া যায়, কোন কোন শ্রেণীর লোককে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এই সামাজিক উদারতা অবশ্য হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত উদারতারই বাহ্য প্রকাশ। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ', এ সব উদার ভাব। আবার ঠাকুরের কথা 'ভক্তের জাত নাই।' এই উদারতা, জাতিভেদের ও 'মহাপ্রসাদের' উচ্ছিষ্টতা বিচারের অভাব, মনে হয় চৈতন্যদেবের প্রভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

ঐ মন্দিরে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন, শাক্ত-বৈষ্ণব-গাণপত্য-শৈব সকলের একত্র সমাবেশ। মুসলমান ও খ্রীস্টানদেরও হয়তো কালে ঐখানে সমাবেশ হতে পারে। কিছুই আশ্চর্য নাই! উদারতার সত্যিকার প্রকাশে সকল সংকীর্ণতার অভাব।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — ঠাকুর মুসলমান ও খ্রীস্টধর্মের সাধনেও সিদ্ধ। কেন তাঁর ঐ সাধন, ভবিষ্যৎ জগৎ আরও স্পষ্ট করে তার উত্তর পাবে। চৈতন্যদেবের মুসলমান ভক্ত ছিল। চৈতন্যদেব, গুরু নানক, কবির এঁদের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম হিন্দুধর্মের অনেক নিকটে এসেছে। তখন খ্রীস্টান-প্রভাব ছিল না ভারতে। তাই ওঁদের সঙ্গে এই ধর্মের ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। হয়তো ঠাকুরের ভিতর দিয়ে এ মিলনটির প্রকাশ হবে। নমুনা তার দেখা যাচ্ছে। স্বামীজীর আমেরিকা-ইউরোপ বিজয় হয়তো তার সূচনা। সর্বধর্মের সকল

লোকের অন্তরের মিলনটি ঠাকুর করে গেছেন সূক্ষ্মে। বিশালভাবে এই বাহ্য মিলনটি কিছু সময়-সাপেক্ষ। ঐটি যেদিন হবে সেদিনই যথার্থ বৈদিক ধর্মের প্রকাশ হবে অন্তরে ও বাহিরে। ‘একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি’ ঋক্‌বেদের এই মহাবাক্যটি সেদিন মূর্তি পরিগ্রহ করবে।

শ্রীম (স্বামী নির্বেদানন্দের প্রতি) — জগন্নাথের মন্দিরে বসে থাকলে ভারতের সকল প্রান্তের লোক দেখা যায়। নিত্য আসছে যাচ্ছে।

চৈতন্যদেব কি অমানুষিক দেবজীবন কাটালেন পুরীতে! শেষের বার বছর একেবারে মহাভাবে ডুবে থাকতেন সর্বদা। মহাভাব অবতারাদির হয়, জীবের হয় না। ঠাকুরের হয়েছিল। তারপর হরিদাস, কত বড় মহাযোগী! রোজ তিন লক্ষ জপ করে তবে জলগ্রহণ করতেন। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, গদাধর — এঁরা সব মহাযোগী। চৈতন্য পরিবারের সকলের প্রভাব ওখানে রয়েছে। চৈতন্যদেবের ঐ স্পর্শের জন্যই জগন্নাথের অত আকর্ষণ। তিনি সদা ডুবে থাকতেন ব্রহ্মসমুদ্রে। তেমনি যে ডুবতে চায় আর চেষ্টা করে সে তাঁর স্পর্শ পায়। অত গভীর ভাবের স্পর্শ আছে বলেই মানুষ ওসব স্থানে গিয়ে শোক-তাপ ভুলে যায়। ওখানে হাওয়াতে ঐ গভীর ঈশ্বরীয় ভাব সঞ্চারিত। শোক-তাপের জ্বালায় যখন মানুষের সংসারাসক্তির ভাঁটা পড়ে তখনই মন যায় ঈশ্বরে। ঐ সময়ে এ সব মহাতীর্থ অমৃতের মত জীবন দান করে নূতনভাবে। যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত ঈশ্বরীয় স্পর্শ লাভ করে। ঐ স্পর্শ যার জীবনে চব্বিশ ঘন্টা জাগ্রত জীবন্ত হয়, তাঁকেই বলে অবতার। মহাপুরুষেও ঐ স্পর্শ থাকে। কিন্তু অবতারে বেশী প্রকাশ। ঠাকুরকে আমরা বিশেষভাবে watch (পর্যবেক্ষণ) করেছি চব্বিশ ঘন্টা ধরে, কিন্তু কখনও এক মুহূর্তের জন্যও ঐ ভাব থেকে বিচ্যুত হতে দেখি নাই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ‘মা-মা’ বলে ডাকছেন। জড় ও অচেতন ভাব জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্ত অবস্থাতে যেন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল তাঁ’তে। ঠাকুরের স্থূল শরীরটা — হাড়-মাস-চামড়া-কেশ-লোম-নখাদিও যেন

চৈতন্যময় হয়ে গিছলো।

ঐ দিকের ঐশ্বর্য চাও তবে এদিককার সব ছাড়তে হবে। দুটো একসঙ্গে চলে না। তাঁর দর্শন হলে, তাঁর আদেশ হলে সংসারে থেকেও কেহ কেহ ঐ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে।

শ্রীম সাধুদিগকে আম পরিবেশন করিতেছেন। এখন রাত্রি সাড়ে ন'টা। সাধু ও ভক্তগণ প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন।

শ্রীম তাহাদিগকে বলিতেছেন — ঠাকুর কখনও কখনও কড়া কথা বলতেন, কারো feeling wound (ভাবে আঘাত) করতে নয়। তাঁর এক একটা কথা মানুষকে দেবতা বানিয়ে দিয়েছে। তাঁর কথা সব যেন মানুষরূপ ধারণ করেছে! তিনি সকলের প্রিয়, সকল তাঁর প্রিয়।

মর্টন স্কুল আশ্রম, কলিকাতা।
৩১শে মে, ১৯২৪ খ্রীঃ, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ সাল।
শনিবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ২৮।১৬ পল।

তৃতীয় অধ্যায়

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সন্দেশ

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের 'আশ্রমের' বারান্দা। এখন সকাল আটটা। শ্রীম বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। পাশে ছোট নলিনী, মণি, জগবন্ধু ও বিনয় বসা। বিনয়ের দেশ কৃষ্ণনগর। সেখানে দিন কয়েক হয় গিয়াছিলেন। গত রাত্রিতে ফিরিয়া জগবন্ধুর সহিত এখানেই রাত্রিবাস করিয়াছেন। শ্রীম বিনয়ের সহিত দেশের কথা কহিতেছেন। আজ ২রা জুন ১৯২৪, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, সোমবার, অমাবস্যা ৩৫।৫৫ পল।

প্রায় নয়টার সময় বেলুড় মঠ হইতে ব্রহ্মচারী ভৈরবচৈতন্য আসিয়াছেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। ইনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের জীবন-কথা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীম ব্রহ্মচারীকে লইয়া চারতলার ঘরে প্রবেশ করিয়া চেয়ারে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়াছেন। অন্তেবাসী শ্রীম-র নির্দ্দেশমত ব্রহ্মচারীকে দুইটি আম ও দুইটি রসগোল্লা খাইতে দিলেন। শ্রীম মঠের সংবাদ লইতেছেন। জলযোগের পর ব্রহ্মচারী শ্রীমকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী — আপনার বাবার নাম কি?

শ্রীম (বিরক্তির সহিত) — ও দিয়ে কি হবে? ওর দরকার নাই।

ব্রহ্মচারী — কোথায় পড়েছেন?

শ্রীম — হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। Born in 1854, 14th July, Friday (১৮৫৪ খ্রীঃ-এর ১৪ই জুলাই শুক্রবার দিন)। আর ঠাকুরকে দর্শন হয় 1882 (১৮৮২ খ্রীঃ)। আমার বয়স তখন ২৭/২৮।

ব্রহ্মচারী — বাল্যকালের কিছু ঘটনা বলুন, বিশেষ বিশেষ ঘটনা।

শ্রীম এ সব কথা বলিতে অনিচ্ছুক। তথাপি বার বার পীড়াপীড়ি করায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন।

শ্রীম — এ সব কথার কি কাজ? ঠাকুরের সঙ্গে যেখানে সম্পর্ক সেটাই নিন্। মানুষের মন, ঠাকুর বলতেন, হাব্জা-গোব্জাতে ভর্তি। তার উপর আবার এ সব দিয়ে ভার বৃদ্ধির দরকার কি? তাঁর জীবনের সঙ্গে যেখানে আমাদের সম্পর্ক তাই লিখুন। এ সবে কাজ নাই — অসার কথায়।

ব্রহ্মচারী — এ সবেরও দরকার আছে বৈকি।

ব্রহ্মচারী ঘটনার জন্য জেদ্ করিতেছেন।

শ্রীম (দৃঢ়কণ্ঠে) — ও! আপনি বুঝি সকলের জীবনেরই এই সব কথা লিখে এনেছেন? ছি ছি, ওসব কথায় কি হবে?

ব্রহ্মচারী — লোক ক্রমবিকাশ দেখতে চায়, শুধু সত্য ধরতে পারে না।

শ্রীম — লোকের পড়ার জন্য আর বাহবার জন্য বই লেখা! ছিঃ।

আমার জীবনের greatest event (সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা) যদি জিজ্ঞেস করেন — তা হচ্ছে পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আহা, মাইকেল epitaph-এ (সমাধি স্তম্ভের লেখা) বেশ লিখেছেন, কি rhythmical (ছন্দোময়)। আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। (অন্তেবাসী দেখিলেন শ্রীম-র শরীর রোমাঞ্চিত)। — 'পিতা রাজনারায়ণ মাতা জাহ্নবী'। (ব্রহ্মচারীর প্রতি) আমার পিতার নাম শ্রীমধুসূদন।

ব্রহ্মচারী — কি করতেন?

শ্রীম — হাই কোর্টে কাজ করতেন।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি) — লিখুন, বরানগরে ভগ্নীর বাড়িতে তিন চারদিন থাকিয়া বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুরের দর্শনলাভ হয়।

ব্রহ্মচারী — ভগ্নীপতির নাম কি?

শ্রীম — কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদার। ঠাকুরের পরিচিত। ওখানে যাতায়াত ছিল। ঠাকুরের চিকিৎসক।

ব্রহ্মচারী — ক'ভাই আপনারা?

শ্রীম (উত্যক্ত হইয়া) — ছি ছি, ওসব কি গা? ঠাকুর কি কারুকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমার বাবা কি করে, ভাই কি করে, এ সব কথা? তবে কেন আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করছেন এ সব কথা? আপনি যখন প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন বাবার নাম কি, তখনই আমি বলতে যাচ্ছিলাম — পরমহংসদেব। কিন্তু আপনি চান দেহটা কোত্থেকে এয়েছে, তাই ওটা বললাম।

Life (জীবনী) লেখা কি এই ঘটনার পর এই ঘটনা? Life (জীবনী) হলো history of one's mind and soul (একজনের মন ও আত্মার ক্রমবিকাশের কাহিনী)। আর সে তো চার পার্ট* 'কথামৃতে'ই রয়েছে। ঐ বইতে খুঁজলে সব পাবেন।

তবে ওটা আপনার কর্ম নয় — এই থেকে সব বের করে একটি মালা গাঁথা।

মেকলে বলেছিলেন, বসওয়েলের life-এর (জীবনীর) দরকার কি? জনসনের life-এর (জীবনীর) সঙ্গেই উহা গ্রথিত রয়েছে।

'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর এডিটার এন.এন. ঘোষ বলেছিলেন — আমাদের বইয়ের ('কথামৃতের') সম্বন্ধে opinion (মত) দিবার সময় — It was only once in the history of the world (জগতের ইতিহাসে অমনভাবে জীবনী লেখা একবার মাত্র ঘটেছিল), যখন বসওয়েল ডক্টর জনসনের জীবনী লেখেন। তা, সে হলো একজন literary man-এর (সাহিত্যিকের) জীবন-কথা। আর এ কার কথা? যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে দিবানিশি কথা কইতেন, কখনও একঘর লোকের সামনে। যিনি নিজেকে নিজেই প্রকাশ করে বলেছিলেন,

---

*পঞ্চম ভাগ পরে লেখা হয়।

এই শরীরে সচ্চিদানন্দ অবতীর্ণ হয়েছেন।

এর ভিতরই তো সব রয়েছে। (কথামৃতের দিনলিপি দেখাইয়া) এই সূচী, এতে সমগ্র life-টা (জীবনী) রয়েছে — the unfoldment of the mind and soul (মন ও আত্মার ক্রম-উন্মোচন)।

এই সবগুলি সিনেতে আমি present (উপস্থিত) ছিলাম। কিভাবে mind-এর (মনের) উপর influence (প্রভাব বিস্তার) করেছে ঐ সব সিন ও বাণী, এতে সব লেখা আছে।

রেনোল্ডের life (জীবনী) সম্বন্ধেও বলা হয়েছে, এর আবার আলাদা life (জীবনী) লেখার দরকার কি? এ সব যা আছে চার্চে সবই life (জীবনী)। এ দিয়েই একজনের মনের influence (প্রভাব) বোঝা যায়।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি) — এইটা লিখতে পারেন, ঠাকুর বলেছিলেন, তোমার সংস্কার ছিল। তাই (আমাকে) ভাল লাগছে। অন্য কোথাও যেতে দিতেন না। তখন ঠাকুরের কাছে এক বছর যাওয়া আসা করছি, খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ। সে সময় একবার কেশব সেনের ওখানে দুর্গাপুজোর তিনদিন গিছলাম। ঠাকুর সব শুনলেন, খুব মনোযোগ দিয়ে। তারপর কি, তারপর কি, জিজ্ঞেস করে করে। ওমা! শেষে বললেন, 'তুমি অন্য কোথাও যাবে না, শুধু এখানেই আসবে।' আমি শুনে তো একেবারে অবাক! যিনি এমন catholic view-র (উদার মতের) লোক তিনি এমন কথা বললেন ভেবে একেবারে shocked (স্তম্ভিত)!

এও লিখতে পারেন, স্কুল ও কলেজে পড়ার সময় ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আসা করতাম।

ঠাকুর বলতেন, 'ইংলিশম্যানরা' যেকালে আসছে, এর (নিজের) ভিতর কিছু আছে। তিনি 'ইংলিশম্যানই' বেশী টেনেছিলেন এবার। মণি মল্লিক একদিন বসা। আমি জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদে একেবারে ঘর্মাক্ত কলেবরে উপস্থিত। তাই দেখে এই কথা বলেছিলেন।

বরাবরই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামবাজার স্কুলে হেড্ মাস্টার

ছিলাম যতদিন ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেছি। এর আগে নড়াইল স্কুলে আট-নয় মাস হেড মাস্টার ছিলাম।

ব্রহ্মচারী — আর কোথায় কোথায় পড়িয়েছেন?

শ্রীম — ওসবের দরকার নাই।

ব্রহ্মচারী — মর্টন ইনস্টিটিউসনের origin (উৎপত্তি) কিরূপে?

শ্রীম — না, ওতে কিছু হবে না। যতটা বলবার তা বললাম। হাঁ, এটা লিখুন, ঠাকুর যাবার পর বাবা দেহ রেখেছেন 1889-এ (১৮৮৯-এ)। মা আগেই চলে গেছেন — 1880-তে (১৮৮০-তে)।

(ক্ষণকাল ভাবিয়া) দেবদেবীতে সর্বদাই বিশ্বাস ছিল।

শ্রীম (সকলের প্রতি সহাস্যে) — শেষে পিসিমা যা বলেছিলেন তাই হলো। ইংরেজীপড়া লোক, জিজ্ঞাসা করছে, এ সব কি দিচ্ছ পিসিমা? পিসিমা তুলসীতলায় পিদীম দিচ্ছিলেন। পিসিমা উত্তর করলেন, কি করি বাবা, আমি মুখ্খু। এই আমার সম্বল। আশীর্বাদ কর তুলসীতলাতেই যেন আমার মতি থাকে।

তারপর সংসারের অনেক ধাক্কা খেয়ে ভাইপো বলেছিলেন এই কথা — 'শেষে পিসিমা যা বলেছিলেন তাই হলো'। তাই ঠিক। প্রথম অবিশ্বাসী, তারপর agnostic (উদাসীন — ঈশ্বর থাকে থাকুক), তারপর, পিসিমা যা বলেছিলেন তাই অর্থাৎ ঈশ্বর-বিশ্বাসী হলো।

চরণদাস বাবাজী আমাদের বলেছিলেন তাঁর নিজের জীবনের এই কথা— পুরীতে তাঁর জাজপেটার মঠে। বরানগরে বাড়ি ছিল। ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। শেষে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

আজ দুপুরেও দারুণ গরম, গত কালের মত একশ' পনর ডিগ্রি। রাত্রিতে ভক্তসভা বসিয়াছে দ্বিতলের 'আশ্রম' গৃহে। সামান্য ধ্যানের পর ভক্তরা গান গাহিতেছেন। তারপর ভাগবত পাঠ।

ক্ষমার কথা উঠিল। শ্রীম বলিলেন, ক্রাইস্টও বলেছেন ক্ষমা দেখাতে। নিজে যেমনি চাও তেমনি অপরকে দেখাবে। 'And forgive us our debts, as we forgive our debtors. For

if ye forgive men their trespasses, your heavenly father will also forgive you.'(St. Matthew 6:12-14)

মেরীর সঙ্গে ক্রাইস্ট মিশতেন বলে ভক্তরা আপত্তি করেছিলেন। মেরী পতিতা ছিলেন। তাই একদিন সাইমন পিটারকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, একটি গল্প। 'মনে কর এক মহাজনের কাছে দুই ব্যক্তি টাকা ধার নিয়েছে। একজন নিয়েছে এক লাখ টাকা আর একজন এক হাজার টাকা। এরা দু' জনেই দেউলিয়া হয়ে গেছে, টাকা শোধ করতে পারছে না। মহাজন তাদের অবস্থা দেখে দু'জনকেই মাফ করে দিলেন। এখন কে বেশী কৃতজ্ঞ হবে মহাজনের কাছে? ভক্তরা বললেন, যার এক লাখ টাকা মাফ করেছেন। ক্রাইস্ট তখন ভক্তদের বললেন, এটা তোমরা নিজেরা আগে বোঝ।'

ক্রাইস্টের মৃত্যুর পর মেরী দিনরাত কাঁদতেন আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে। মেরীকেই তিনি দর্শন দেন, তিনদিন পর — কবরের পাশে সকলের আগে। কত ভালবাসা হলে এটি হয়! মেরীর সকল পাপ নিজে গ্রহণ করেছিলেন।

২

মর্টন স্কুলের চারতলার ঘরে শ্রীম বিশ্রাম করিতেছেন। আজও নিদারুণ গরম। ভাটপাড়ার ললিত আসিয়াছেন। এখন অপরাহ্ন সোওয়া তিনটা। আজ ৩রা জুন ১৯২৪, ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল। মঙ্গলবার, শুক্লা প্রতিপদ তিথি ৪০।৫৭ পল।

শ্রীম পাঁচটার সময় দ্বিতলের 'আশ্রমে' আসিলেন। ললিত, জগবন্ধু ও মণি বসা। অক্ষয় ডাক্তার আসাম হইতে পত্র দিয়াছেন — উনি মণির কর্ম করিয়া দিবেন। কিছুদিন পূর্বে অক্ষয় এখানে আসিয়াছিলেন। শ্রীম তখন তাঁহাকে মণির কর্ম জোগাড় করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কর্ম প্রস্তুত, কিন্তু মণি অতদূর যাইতে অনিচ্ছুক। শ্রীম আজ ললিতকে মণির কর্মের জন্য অনুরোধ করিলেন। এখন কথাবার্তা চলিতেছে।

ললিত — আচ্ছা, তান্ত্রিক দীক্ষা না হলে কালীপূজা করা যায় কি?

শ্রীম — গুরু যা বলেন তাই করতে হয়। তার জন্যই তো গুরু-করণ। আমরা সামান্য মানুষ, আমরা কি তা বলতে পারি? গুরুকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

ছ'টার সময় শ্যামলধন মিত্র আসিলেন। ইনি মর্টন স্কুলের ইংরেজীর সিনিয়ার শিক্ষক। তিনি পরীক্ষার কাগজ ফিরাইয়া দিয়া গেলেন।

আজও খুব গরম। তাই ভক্তসভা চারতলার ছাদে বসিয়াছে মাদুরে। বড় জিতেন, হিলিংবাম (দুর্গাপদ মিত্র), শান্তি, কমল, তুলসীরামবাবুর নাতি হিমাংশু, বলাই, ডাক্তার বক্সী, ছোট রমেশ, জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়াছেন।

এখন রাত্রি আটটা। শ্রীম ভাবাবেগে আপন কক্ষ হইতে বাহিরে ছাদে আসিয়াছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — কি করছেন আপনারা? মার মাই খাচ্ছেন কিনা বলুন?

বড় জিতেন — কি আর করবো। ওরা বলছিল...

শ্রীম — কি বলছিল?

বড় জিতেন — আপনার কথা। আপনি বলেন, চুপ করে থাকা ভাল। কিন্তু পারি কৈ। বদরস বের হয়ে গেলেই ভাল মনে হয়।

শ্রীম (সহাস্যে) — ঠাকুর বলেছিলেন, বদরস বের হয়ে যাওয়া ভাল। আবার আছে, যখন ছেলে হয় আর প্রসূতি চীৎকার করে যন্ত্রণায়, তখন ধাত্রী বলে, চুপ করে থাক আর এই ওষুধটা গিলে ফেল। তা হলে শীগ্‌গীর ছেলে হবে।

ডাক্তার বক্সী — আবার অনেক সময় চীৎকার করতেও বলে। তা হলে rupture (রক্তস্রাব) হয় না, energy (শক্তি) বের হয়ে যায়।

শ্রীম — ও — ও—, এও তাহলে আছে! খানিকটা energy (শক্তি) বের হয়ে যায়।

বড় জিতেন — আজ তাস খেলা গেল। একজন বাবাজী সাধুর সঙ্গে, বয়স একশ' বছরের উপর। শিমলা পাহাড়ে থাকার সময় শিখেছিলেন।

শ্রীম — একজন থাকতো বাগানে, জপ-ধ্যান করতো। লোক তার খুব প্রশংসা করতে লাগলো। ঠাকুর বললেন, দাঁড়াও, উপরে যে মাটি জমেছে সেগুলি কোদ্‌লাক্‌ আগে।

একবার গাড়িতে উঠবার সময় দেখলেন, মা কালীর ওখানে বসে লোক তাস খেলছে। ঠাকুর বললেন, কোথায় এখানে বসে জপ-ধ্যান করবে, না তাস খেল্‌ছে!

কেশব সেনের খুড়োকে বলেছিলেন, (পঞ্চাশের উপর বয়স, তাস খেলছে দেখে) — দেখ, লোকে এক মুহূর্ত সময় পায় না ঈশ্বরকে ডাকার জন্য আর এ তাস খেলে সময় নষ্ট করছে।

শ্রীম আনমনে কি ভাবিতেছেন, তারপর আকাশ দেখিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, ঐ সব লোকের সঙ্গে ওয়ারলেসে কথা কইতে ইচ্ছা হয়। যোগীরা ওদের সঙ্গে কথা কইতে পারতেন। শরীরটা পড়ে আছে নিচে, ভিতরে যিনি তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করে এলেন।

ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার বেশ fallacy (ভুল) ধরেছিলেন। বলেছিলেন, যিনি বের হয়ে এলেন আবার তিনিই বুঝি দেখলেন (হাস্য)? ঠাকুর বলেছিলেন কিনা, 'সচ্চিদানন্দ' এঁর (ঠাকুরের) ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বললেন, 'আমিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই' — এই কথা শুনে। সায়েন্স এ কথা নেয় না কি না! পরে তিনিও বিশ্বাস করেছিলেন।

ওরা (বৈজ্ঞানিকরা) বলে uniformity of law of Nature (প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গতি)। তা বলবে না কেন, তাদের তো ঈশ্বরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ওরা তো ঈশ্বর-দর্শন করে নাই। তাই Law of God (ঈশ্বরের নিয়ম) বলতে পারে না; বলে Law of Nature (প্রকৃতির নিয়ম)।

আজকাল আবার কথা উঠেছে, ক্রাইস্ট বলে কেউ ছিলেন না। Research (গবেষণা) করে বের করেছে। যদি বল — ছিলেন, তার প্রমাণ দাও, এই কথা এরা বলে। ঠাকুরকে এই কথা যেই বলা হলো, অমনি তিনি বাইবেল থেকে ক্রাইস্টের সব উপদেশ শুনতে লাগলেন। দু'চারটা বাণী শুনেই তিনি বললেন, হাঁ তিনি অবতার। তা না হলে কেমন ক'রে মিলে যাচ্ছে আর একজন অবতারের (ঠাকুরের) কথার সঙ্গে!

দেখুন না, কত সব parallel passage (সমতুল ভাষণ) রয়েছে। ক্রাইস্ট বলেছেন, 'And lead us not into temptation,'(St. Matt. 6:13) কুমতি দিও না। ঠাকুর বললেন, 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিও না।' ক্রাইস্ট বলেছেন, 'But one thing is needful and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her.'(St. Luke 10:42) জীবনে একটি মাত্র বস্তুর প্রয়োজন। মেরীর সেটি লাভ হয়েছে। এটি তাঁর অনন্ত জীবনের সঙ্গী। ঠাকুরও বলেছেন — 'কথাটা হচ্ছে সচ্চিদানন্দে প্রেম।' ক্রাইস্ট বলেছেন, 'But seek ye first the kingdom of God' (St. Matt. 6:33) — তুমি বরং ঈশ্বরের দর্শনের জন্য চেষ্টা কর। ঠাকুর বলেছেন, 'যো সো ক'রে কি ক'রে যদু মল্লিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার চেষ্টা আগে কর।' ক্রাইস্ট বলেছেন সাধন-ভজনের সময় 'enter into the closet' — দরজা বন্ধ করে ঈশ্বরকে ডাক। ঠাকুরও বলেছেন, 'নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক।' ক্রাইস্ট বলেছেন, 'Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you. (St. Matt. 7:7) —' চাইলেই দিবেন, খুঁজলেই পাবে, ধাক্কা দিলেই দরজা খুলে যাবে। ঠাকুরও বলেছেন, যে চায় সে পায়। নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি দেখা দিবেনই দিবেন। ক্রাইস্ট বলেছেন, 'and all these things shall be added unto you' — জীবনধারণের উপকরণ সব তিনি

দিবেন। ঠাকুরও বলেছেন, 'ই-গুনোর জন্য অত ভেবো না। যা দরকার সব তিনি দিবেন।'

ক্রাইস্টের বাইরের প্রমাণ না থাকলেও এই সব internal (আভ্যন্তরিক) প্রমাণ যে রয়েছে তার কি হবে? তা ছাড়া বাইরের প্রমাণ দিয়ে যদি সত্য নির্দ্ধারণ করতে হয় তা হলে জগতের অনেক কিছু বাদ পড়ে যায়। রাম, কৃষ্ণ, ঋষিগণ — এঁরা সব কল্পনার জিনিস হয়ে পড়েন। তা ছাড়া ইট পাটকেল পাথর এসব তো নাশবান দ্রব্য, এদের আয়ু কত? একটা জীবন্ত মানুষ না হলে অপর মানুষকে কেবল কথাপ্রচার দ্বারা প্রভাবিত করতে পারে না।

Canon of historical evidence-এর (ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ আইনের) সঙ্গে মিলে না বলে ক্রাইস্ট ছিলেন না এ কথা কে মানবে? আর একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির সঙ্গে যে মিলে যাচ্ছে ক্রাইস্টের সব কথা, সব শিক্ষা! ঠাকুরের জন্ম, কর্ম, শিক্ষা, অন্তর্ধান, এ সবেরই রেকর্ড রয়েছে তিথি নক্ষত্র তারিখের সহিত। তারপর আমরা রয়েছি জীবন্ত প্রমাণ। আরও বহু লোক তাঁকে দেখেছেন। তাঁদের কথা, তাঁর সম্বন্ধে লেখা রয়েছে। ঠাকুর নিজেকে নিজে অবতার বলে প্রকাশ করেছেন।

আহা, বলে পাঠালেন একজনকে — অমুককে বলে এস, আমাকে ধ্যান করলেই হবে। কয়দিনপর, সমাধির পর মাকে বলছেন, apologetically (সবিনয়ে) 'আচ্ছা, মা, আমাকে ধ্যান করতে বলে আমি কি অন্যায় করলাম? আমি তো দেখছি, মা, তুমিই সব হয়ে রয়েছো, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার সবই তুমি।'

তাই আমাদের অবতারের কথাই বিশ্বাস করা উচিত। ঐ সব সংশয়াপন্ন পণ্ডিতদের কথার কি মূল্য আছে? অবতারের কথা-বৈ উপায় নাই। ওরা কি করে বুঝবে অবতারের কথা? সায়েন্সের evidence (সাক্ষ্য সেখানে পৌঁছাতে পারে না। Physical Plane (বাহ্য জগৎটা) হলো তার বিচরণভূমি। এর উপর আছে mental plane (মনোজগৎ), তারপর spiritual plane (আত্মজগৎ), তার

উপর আছে পরমাত্মা, ঈশ্বর। মাঝের ভূমিগুলির সম্বন্ধে সায়েন্সের জ্ঞান নাই। কাজেই ঐ বিষয়ে তার প্রমাণ অগ্রাহ্য।

যারা উপরের জিনিস চায় তারা সায়েন্সের কথা নেবে না। তারা নেবে Science of the spirit-এর (অর্থাৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞানের) যে অধিকারী তাঁর কথা, ক্রাইস্টের কথা, ঠাকুরের কথা।

যদি বল, তেমন লোক খুব অল্প যারা ক্রাইস্টকে নেবে, তার উত্তর, অল্পলোক বলে তার দামও অল্প, একথা বল কি করে? এম.এ. ক্লাসে অল্প লোক পড়ে আর স্কুলে পড়ে লাখ লাখ, তা বলে এম.এ ক্লাস নাই, সেখানে পড়ার লোক নাই, একথা সিদ্ধ হয় কি করে? ঈশ্বরবস্তু majority-র (সংখ্যাগরিষ্ঠের) verdict-এ (মতে) সিদ্ধ হয় না। ক্রাইস্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, এঁদের কথাতে সিদ্ধ। এঁরা সাক্ষাৎকার করেছেন, কথা কয়েছেন, ঈশ্বরের আদেশে কাজ করেছেন, তাঁদের কথাই গ্রহণীয়।

এখন রাত্রি দশটা। একটি ভক্ত আজ ভোর বেলায় একটি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সেই কথা শ্রীমকে বলিতেছেন। এখন সকলে চলিয়া গিয়াছেন, দুই জন মাত্র আছেন।

ভক্ত — আমি একটি সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে একটি গর্ত দেখতে পেলাম, খুব বড়, জলে পূর্ণ। আমি একটু পর সাগরের জলে স্নান করতে নেবে গেলাম। তখন জোয়ার এলো আর সমুদ্রের জল গর্তের জলের সঙ্গে মিশে গেল। শুনেছিলাম ঐ গর্তের জলে স্নান করলে ভাল হয়। আমার মনে দুঃখ হল ওতে স্নান করা হ'লো না বলে। সমুদ্রে ডুব দিয়ে তীরে উঠে পড়লাম তাড়াতাড়ি। খানিক পরে জোয়ার চলে গেলে আবার ঐ গর্ত দেখতে পেলাম। আর দেখলাম আপনি ঐ গর্তের ধারে বসে আছেন সহাস্য বদন। আপনার কাপড়খানা গর্তের জলে ধুচ্ছেন। আর আমায় বলছেন, তোমার এতেই হবে, এই সব সেবা, গুরু সেবাতেই হবে। যে পথে আছ সেই পথেই হবে। তবে একটু কর্ম আছে।

শ্রীম শুনিয়া বলিলেন, বেশ ভাল স্বপ্ন এ সব। সাগর ভগবানের

একটি রূপ। তার দর্শন ভাল। সাগরে স্নান মানে ভগবানের আশ্রয়ে থাকা। খানা-ডোবাতে স্নান মানে ক্ষুদ্র আদর্শের অধীনে থাকা। এতে মনের ঊর্দ্ধ গতিই সূচিত হচ্ছে। খুব ভাল কথা।

কলিকাতা।

৩রা জুন, ১৯২৪ খ্রীঃ, মঙ্গলবার।

চতুর্থ অধ্যায়

‘বেশ করেছ বেশ করেছ বেশ করেছ’

১

মর্টন স্কুলের দ্বিতলের আশ্রমের বারান্দা। এখন সকাল আটটা। শ্রীম বেঞ্চেতে দক্ষিণাস্য উপবিষ্ট। একজন আসিয়া সংবাদ দিল লোকেনের মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, খুব অল্প বয়সে গেল। সকলকেই যেতে হবে। আমরা সব মৃত্যুর করাল বদনে বসে আছি। দেখতে পাচ্ছি না বলে, অপরের জন্য শোক করছি। ঠাকুর তাই মণি মল্লিকের পুত্রশোকের সময় একটি গান গেয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিছলেন। প্রথমে যেন শোকে মুহ্যমান এরূপ ভাব দেখালেন সাধারণ মানুষের মত। তারপরই দৈবী ভাবে আবিষ্ট হয়ে এই গানটি গাইলেন — ‘জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।’

এখন ন’টা। শ্রীম জগবন্ধু ও বিনয়কে প্রথমে প্রভাসবাবুর কাছে পাঠাইলেন; তারপর, ৮৪।১ আমহার্স্ট স্ট্রীটে। এই বাড়িটিও ভাড়া লইবার কথা হইতেছে স্কুলের জন্য।

অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম দ্বিতলের বারান্দায় বসা বেঞ্চেতে। উদ্বোধন হইতে চন্দ্র আসিয়াছে। সে সেখানে কাজ করে। তাহাকে প্রথমে সরবৎ খাইতে বলিলেন। তারপর উদ্বোধনের সংবাদ লইলেন, সকলেই ভাল।

মণি আসিয়া শ্রীম-র পাশে বসিলেন — অভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শ্রীম (মণিকে লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রের প্রতি) — ‘অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।’ আমার একবার হয়েছিল। বাঘের বা সিংহের ক্ষুধা পেলে যেমন উন্মত্তের মত পায়চারী করে তেমনি আমি প্রায়

তিন ঘন্টা পায়চারী করেছিলাম। ভাবনা — ছেলে মেয়েদের খাওয়াব কি, মস্ত বড় সংসার উপরে।

বিদ্যাসাগর মশায়ের স্কুলে কাজ করতাম হেড মাস্টারের, শ্যামবাজারে। ঠাকুর কাশীপুরে ছিলেন অসুস্থ। ওখানে বেশী যাওয়া-আসা করতাম। স্কুলের ফল তেমন ভাল হয় নাই। তাই বিদ্যাসাগর মশায় অসন্তুষ্ট হয়ে একদিন এই কথা বললেন, ‘ওখানে বড্ড বেশী যাতায়াত করায় তোমার স্কুলের ফল ভাল হয় নাই।’ অমনি resign (কর্মত্যাগ) করলাম। ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, ‘বেশ করেছ, বেশ করেছ, বেশ করেছ।’ ঠাকুর জানেন হাতে টাকা কড়ি নাই, খেতে পাবে না। তবুও এই কথা বললেন।

অন্তেবাসী — কেন বললেন, ‘বেশ করেছ’?

শ্রীম — তার মানে ঈশ্বরের জন্য যা করা যায় তাই ভাল। আগে ঈশ্বরের সেবা, তারপর সংসারের জন্য কাজ।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — কই গিছলো (কর্মের জন্য মণি)? পাঁচুবাবুর সঙ্গে দেখা হল? অন্তেবাসী জানাইলেন, — হাঁ।

শ্রীম (চন্দ্রের প্রতি) — ওমা, কয়দিনের মধ্যে সুরেন্দ্রবাবু গাড়ী পাঠিয়ে ডাকিয়ে নিয়ে রিপণ কলেজে লাগিয়ে দিলেন! সেখানে পাঁচ বছর প্রফেসারী করা গেল। ওখান থেকে একবার without notice (সংবাদ না দিয়ে) কামারপুকুর চলে গেলাম। ওরা কিছু বলবার আগেই আমি ধুয়া ধরলাম, তিন ঘন্টা কাজ করা চলবে না; দু’ ঘন্টা হলে রাজী আছি, বেতন এই থাকবে। পরে ওখানে resign (কর্মত্যাগ) করলাম। তারপর অন্য একখানে লাগি।

আমার এই সমস্ত বিপদ দেখিয়ে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের বলতেন, এই দেখ, বিয়ে করলে এসব হবেই। আমায় বলতেন, তোমার এই সব বিপদ এদের শিক্ষার জন্য — এতে ছোকরাদের চৈতন্য হবে। ছেলের মৃত্যু, মেয়ের বিয়ে, কর্ম নাই, অভাব, এই সবের জন্যই ঠাকুর বলতেন, সংসার জ্বলন্ত অনল। বিপদ আর দুশ্চিন্তা, এরই নাম সংসার!

সন্ধ্যার পূর্বেই ছাদে ভক্তসভা বসিয়াছে। এখন সাড়ে সাতটা। শ্রীম আসিয়া চেয়ারে বসিলেন উত্তরাস্য। ভক্তগণ সব মাদুরে বসিয়াছেন শ্রীম-র সামনে। আজও খুব গরম, ভক্তসংখ্যাও অধিক। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, কালী মাস্টার, কার্তিকবাবু, ছোট রমেশ, বলাই, রমণী, বিনয়, জগবন্ধু, শান্তি, বড় অমূল্য, শুকলাল, মণি, বিক্রমপুরের ভক্ত প্রভৃতি আসিয়াছেন। সন্ধ্যার আলো আসিলে শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীম কথামৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীম (কার্তিক বক্সীর প্রতি) — ডাক্তারবাবু, বাড়ীর সব খবর ভাল তো? আপনার প্র্যাকটিস্ কেমন চলছে? কটা 'কল' হয় রোজ?

ডাক্তার — আজ্ঞে, খুব ভাল। অনেক 'কল' হয়। সবগুলোতে attend করা (উপস্থিত হওয়া) শক্ত হয়ে পড়ে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একজন ঠাকুরকে এসে প্রশ্ন করলো একদিন, মশায় কি করে ঈশ্বরকে লাভ হয়, সেই সম্বন্ধে কিছু বলুন। ঠাকুর পূর্বেই শুনেছিলেন ঐ ব্যক্তির কর্ম নাই। তাই ঝট্ করে উত্তর দিলেন, তুমি আগে একটি কর্ম ঠিক করে এসো তারপর বলবো (হাস্য)। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা।' পেটে কিছু না থাকলে সব আলুনী লাগে। খালি পেটে ধর্ম হয় না।

ঠাকুর হাজরাকে বলেছিলেন, জপ-তপই কর আর যা-ই কর আর হাজার নাকই টেপো, মন ঐতেই (দেনার চিন্তায়) লেগে আছে। হাজরার পনর শ' টাকা দেনা ছিল। অন্নচিন্তা ধর্মকে ঠেলে ফেলে দেয়।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গান ধরিলেন।

গান। ভবে সেই সে পরমানন্দ।
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।।
যে জন না যায় তীর্থ পর্যটনে
কালীনাম ছাড়া কথা না শুনে কানে,
সন্ধ্যা-পূজা কিছু না মানে,
যা করেন কালী সেই সে জানে॥

যে জন কালীর চরণ করেছে মূল, সহজে হয়েছে বিষয়েতে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সে কূল মূল হারাবে সে কেমনে।।
(রাজা) রামকৃষ্ণ কয় এমন জনে, লোকের কথা না শুনে কানে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে কালীনামামৃত-পীযূষ পানে।।

শ্রীম — ঠাকুর এই গানটি আমাকে মুখস্থ করতে বলেছিলেন। তিনি যে কালে মুখস্থ করতে বলেছেন, তাই এটি একটি মন্ত্রস্বরূপ। 'যে জন কালীর চরণ করেছে মূল' — এটিতে নিজের অবস্থা বর্ণনা করেছেন ঠাকুর নিজে!

আবার গান গাহিতেছেন।

গান —

দীনতারিণী দুরিতহারিণী, সত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণধারিণী;
সৃজন-পালন-নিধনকারিণী, সগুণা, নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী।।
ত্বং হি কালী তারা পরমা-প্রকৃতি, ত্বং হি মীন কূর্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বং হি স্থল জল অনল অনিল, ত্বং হি ব্যোম ব্যোমকেশ-প্রসবিনী।।
সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত ভ্রমে হ'য়ে ভ্রান্ত, তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারে নি।।
নিরুপাধি আদি-অন্তরহিত, করিতে সাধক জনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চরূপে কালবঞ্চ, ভবভয়হরা ত্রিকালবর্তিনী।।
সাকার সাধকে তুমি যে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়, সেই তুমি নগতনয়া জননী;
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়, সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী।।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩/২২/৩)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই সব গান দ্বারা ঠাকুর মায়ের নাম জপ করতেন। মা কালীর সামনে বসে গাইতেন (আহা, এই দুটো গান দিয়ে একজনের life-এর (জীবনের) একটা picture (ছবি) পাওয়া যায়। Mental আর spiritual picture-ই (মনের আর

আত্মার চিত্রই) real life (যথার্থ জীবন)। বাবার নাম কি, কি করতেন, এসব life (জীবনী)?

রাজা রামকৃষ্ণ বিষয়-সম্পত্তি সব দেখতে পারতেন না, সর্বদা কালী নামে ঢল ঢল। একবার গভর্নর্মেন্টের revenue (কর) দিতে না পারায় জেলে যাবার কথা হলো। গভর্মেন্ট special consideration (বিশেষ বিবেচনা) করলেন। বললেন, জেলে দিয়ে কাজ নাই, সর্বদা চোখে চোখে রাখ। তাঁর শেষের দিকের গানটি দেখুন কেমন — খেলা সাঙ্গ হয়ে এসেছে।

গান। আমার মন যদি যায় ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।।
এ দেহ আপনার নয় রে সদা রিপু সঙ্গে চলে।
তবে আন রে ভোলা জপের মালা, (দেহ) ভাসাই গঙ্গাজলে;
ভয় পেয়ে রাজা রামকৃষ্ণ ভোলার প্রতি বলে।
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে।।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই তিনটি গানে একজনের জীবনের একটা complete picture (সম্পূর্ণ চিত্র) দিচ্ছে। যখন struggle (তপস্যা) করছিলেন তখন ঐ গান। আর যখন ভবখেলা সাঙ্গ হয়ে এলো তখন এইটি — 'আনরে ভোলা জপের মালা দেহ ভাসাই গঙ্গাজলে।' আহা, কি জীবন্ত বিশ্বাস!

শ্রীম মত্ত হইয়া শেষের গানটি গাহিতেছেন। ভক্তগণও সকলে যোগদান করিলেন। অনেকক্ষণ গান চলিল। স্থান কালের জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। গান বন্ধ হইলেও সকলে কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরব। আবার ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গ।

শ্রীম (বড় অমূল্যর প্রতি) — গান না আপনি একটি গান? (সকলের প্রতি) দেখুন, তিনি হাওয়া হয়ে রয়েছেন। আমরা তা খেয়ে বেঁচে আছি। আবার ঐ কুঁজোতে ঠাণ্ডা জল, তাও তিনি। আবার নামরূপেও তিনি আছেন। কত নাম, কত রূপ তাঁর।

বড় জিতেন — আবার খুনী ডাকাত হয়েও আছেন তিনি।

শ্রীম (বিরক্তির সহিত) — হাঁ, ওটা তাঁর অবিদ্যার ডিপার্টমেন্ট। বিদ্যা অবিদ্যা দুটো আছে। ওসব অবিদ্যার কাজ। একজন বলেছিল পুত্রোৎপাদনেও শক্তির দরকার। ঠাকুর ধমক দিয়ে বললেন, পুত্রোৎপাদন শক্তি আর শুকদেবের শক্তি, এ দুটো এক? এতে সংসারে বদ্ধ করে, আর ওতে মুক্ত হয়। একেবারে উল্টো প্রয়োগ।

ওরা বলতো, 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরঃ!' যিনি দিল্লীর সম্রাট তিনিই জগদীশ্বর। তা বলবে না? ওরা যে অবিদ্যা নিয়ে রয়েছে। ওদের 'মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া' (হাস্য)। অবিদ্যায় থাকলে ভাবে এরাই বুঝি আদর্শ, এই রাজা-টাজারা। অবিদ্যার লোক মারা গেলে কত টেলিগ্রাম আসে। কিন্তু ঠাকুরের দেহ গেলে কখনো এসেছিল?

তাঁরই অবিদ্যায় মানুষ অজ্ঞানান্ধ। এই অবিদ্যা শক্তির প্রভাবে তিনি বিশ্ব রচনা ও রক্ষা করছেন। জল হাওয়া অগ্নি শস্য পিতৃ-মাতৃ স্নেহ, এ দিয়ে বিশ্বকে বেঁধে রেখেছেন। আবার এই অবিদ্যাতেই ভুলিয়ে রেখেছেন। জানতে দেন না যে তিনি একমাত্র পূজনীয়, তিনিই উপাস্য। কখনও তিনি নিজে মানুষ হয়ে এসে বলেন, ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য। তবু লোক নেয় না। তাঁরই অবিদ্যা শক্তি উল্টে দেয় বুদ্ধি। দু' একজনকে কেবল জানতে দেন এই খেলা। অবিদ্যার খেলা বিচিত্র। তাই সদা প্রার্থনা, মা ভুলিও না তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায়।

সভা ভঙ্গ হয় রাত্রি দশটায়।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ৪ঠা জুন, ১৯২৪ খ্রীঃ।
২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয় ৪৫।৩১ পল।

পঞ্চম অধ্যায়

এখানে পেলা নাই।

১

মর্টন স্কুল। দ্বিতলের 'আশ্রমের' বারান্দা। এখন সকাল সাতটা। শ্রীম বেঞ্চেতে বসিয়াছেন দক্ষিণাস্য। পাশে জগবন্ধু, বিনয় ও মণি বসা।

আজ ৫ই জুন, ১৯২৪ খ্রীঃ, ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার, শুক্লা তৃতীয়া ৪৯ দণ্ড ২০ পল।

শ্রীম একখানা ইংরেজী দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' দেখিতেছেন। কিছুক্ষণ পর কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — দুটো দল থাকা ভাল কংগ্রেসে। তা হলে প্রত্যেক দল আপন আপন দোষ দূর করতে চেষ্টা করবে।

মহাত্মা গান্ধীর কথা কি সকলে নেবে? তাঁর পথ কি সকলের ভাল লাগবে? কে যায় বাপু নিত্য হবিষ্যি করতে? এই লোকগুলি ছেলেবেলা থেকে টাকা মান যশ, এ সব লক্ষ্য করে এসেছে — এই উকীল ব্যারিষ্টার প্রভৃতি। হঠাৎ কি কথায়ই কেবল ঐ ভাব দূর হয়ে যাবে?

গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যার যেমন প্রকৃতি সে সেইভাবেই কাজ করবে। 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি' (গীতা ১৮/৫৯), 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি' (গীতা ৩/৩৩)। সবাই কি হবিষ্যি করবে?

মানুষের সংস্কার কি সহজে যায়? এই দেখুন না, মণিবাবু সারাদিন বসে বসে কি ভাবে। আপনি যা বলেছেন তা ঠিক, বসে বসে কেবল brood (দুশ্চিন্তা) করেন। পরিবার ছেলে মেয়ে সব রয়েছে আত্মীয়দের

কাছে। অথচ সারাক্ষণ এমনি করে বসে বসে কাটাচ্ছেন। আমরা বলে বলে এখানে ওখানে পাঠাই। আত্মীয়দের কাছে ওরা থাকলে না দেখে পারবে না। মহামায়ার এমনি কাণ্ড — ভেলকি লাগিয়ে দেন।

(মণির প্রতি) কেন আপনি এমন করছেন? আপনার কাজ কে দেখতো? আপনার দাদা তো? এই রকম করলে এরপর আর কেউ দেখবে না। দৈবাৎ বিষয়াশয় নষ্ট হয়ে গেলে, বলে অমুকে আমার সর্বনাশ করেছে। নিজে কিছু করবে না। অপরে করতে গেলেও ঐরূপ দোষারোপ। তা হলে কেমন করে হয়? সকলেই নিজের আরাম খোঁজে। আপনি কি পড়েছেন কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, লজিক্?

মাধব রায় ছিলেন একজিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার। তিনি বেশ গল্প করতেন। একটা ঘোড়াকে এক জন একটা রশি দিয়ে বেঁধে আনলে। যেই খুলে দিল অমনি দৌড়। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আর একদিন ঐ লোকটা বললে একটা মজা দেখবে? এই বলে ঘোড়ার রশিটা খুলে ফেলে তাড়াতাড়ি চক্ দিয়ে মাটিতে একটা রশি এঁকে দিল। আর যায় কোথা ঘোড়া? দাঁড়িয়ে রইল। ভাবছে আমার গলায় ঐ রশিটা রয়েছে। এরও ঠিক তাই হয়েছে। সারাদিন বসে বসে ভাবছে, হায় আমার কি হবে।

নটা বাজিয়াছে। শ্রীম চারতলায় নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম নিজ কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। বেলুড় মঠ হইতে দুইজন সাধু আসিয়াছেন উপুদা মহারাজ ও সুবিমল মহারাজ। সঙ্গে একজন গুজরাটি ভক্ত বস্ত্রব্যবসায়ী। অন্তেবাসী তাঁহাদিগকে যত্ন করিয়া দ্বিতলের 'আশ্রমে' বসাইলেন আর বরফজল ও দুটি করিয়া বড় রসগোল্লা খাইতে দিলেন। নানা কথা-প্রসঙ্গ হইতেছে। সুবিমল ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে ছিলেন। তখন আশ্রমের জন্য কোথায় কি ভাবে চাঁদা উঠাইয়াছেন সেই সব কথা বলিতেছেন। ময়মনসিংহ জেলার হোসেনপুর, কঠিয়াদি, মঠখোলা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সব স্থানে বড় বড় পার্টির কাজ আছে ইত্যাদি।

শ্রীম সাড়ে ছয়টার সময় ঘর হইতে বাহির হইয়া ছাদে আসিয়াছেন। অন্তেবাসী সাধুগণকে লইয়া পূর্বেই চারতলার ছাদে আসিয়া বসিয়াছেন। শ্রীম চেয়ারে বসা উত্তরাস্য। সাধু ভক্তগণ শ্রীম-র সম্মুখে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান বেঞ্চেতে বসিয়াছেন। পরিচয়ের পর ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে।

শ্রীম (গুজরাটি ভক্তের প্রতি) — Sri Ramakrishna told that the ideal of human life is to see God. And the means to that end is to always mix in the company of holy men. To this another item may be added : retirement into solitude occasionally and crying unto the Lord with a longing and yearning heart. Had you been to the Dakshineswar Temple and to the Lord's Chamber?

(শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন। তার উপায় সর্বদা সৎসঙ্গ। আর মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে ভগবানের কাছে ক্রন্দন করা। আপনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে গিয়েছিলেন কি?)

উপুদা মহারাজ — আপনি এঁকে একটু advice (উপদেশ) দিন কি করে টাকা খরচ করা উচিত। অনেক টাকাওয়ালা লোক!

শ্রীম (বিরক্তির সহিত) — না, না এসব কথা বলতে নেই। ঠাকুর টাকাপয়সার কথা মোটেই তুলতেন না। বলতেন, এখানে পেলা নেই। পেলা নিলে কেউ আসবে না। বলতেন, আহা, টাকা পয়সা ওদেরই থাকুক। ওরা অত ভালবাসে আর কত কষ্ট করে রোজগার করে। মা, আমায় তোমার পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধা-ভক্তি দাও।

ঠাকুর একদিন একটি গল্প বলেছিলেন। এক স্থানে যাত্রা গান হচ্ছিল পেলাতে। অর্থাৎ দর্শনী যা পড়বে সবটাই গাইয়েরা পাবে। এখানে লোকের তেমন যাতায়াত দেখা যায় না। পয়সা দিতে হবে যে! আর এক জায়গায় গান হচ্ছে। সেখানে ফুরন অর্থাৎ একটা

নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া হবে। এখানে লোকের খুব ভীড়। একটি লোক গান শুনতে এসেছে। প্রথম স্থানে গিয়ে চুপি দিয়ে দেখলে যে পেলা দিতে হয় এখানে, অমনি প্রস্থান। দ্বিতীয় স্থানে কিছুই দিতে হয় না দেখে কনুই দিয়ে লোক ঠেলেঠুলে এগিয়ে গিয়ে একেবারে সামনে গিয়ে বসলো। আর নিশ্চিন্ত মনে আরামে গোঁফে তা দিচ্ছে (সকলের হাস্য)।

তাই ঠাকুর রহস্য করে বলতেন, এখানে পেলা নাই। কিছু দিতে বললে কেউ আসবে না।

শ্রীম (উপুদা মহারাজের প্রতি) — আগে ঈশ্বরে মন আসুক তখন তিনিই বলে দেবেন কি করে টাকা পয়সা খরচ করতে হবে। তাঁর চিন্তা যে করে তিনি তার বুদ্ধিতে উদয় হন ভাবরূপে। সব বলে দেন কখন কি করবে। 'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে' (গীতা ১০/১০)। আগে বলা মানে, It is putting the cart before the horse (গাড়ীর পেছনে ঘোড়া জুতে দেওয়া)। উল্টো কাজ।

আর এক কথা, আমাদের কি right (অধিকার) আছে বলার? ঠাকুর যা বলে গেছেন কেবল তাই refer (উল্লেখ) করা যায়। তা ছাড়া advice (উপদেশ) দেবার কি right (অধিকার) আছে আমাদের?

উপুদা মহারাজ — কেন, টাকা তো যারা উপদেশ দিবেন তাদের দিতে বলা হবে না। নিষ্কাম কাজে লাগানোর কথাই বলা হবে।

সুবিমল — আ, উনি যখন বারণ করছেন কি কাজ ঐ কথা বলার?

উপুদা মহারাজ (ক্রুদ্ধ হইয়া) — Don't interrupt, don't interrupt! (বাধা দিও না)।

শ্রীম হাসিতে লাগিলেন। ভক্তরা মজা দেখিতেছেন।

শ্রীম (স্মিত হাস্যে) — হাঁ, কিন্তু কথা শুনে কে? কে আসবে টাকার কথা বললে?

সুবিমল — মন ঠিক না হলে কেউ কথা শুনে না। কতজন তো কত কথা বলে গেছেন, শুনছে কে? ঠাকুরের কথা লাখ লাখ লোক শুনছে। কটা লোকের ভিতর আকাঙ্ক্ষা জেগেছে?

শ্রীম — হাঁ, শুনে কে? কত কথা তো হয়ে গেল।

শ্রীম সুবিমলের সব কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। সাধুরা সাতটার সময় বিদায় লইলেন।

এখন সন্ধ্যা। শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। ভক্তগণ বেঞ্চেতে সামনে বসা। আকাশে চাঁদ। সকলে কিছুক্ষণ ধ্যান করিলেন। এবার কথা।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আজ বলরাম মন্দিরে সাধুদের ভাণ্ডারা। মঠের সব সাধু আসবেন। এই সিন্‌টি দেখা দরকার। বহু বছরের তপস্যা হয়ে যায় এতে। কত সাধু একসঙ্গে। আবার ঠাকুরের সাধু। এঁরা ঈশ্বর ছাড়া কিছু চান না। (সকলের প্রতি) যাও না, তোমরাও যাও, দেখবে। যাবার সময় ট্রামে যাবে। ফিরবার সময় চাঁদ দেখতে দেখতে হেঁটে চলে আসবে। দর্শন করে চলে আসবে, খাবে না। একটা ছুতো করে চলে আসবে।

মোটা সুধীর, ছোট রমেশ ও শান্তিকে সঙ্গে লইয়া অন্তেবাসী বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে রওনা হইলেন। ভক্তগণ রাত্রি পৌনে দশটার সময় ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভক্তগণ সাধুদের সকল দল দেখিয়া আসেন নাই। সাধুগণ দলে দলে আসিতেছেন। ভক্তগণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। কিছুক্ষণ দেখার পর ভক্তরা স্থির করিলেন এরূপ দর্শন করা ঠিক নয়। সাধুরা সকলকে চিনেন। কি ভাবিবেন তাঁহারা এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিলে? আবার ভিতরে গেলেও মুস্কিল। খাইতে নিশ্চয় বলিবেন বাড়ির লোক। তখন না খাওয়া সম্ভব হইবে না, এইরূপ ভাবিয়া ভক্তগণ ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম খুব দুঃখিত।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। ঘরে নাই বা গেলে। যে খেলে সে কানা কড়িতে খেলে। সূক্ষ্ম বুদ্ধি নাই বোঝা

যাচ্ছে।

এতক্ষণে বড় জিতেন, ছোট জিতেন, শুকলাল, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, মনোরঞ্জন প্রভৃতি আসিয়া ছাদে বসিয়া আছেন। ভাণ্ডারায় সাধুদের দেখিতে যে ভক্তরা গিয়াছিলেন তাঁহারাও ঐখানে বসা।

একজন ভক্ত — সাধুরা কেউ কেউ মনে করবে এরা খেতে এসেছে।

শ্রীম — তা করলেই বা। আমার কাজ যো সো করে সাধু দর্শন করা। কে কি মনে করবে অত ভাবার দরকার কি?

কেউ মনে না করে, এরূপ অনেক সাধু দেখেছি। মনে কর, তাঁরা কত বড় ঘরের লোক, ঠাকুরকে চিন্তা করেন কিনা! ঠাকুর মানে অবতার, ভগবান।

নাতিকে অত আদর কেন করে? না, ঠাকুরদাদার খাতিরে। ওরা হয়তো কেউ কেউ নিজেদের চিনতে পারে না। কিন্তু তোমরা তো চিনেছো এঁরা কত বড় ঘরের লোক।

সাধুদের দোষ ধরতে নাই, গুণগ্রাহী হতে হয়। তবে কাজ হবে। কিন্তু প্রকৃতি বিরূপ। একখানে একটা ক্ষীরের হাঁড়ি রয়েছে। আর একখানে বসে একজন বাহ্যে করছে। শূয়ার এই বাহ্যে খাবে ক্ষীর ছেড়ে। কেন? না, প্রকৃতি।

শ্রীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কি স্মরণ করিতেছেন।

শ্রীম (সহাস্যে) — হাঁ, একজন ভক্ত, কলকাতায় ঠাকুর যেখানে যাবেন আগে থেকেই সেখানে গিয়ে হাজির হতো। সকলে বিস্মিত হয়ে বলাবলি করছে, আশ্চর্য কি করে খবর পায়! ঠাকুর শুনে হেসে হেসে বললেন, মুচি জানে কোথায় মোষ পড়বে (সকলের হাস্য)। পুজোর সময় বলির মোষগুলি মুচিরা নিয়ে যায় কিনা। তাকে তাকে থাকলে সব খবর পাওয়া যায়।

একজন বড় সুধীরের কথা তুলিয়াছে। তিনি মর্টন স্কুলের প্রাক্তন বিদ্যার্থী। আজকাল মাথাটার একটু গোলমাল হইয়াছে।

শ্রীম — হাঁ, আজ এসেছিল। মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। মা

বাপ নাই। কে নেবে যত্ন? স্ত্রীর বিরুদ্ধে complain (অভিযোগ) করছিল। আমরা বললাম, সুখ-দুঃখের পার হও। ও না বললে সর্বদাই ঐ কথাটা brood (সর্বদা ভাবনা) করতো?

আর পাগল, তা কে নয়? সবাই পাগল। সকলে যা করে তা করলেই পাগল নয়? এই যে জানোয়ারগুলো, দিন রাত স্ত্রী-পুরুষে ই' (রমণ) করছে তা সকলেই দেখছে। সকলেই তা করছে। এতে তাই লজ্জা নাই। সকলে করলে লজ্জা নাই। এটা হলো এই সংসারী লোকের বিচার।

কেউ কামিনী, কেউ কাঞ্চন নিয়ে পাগল, কেউ নামযশের জন্য পাগল। কে পাগল নয়? সবাই পাগল। কি নিয়ে লোক সব রয়েছে? যদি ঈশ্বর-দর্শন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তা'হলে প্রায় সকলেই পাগল। ঠাকুর বলতেন, 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।'

শ্রীম কিছুকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা।

শ্রীম (সহাস্যে) — এক বাড়ির একটি চাকর না বলে চলে গেছে। সেখানে বেশী টাকা পাবে। বাড়ির বাবু রাগ করেছেন, মিথ্যা কথা বলার জন্য। বাড়ির অন্য লোক তাঁকে বোঝাচ্ছেন, 'কেন কি হয়েছে এতে? গরীব লোক সে। সে তো করতেই পারে। শিক্ষিত ভদ্রলোকরা করছে কি করে? তারা কি বেশী টাকার জন্য চেষ্টা করছে না? কত অজুহাত, কত ছুতা দিয়ে ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করে। তাতে দোষ নাই? গরীব লোক অশিক্ষিত লোক করেছে বলে মহা অন্যায় হলো? তোমায় যদি বলতো, তুমি ছাড়তে কি তাকে? তাই অন্য কথা বলেছে।'

পীতাম্বর শ্রীমর গৃহভৃত্য। সে অন্যত্র অধিক অর্থ পাইয়া চলিয়া গিয়াছে। শ্রীম-র পুত্র ইহাতে বিরক্ত হইলে তাঁহার মাতা ঐরূপ বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। নিজগৃহের এই দৃশ্যটি উপহার দিয়া শ্রীম ভক্তদের বিদায় দিলেন। এখন রাত্রি পৌণে এগারটা।

২

আজ ৬ই জুন, ১৯২৪ খ্রীঃ। সকাল সাতটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া আছেন বেঞ্চেতে। পাশে শান্তি ও সূর্য্য ব্রহ্মচারী বসা। সামনের ঘরে জগবন্ধু। মনোরঞ্জন একটি নূতন কুঁজা আনিয়াছেন।

শ্রীম (একটি ভক্তের প্রতি) — আপনি kindly (দয়া করে) জল ভরে নিয়ে আসুন।

শান্তি — এঁর কাল থেকে অসুখ, কিছুই খান নাই।

শ্রীম — তা হলে কালকে রাত্রে না খাওয়া উচিত ছিল (বলরাম মন্দিরে)।

স্বামীজী একবার তিনদিন কিছু খেতে পান নাই। মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে গিছলেন। তারপর এক ফকির একটি শসা দেয়। তা খেয়ে প্রাণ রক্ষা হয়। (একজন ভক্তের প্রতি) আপনি তা হলে গাছতলায় যেতে প্রস্তুত নন দেখছি। (রহস্য করিয়া স্মিত হাস্যে) দেখুন, মাঝে মাঝে ওজন নেবেন শরীরটার। যেই কমে যাবে অমনি খেতে আরম্ভ করবেন। রেলস্টেশনে ওজন করতো বাবুরা, মিহিজামে দেখেছি।

তাই স্বামীজী বলেছিলেন, এই মঠটি কেন করেছি? আমি জানি কি কষ্ট সাধুর! কলিতে আবার অন্নগত প্রাণ। মঠে থেকে ছেলেরা তবুও দুটি খেয়ে বাঁচবে। সাঁওতালরা দেখেছি শুধু ভাতও খেতে পায় না।

একজন ভক্ত — এদের nature-এ (স্বভাবে) সয়ে গেছে।

শ্রীম — আপনিও পারেন সওয়ালে। কত বছর আপনার বয়স? আরও চল্লিশ বছর সওয়ান্। দেখবেন আপনারও ঐ nature (স্বভাব) হয়ে যাবে।

গত কাল ভক্তগণ বলরাম মন্দিরের ভাণ্ডারায় সাধুদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সকল সাধু দর্শন না করিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। শ্রীম তাহাতে দুঃখিত। আজও সেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীম (স্বগতঃ) — রাস্তায় দাঁড়িয়ে দর্শন করতে হয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধি

নাই দেখছি। খেতে বললে না হয় খেলেই বা। মনকে বোঝালেই হলো, আমরাও ব্রহ্মচারী। না হয় একটু অপমানই বা করলো। লোকে সংসারের বিষয় নিয়ে কত অপমান সহ্য করছে। না হয়, সাধুসঙ্গের জন্য, ভগবানের জন্য, একটু অপমানই সহ্য করতে হল।

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মান, অপমান — এসব ছেড়ে সাধুসঙ্গ সাধুসেবা করতে হবে। ধর্মজীবন লাভের ইহাই একমাত্র পথ। জাগতিক লাভের জন্য যেমন লোক সর্বস্ব পণ করে তেমনি সাধু, ভক্ত পরমবস্তু ভগবান লাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবে, নিজের জীবন পর্যন্ত।

রাত্রি বেশ গরম। ভক্তসভা ছাদে বসিয়াছে। সামান্য ধ্যানের পর শ্রীম ভক্তগণকে সরবৎ খাইতে বলিলেন। অন্তেবাসী পরিবেশন করিতেছেন। শ্রীম বলিতেছেন, দিন এঁকে দিন। ওঁর পাত্র খালি ওঁকে দিন। প্রচুর সরবৎ পান করিয়াছেন ভক্তগণ। শ্রীম ভক্তদের বলিলেন, আপনারা এবার এঁকে দিন। মা-ঠাকরুণ শেষে খেতেন সকলকে খাইয়ে। শেষে খাওয়া ভাল। সরবতের সঙ্গে কি স্নেহ পরিবেশন!

পরদিন সকাল আটটা। শ্রীম দ্বিতলের বারান্দায় অস্থায়ী 'আশ্রমে' বসিয়া আছেন। ঢাকার মিট্‌ফোর্ড মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছেন। তাহার জেঠামহাশয় শ্রীম-র বিশেষ পরিচিত। তাহাদের বাসায় রাখাল মহারাজ প্রমুখ মহাপুরুষগণ গিয়াছেন। ছাত্রটির কাছে তাহাদের বাড়ির সকল সংবাদ লইতেছেন। কথায় কথায় শৌচের কথা উঠিল।

শ্রীম (সহাস্যে) — একখানা গামছা সঙ্গে রাখতে হয়। পায়খানার কাপড় পরে ঘরে আসা উচিত নয়। এসব মানতে হয়। এ সব কি মানুষ মিটিং করে করেছে? ভগবান মহাপুরুষদের দিয়ে করিয়েছেন। কেন, এসব করতে বললেন? মন তৈরি করার জন্য। উড়োন চণ্ডী মন তো! তাকে অন্ততঃ এই কাজে লাগিয়ে রাখ, এই বাহ্য শৌচে। এ বিষয়ে মনটা একাগ্র হলে তখন এটাকে আরও গভীর বিষয়ে, আন্তরিক শৌচে লাগান যাবে। একেই চিত্তশুদ্ধি বলে। এটি হয় ভগবানের চিন্তায়, আমি ঈশ্বরের দাস, পুত্র — এই সব চিন্তা দ্বারা।

এইটির জন্যই বাহ্য শৌচের দরকার। এক ধাপ থেকে আর এক ধাপ ওঠা। যার বাহ্য শৌচ নাই তার অন্তরের শৌচও নাই। আর একটা অবস্থা আছে। সেটা পরমহংসদের, অবধূতদের হয়। তাঁরা কখনও পিশাচবৎ আচরণ করেন। 'শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি'। এ অবস্থা সকলের জন্য নয়। অনেক দূরের কথা, সিদ্ধের অবস্থা। সাধকের অবস্থায় ভালমন্দ শুচি অশুচি এসব মানতে হয়। অন্তর্বহিশৌচের কথা আছে গীতায়।

ছাত্রটি বিদায় লইয়াছে। একটু পর শ্রীম এক ভক্তকে বলিতেছেন, আপনাদের পূর্ববঙ্গে এই বাহ্য শৌচের বড়ই অভাব। তাই তাকে এটা বললাম।

অপরাহ্ন পাঁচটা। শনিবারের ভক্তরা, ললিত, সুশীল, বসন্ত, 'ভবরাণী' প্রভৃতি অফিসের ফেরৎ আসিয়াছেন। একটু পর স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ও মিঃ ডাউলিং আসিলেন। সঙ্গে আর একজন ভক্ত। তারপর আসিলেন সুরপতি দুই জনকে সঙ্গে করিয়া। তারপর আরও তিনজন ভক্ত পর পর আসিলেন। এঁরা সব নূতন। নিত্যকার ভক্তগণ ও বড় জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, বলাই, ছোট রমেশ, বড় অমূল্য, রমণী, অমৃত, জগবন্ধু, বিক্রমপুরের ভক্ত প্রভৃতি আসিয়াছেন।

অত লোকের আবাহন ও তাঁহাদের আপ্যায়নে আজ সন্ধ্যা অতীত। একটু 'নামাজ' পড়িয়াই সাধুকে আম, মিষ্টি ও সরবৎ খাওয়াইতে বলিলেন। এবার শ্রীম-র কথায় জগবন্ধু ভাগবত দশম স্কন্ধের অশীতি অধ্যায় পাঠ করিতেছেন, সুদামা উপাখ্যান। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ মুখে মুখে উপাখ্যানটি বলিলেন। এইবার শ্রীম ইংরেজীতে সংক্ষেপে মিঃ ডাউলিংকে বলিতেছেন।

Sudama was a fellow-student of Sri Krishna in the forest school of the sage Sandipani. Both served their preceptor with the full power of their mind and soul. Once they risked their life in a dense forest being overtaken by a violent storm in the

darkness of night in obedience to the order of their preceptor's wife to fetch firewood. In the morning not finding Krishna and Sudama in the Ashram, Sandipani rushed to the forest and found them in a pitiable condition. Then he blessed them, 'may the knowledge of the Brahman remain fresh in your mind throughout the life'! So, even when Sudama entered the householder's life he remained exactly like a sanyasin, like our Nag Mahasaya. He lived on what chance would have brought him. This was too much for his wife. At her suggestion he approached Krishna who was now a king-maker, for wealth. Krishna received him cordially and fulfilled his desire unasked.

In this story Krishna says as God incarnate that, He is most pleased with those who save their Guru and, also for the smallest present of love and devotion.

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখ, গুরু যখন কৃষ্ণ সুদামাকে আশ্রমে দেখতে পেলেন না তখন উদ্বিগ্ন হয়ে বনে ছুটে গেলেন আর ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করলেন। ভক্তের সামান্য জিনিসে তুষ্ট ভগবান! সুদামার চার মুষ্টি চিঁড়ায় কত আনন্দ প্রকাশ করলেন। আর বললেন, গুরু-সেবাতে আমি সন্তুষ্ট বেশী। ঠাকুরও তাই বলেছিলেন, গুরুতে মানুষ-বুদ্ধি করলে ছাই হবে! গুরু সাক্ষাৎ ভগবান, মানুষরূপে আমার সামনে এসেছেন, এই বিশ্বাস চাই শিষ্যের। (সহাস্যে) সুদামার স্ত্রী অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট সইতে পারলেন না। মেয়েরা প্রায় এইরূপই হয়। ধন, ঐশ্বর্য চাইতে স্ত্রী বলে দিলেন, কিন্তু জ্ঞানী সুদামা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। কিন্তু অন্তর্যামী, বন্ধু-স্ত্রীর বাসনা পূর্ণ করলেন।

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ — এই চতুর্বর্গ ফল ভগবান দেন। কিন্তু শুদ্ধ-ভক্ত কেবল ভক্তি, প্রেম চায়।

বেলুড় মঠ হইতে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ও বাসুদেবানন্দ প্রভৃতি প্রচার কার্যে বালিয়াটি গিয়াছিলেন। সেই সব কথা কমলেশ্বরানন্দ বলিতেছেন। কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, ওখানকার লোক খুব ভক্ত। আমাকে ডেকে নিয়ে যেতো হরিসভায়। অন্যদের নিত না। আমি তাদের ঠাকুরের কথা, ভাগবতের কথা বলতাম। খুব আনন্দে ছিলাম। শ্রীম বলিলেন, দেখুন, মানুষের কেমন একটা instinct (বোধশক্তি) আছে। এঁকে ডেকে নিয়ে যেত, ওদের নয়। ওঁরা জ্ঞানমার্গী কি না।

ডাউলিং ও স্বামী কমলেশ্বরানন্দ বিদায় লইলেন। এইবার শ্রীম গান গাহিতে লাগিলেন।

গান। মা এ তোর কোন দেশী বিচার।
বেড়াই আমি পথে পথে দেখা দিস্‌নি একটিবার॥ ইত্যাদি।

শ্রীম — এই গানে কি অবস্থারই বর্ণনা! একেবারে সন্ন্যাসের অবস্থা। সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে দাঁড়ান অবস্থা। কেবল ঈশ্বরকে চাই। এই অবস্থা ছিল ঠাকুরের। মায়ের দর্শনের জন্য দিনরাত কাঁদতেন গঙ্গার ধারে পড়ে। আহার নিদ্রা নাই। অত ব্যাকুল। তাঁর বিলাপ শুনে নৌকোর মাঝিরা এসে বোঝাতো, সান্ত্বনা দিতো — 'তোমার হবে বাবা, তোমার হবে'। ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য। বুঝতেও পারতেন না অত লোক জড় হয়েছে। ঠাকুর যাকে বলতেন এক ঘটি কান্না, সেই কান্না তিনি নিজে কেঁদেছিলেন ঈশ্বরের জন্য। তবে মা দেখা দিয়ে শান্ত করলেন। অশান্ত শিশু যেমন মায়ের জন্য ব্যাকুল।

এ ব্যাকুলতা মানুষের হয় না, হয় শুধু অবতারাদির। লোকশিক্ষার জন্য তাঁকে অত করতে হয়েছে। যোল টান্ টান্‌তে হয়েছে। মানুষের মোটেই ব্যাকুলতা নাই ঈশ্বরের জন্য। তবুও যদি এ অবস্থা দেখে এক টান্ দু'টান্ টানে। তা নইলে যিনি ঈশ্বর, অবতার হয়ে এসেছেন, তাঁর কি দরকার এ সবের?

ভক্তরা বিদায় লইলেন রাত্রি সাড়ে দশটায়।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — সাধুসেবায় যা সব খরচ হয় লিখে রাখবেন। সাধুদের নাম ধাম সব লেখা চাই। নাম জানা না থাকলে অমুকের সঙ্গে এসেছিলেন, এ বিবরণ লিখবেন। History (ইতিহাস) থাকা ভাল। এটাই পাঁচশ বছর পরে পাকা history হয়ে যাবে।

কলিকাতা।
৭ই জুন ১৯২৪ খ্রীঃ, শনিবার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বর ও বিশ্বশান্তি

১

এখন সকাল সাতটা। ৮ই জুন ১৯২৪ খ্রীঃ, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল। রবিবার, জামাই ষষ্ঠী, ৫৪।১ পল। শ্রীম দ্বিতলের 'আশ্রম' গৃহে বসিয়া আছেন। জগবন্ধুকে বলিতেছেন, যে কয়দিন বেশী গরম থাকে সে কয়দিন সরবৎ করে রাখা ভাল। আট আনার চিনি নিয়ে আসবেন। আর নূতন কুঁজায় ঠাণ্ডা জল থাকবে। আহা, ভক্তরা কতদূর থেকে আসেন রৌদ্রে। ঠাকুর নিজ হাতে জল নিয়ে দেখতেন ঠাণ্ডা কি না। তিনি নূতন কুঁজায় ঠান্ডা জল রাখতেন। অন্ততঃ পাঁচজনের জন্য সরবৎ সর্বদা করে রাখতেন। আবার waste (নষ্ট) না হয়।

অপরাহ্ন ছ'টা। ভাটপাড়া হইতে বড় ললিত আসিয়াছেন। অন্তেবাসী তাঁহাকে সরবৎ পান করাইলেন। শ্রীম ইতিমধ্যে চারতলা হইতে দ্বিতলের 'আশ্রমে' আসিয়াছেন। দারুণ গরম তথাপি চারতলার ঘরে নির্জনে একা থাকেন। শ্রীম ললিতকে নিজ হাতে আম খাইতে দিলেন।

রাত্রি আটটার সময় জগবন্ধু আরও কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া নববিধান ব্রাহ্মসমাজে গেলেন। আচার্য প্রমথ সেন বেদীতে বসিয়া বক্তৃতা দিতেছেন। তারপর ঝামাপুকুর দিয়া আসিলেন ঠনঠনের মা কালীর মন্দিরে। এখানে মায়ের সামনে বসিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান করিলেন। এবার মায়ের চরণামৃত লইয়া মর্টন স্কুলে পৌঁছিলেন।

রাত্রি ৯টা। বড় জিতেন, ছোট নলিনী, শান্তি, বলাই, ছোট রমেশ, বিনয়, বিক্রমপুরের ভক্ত প্রভৃতি শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। আর একটু পর 'প্রবাসী' অফিসের উমেশ চক্রবর্তী আসিলেন। সকলে

সরবৎ পান করিলেন। এখন উমেশের সঙ্গে শিক্ষার কথা হইতেছে।

শ্রীম — একে কি শিক্ষা বলে, কতকগুলি বই মুখস্থ করা? না, হয় এতে চরিত্রগঠন, না হয় culture (মানসিক উৎকর্ষ)। বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে কয় জন ছাত্র জানে — তাঁর মহান চরিত্র, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা, আকাশের মত হৃদয়, সমুদ্রের মত গভীর প্রেম, সর্বস্ব ত্যাগ, এসব কি জানে? না, তাঁর সম্বন্ধে অমুকে কি বলেছে, তমুকে কি লিখেছে, এইসব অসার বস্তু শেখে। বড় স্কলার কে? না, যে এইরূপে পরের মত যত উদ্গার করতে পারে। এগুলি ছেলেদের পড়িয়ে লাভ কি? তাঁর ত্যাগ, বৈরাগ্য, জীবসেবার নাম-গন্ধও জানে না। নির্বাণের জন্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য তাঁর কি ব্যাকুলতা! না খেয়ে সাত বছরে শরীর কঙ্কালসার হল। কি কঠোর সঙ্কল্প, নির্বাণ লাভ না করে আসন থেকে উঠবেন না। অস্থি চর্ম মাংস হাওয়ায় উড়ে যাক, তবুও নির্বাণ লাভ না করে আসন ছাড়বেন না। কেন নির্বাণ চাই? না, তাতেই অনন্ত সুখ-শান্তি লাভ হয়।

এসব গভীর বিষয় শিক্ষকরা নিজেরাও জানে না। ভালবাসে না। তাই ছেলেদের ভিতরও দিতে পারে না। এদিকে বলে culture (মনের উৎকর্ষ) দিচ্ছি। কি culture ((চিত্তোৎকর্ষ) দিচ্ছে? না, কতকগুলি শুষ্ক অনাবশ্যক অপরের মত মাথায় ঢুকাচ্ছে। ফলও তেমনি হচ্ছে। দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে, এই করে করে। ছেলেদের চরিত্র এইভাবে গঠিত হচ্ছে — blank, negative (শূন্যগর্ভ, অবাস্তবতাপূর্ণ) হয়ে যাচ্ছে। Positive, sublime (সত্যিকার, মহান) কিছু ধরতে পাচ্ছে না শিক্ষা দ্বারা।

কর্তাদের এদিকে লক্ষ্য নাই। বিদেশী কর্তা কিনা! কেন তাদের interest (স্বার্থ) থাকবে এতে? নিজেদের কাজের জন্য এ শিক্ষা চালিয়েছে। মানুষ তৈরি করা তো এদের উদ্দেশ্য নয়। বরং উল্টো, যাতে মানুষ তৈরী না হয় সেই প্রচেষ্টা।

এই দেশের কত শক্তির অপব্যয় হচ্ছে। ছেলেদের চরিত্র গঠিত হলে দেশ শক্তিমান হবে। তা হতে দিচ্ছে না।

স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের শিক্ষাই হচ্ছে না, কারণ-শরীরের শিক্ষার তো কথাই নাই! কি দুর্দ্দশাই যে চলছে! কি horrible wastage (ভয়ঙ্কর অপব্যবহার) চলছে human energy-র (মানবের শক্তির)! এই ছেলেদেরই বীর, মহা সুপণ্ডিত চরিত্রবান লোক বানান যায় যদি ঠিক ঠিক শিক্ষা হয়! তা হবার যো নাই। আহা, কি দুর্দ্দশাই যে চলছে গো এই দেশের! অলক্ষ্মী (ব্রিটিশ শাসন) উপরে বসে আছে। ছি ছি, এ শিক্ষা কি শিক্ষা? যদি বলতে হয় বল — but to your greatest loss, at the expense of your Divinity and manhood. (তোমার সর্বনাশ ডেকে এনে বল, তোমার মনুষ্যত্ব, দেবত্ব বিসর্জন দিয়ে বল।)

রাত্রি দশটা।

পরদিন সন্ধ্যা সাতটা। শ্রীম দ্বিতলের 'আশ্রম'-গৃহে বসিয়া আছেন মাদুরে, পূর্ব্বাস্য। শ্রীম-র তিন দিকে ভক্তগণ — বড় জিতেন, বীরেন বোস, জগবন্ধু, শুকলাল, মনোরঞ্জন, শান্তি, বলাই প্রভৃতি। ধ্যানান্তে শ্রীম কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম — জ্ঞানের definition (সংজ্ঞা) জানেন জিতেনবাবু? জ্ঞানের definition (সংজ্ঞা), এই জানা, ঈশ্বর অজ্ঞেয়, তাঁকে জানা যায় না। পূর্ণভাবে যে এটি জানে তার কাছে জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর প্রকটিত হন। যে জানবে, তার ইচ্ছায় তাঁকে জানা যায় না। যাঁকে জানবে কেবলমাত্র তাঁরই ইচ্ছায় তাঁকে জানা যায়, এইটি জ্ঞান। বেদে তাই আছে একথা, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' (মুন্ডক ৩/২/৩ এবং কঠো ১/২/২৩)।

Human efforts, পুরুষকার যখন শেষ হয়ে যায় তখন হতাশা আসে। জানতে পারলাম না তাঁকে, আমার সাধ্যের অতীত, অজানার এই চরম প্রান্তে পৌঁছানোর নামই জ্ঞান। যদি বল — তা যদি হয়, এক মহামূর্খও জ্ঞানী; কারণ সে অজানার চরমপ্রান্তে রয়েছে। তার উত্তর, না, তা নয়। তার যে মোটেই চেষ্টা নাই ঈশ্বরকে জানবার। সে যে মহা তমোগুণাচ্ছন্ন। অজানার চরমে সে পৌঁছায় নাই।

জ্ঞানস্বরূপকে প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে, ডানা ব্যথিত করে যখন কিছুতেই তাঁর নাগাল পাচ্ছে না, এ অবস্থাটাই হলো অজানার চরম point (স্থান)। এই অবস্থায়ই মনে নিশ্চয় হয়, তাঁকে জানা যায় না তাঁর ইচ্ছা ছাড়া। এ অবস্থাকেই বলে জ্ঞান। এটা অবশ্য negative definition ('নেতি নেতি'র পথ)।

'ডেলফিক্ অরেকল্' তাই বলেছিল, গ্রীস্ দেশে একমাত্র জ্ঞানী সক্রেটিস। তিনি এই কথা শুনে নির্জনে বসে অনেক চিন্তা করলেন, কেন তাঁকে জ্ঞানী বললো। বহুদিন চিন্তার পর তিনি স্থির করলেন, 'ও, বুঝেছি। আমি কিছুই জানি না। তাই আমাকে জ্ঞানী বলা হয়েছে।'

ঠাকুর বলতেন, 'এক ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান। আর সব জানার নাম অজ্ঞান। বেদে আছে, যে মনে করে আমি সব জেনে ফেলেছি, সে কিছুই জানে না।

'যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।।

(কেনো ২/৩)

'কথামৃত' পাঠ হইবে। শান্তি পাঠ করিবেন।

শ্রীম (শান্তির প্রতি) — আলোটা এমন জায়গায় রাখা চাই যে, সিঁড়ি ও ঘর দুইই আলোকিত হয়। দেখবো কেমন এটা করতে পার তুমি। আমরা দুই-ই চাই — finite ও infinite (জগৎ ও ঈশ্বর)। ছাদে উঠলে দেখা যায়, যে জিনিসে ছাদ তৈরি, সেই জিনিসেই সিঁড়িও তৈরি। অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন করলে বোঝা যায় তিনিই জীবজগৎ হয়ে রয়েছেন। তা যদি হ'ল, তা হলে finite-কে (জীবজগৎকে) বাদ দিলে চলবে না। তবে প্রথমে উঠবার সময় 'নেতি নেতি' করে উঠতে হয়। তারপর দেখা যায় সবই তিনি। তাই তখন আর finite (জীবজগৎ) বাদ দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ finite ও infinite (জীবজগৎ ও ঈশ্বর) একই পদার্থ। কেবল মাঝখানে একটা hyphen (সংযোগ চিহ্ন) আছে।

এটর্নি বীরেন বোস প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (বীরেনের প্রতি) — হাঁ, বীরেনবাবু, যাচ্ছেন তো বুধবার দিন? Watch (খেয়াল) করবেন। একেবারে অফিস থেকে সিধে চলে যাবেন আদি ব্রাহ্মসমাজে।

ঠাকুর বলতেন, যাদের খুব খাটুনি তারা এক ঘন্টা ধ্যান করে নেবে।

(স্মিতহাস্যে) ওকালতিতে বড় মিছে কথা কইতে হয় নাকি, শুনেছি। কি বলেন, বীরেনবাবু? বড্ড মিছে কথা কইতে হয় বুঝি? হাতিবাগানের সারদা মিত্তির আমায় হাইকোর্টে দেখে বলেছিলেন, 'যাও যাও। তুমি এখানে কেন এসেছো? এ বড় লক্ষ্মীছাড়া, নোংরা জায়গা। এখানে এসো না।' শুনেছিলেন কিনা আমি ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করি! উনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন। তারপর ওকালতি করতেন। পরে হাইকোর্টের জজ হন।

বড় জিতেন — হাঁ মশায় বড় নোংরা স্থান, সত্য মিথ্যা একাকার।

বড় জিতেন ওকালতি পাশ, হাইকোর্টের বেঞ্চক্লার্ক।

শ্রীম — কি আশ্চর্য, কোর্টকে বলে ধর্মাধিকরণ। কিন্তু ওখানেই অসত্যের অত প্রকাশ কেন? তাতেই বোঝা যায়, গোড়ায় গলদ ঢুকেছে। অবশ্য এটাও একটা জাগতিক 'ল' — যেখানে আলো সেখানেই আঁধার। লক্ষ্মীর সঙ্গে অলক্ষ্মী, সত্যের সঙ্গে অসত্য দেখা যায়। কিন্তু অসত্য ছেড়ে সত্য, অন্যায় ছেড়ে ন্যায় পাবার জন্যই কোর্ট, ধর্মাধিকরণ। সে পেতে হলে গোড়া মজবুত হওয়া দরকার। 'ধ্রুবা নীতিঃ' এ কথাটি গীতায় আছে (১৮/৭৮)। একেবারে গীতার শেষ কথা। সঞ্জয় বললেন ধৃতরাষ্ট্রকে, যেখানে কৃষ্ণার্জুন সেখানে বিজয়, সমৃদ্ধি আর 'ধ্রুবা নীতিঃ' অর্থাৎ অব্যভিচারিণী নীতি। দেখ, শত্রুপক্ষের মুখেও কৃষ্ণ সম্বন্ধে কি উচ্চ ধারণা! যদি মূলে এটি থাকে তবেই সত্যের মর্যাদা রক্ষা হয়।

তা হলেই হলো, যেমন রাজা তেমনি রূপ ধারণ করে ধর্ম ও ন্যায়। যদি লৌকিক সত্য প্রকাশও উদ্দেশ্য হয় বিচারের, তা হলে

রাজাও হবে পরম সত্যবাদী। তবেই ন্যায়বিচার সম্ভব। নইলে সব coloured (রঙিন) হয়ে যায়। পুরাণ শাস্ত্রে দেখা যায় রাজ্যে অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অন্যায়, অধর্ম্ম হলেই সমাজপতিগণ রাজাকে শাস্তি দিতেন।

কোর্টে আজকাল কি হচ্ছে? যে উকিল যত নূতন interpretation (ব্যাখ্যা) দিতে পারে 'ল'য়ের, ততই আসল truth-টি (সত্যই) confused (আবরিত) হয়ে যাচ্ছে। এখন জজ কি বুঝতে পারছে না যে অসত্য এসে পড়েছে? কিন্তু কি করে, উপায় নাই। আইনের technicality-তে (কুচক্রেতে) বুঝিয়ে দিয়েছে যে, অপরাধী নিরপরাধ। তাই তার খালাস হয়ে গেল। দুই পক্ষের উকীল যদি খাঁটি সত্য জজের কাছে ধরে, তবেই বিচার ঠিক হতে পারে। কিন্তু তা যে হয় না!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তার জন্যই তো রাম নারদের পায়ে একেবারে সাষ্টাঙ্গ হলেন যুক্ত করে। রাম বললেন, আমাদের কল্যাণের জন্য আপনাদের আগমন। আমরা গৃহী, বিষয় নিয়ে রয়েছি দিনরাত। আপনারা এলে আমরা সত্যের সন্ধান পাই। রাম যদি এরূপ আচরণ না করেন, সাধুদের না মানেন, তবে অন্য লোক মানবে কেন? রাজা যা আচরণ করে প্রজাও তাই অনুকরণ করে।

সংসার অত বড় ঝঞ্ঝাটের স্থান বলেই ঠাকুর অবতার হয়েও লোকশিক্ষার জন্য প্রার্থনা করছেন, 'মা শরণাগত, শরণাগত', 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ ক'রো না।' কেন করতেন প্রার্থনা? দেখতেন কিনা অবিদ্যা মায়ার প্রভাব চারিদিকে। সবই বিষয়ভোগ নিয়ে ব্যস্ত। সত্য, ন্যায়, পবিত্রতার দিকে, বৃহতের দিকে দৃষ্টি নাই। ভগবান সত্য ও ন্যায়স্বরূপ। যে তাঁকে ধরে থাকবে কেবল সেই এ সংসারে সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবে। ঈশ্বরকে ধরে থাকলেই শান্তি — ব্যক্তি ও সমাজের শান্তি, বিশ্বশান্তি।

শ্রীম তিনতলায় আহার করিতে গেলেন। পাছে ভক্তগণ অন্য সব কথার অবতারণা করেন তাই 'কথামৃত' পাঠ আরম্ভ করিয়া গেলেন।

শান্তি পড়িতেছেন দ্বিতীয় ভাগের ত্রয়োদশ খণ্ড। শ্রীম ফিরিয়া আসিয়া নিম্নলিখিতরূপ পাঠ শুনিতেছেন।

পাঠক পড়িতেছেন — (শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন) এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছো, তাঁকে শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যিশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই মহাবাক্যটি ভবিষ্যতে দরকার হবে বলে আগেই তার রক্ষার ব্যবস্থা করে গেছেন। সায়েন্সের প্রভাবে সমস্ত জগৎ এক হয়ে যাচ্ছে, দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধান প্রায় উঠে গেছে। যেন এক পরিবার। নানা দেশ নানা জাত নানা লোকের মিলন এক স্থানে হবে। এই মহাসত্যটি যদি সকলে মনে রাখে তা' হলে উহাই সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করবে। ধর্মসূত্রের প্রভাব সকলের চাইতে অধিক। সকলেরই উপাস্য এক ঈশ্বর, এটি দিয়ে নানা জাগতিক বিরুদ্ধভাবের একত্র সমন্বয় হবে, সম্মিলন হবে। এ মহাবাক্যটি দিক্‌দর্শন। এই উদার সত্যটি ধরে সকলে ভাই ভাই মনে করবে। গোড়ার এই unity-টি (ঐক্যটি) প্রচারের ও প্রকাশের জন্যই এসেছেন ঠাকুর, অবতার। বাহিরের জোড়াতালি দিয়ে শান্তিস্থাপন হয় না। লীগ-অব্-নেশানসের কাজ নয়। জগতের শান্তি যদি চাও তবে সব নেশানকে এই basic truth-টির (মূল সত্যের) উপর দাঁড় করাও।

পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — যা পাঠ হলো তা'তে অনেকগুলি উপদেশ আছে। যারা গৃহস্থাশ্রমে থাকবে তাদের জন্য এগুলি বিশেষ দরকার। সবই practical (ব্যবহারিক)। আবার মূল মহাবাক্যটিও বলে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে — এক রাম তাঁর হাজার নাম। যে সব উপদেশ এখানে বলা হয় নাই অথচ প্রয়োজনীয়, সেগুলি নিজেরা বের করে নাও — এই মূল মুখ্য মহাবাক্য থেকে। কোন সমস্যা উপস্থিত হলে, এই মহাবাক্যটি ধ্যান চিন্তা করে, যে সিদ্ধান্ত মনে উঠবে, তা সম্ভব হলে আবার শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে, সেই সমস্যার সমাধান করা উচিত। বেদেও আছে এই কথা — স্নাতক

ব্রহ্মচারীকে ঋষিরা বলছেন, বিচারসঙ্কট উপস্থিত হলে, কর্তব্য অকর্তব্য সংঘর্ষ উপস্থিত হলে, আমরা যে সব উপদেশ দিয়েছি সত্যাদি সাধনের সে সব কথা স্মরণ করবে। আমাদের আচরণের কথা স্মরণ করবে। আর তোমাদের প্রতিবেশী জ্ঞানী 'সম্মর্শিনঃ' যেরূপে বলবেন, যেরূপ করবেন তাহাই কর্তব্য।

এই সব উপদেশই আছে শাস্ত্রে। মানুষ ভুলে যায়। তাই অবতার এসে আবার এগুলি বললে তখন লোক পালন করে। Repetition-এর (পুনরাবৃত্তির) দরকার।

বেদে আছে 'মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব' (তৈত্তিরীয়/ শিক্ষাধ্যায় ১১/১)। ঠাকুরও তাই বললেন, পিতামাতার সচ্ছন্দ আশীর্ব্বাদ না থাকলে শান্তি লাভ হয় না। পিতামাতার সেবা করতে হয়। এঁদের ঋণ শোধ হয় না। তাই ভক্তদের তিরস্কার করলেন। দেখ, কত বড় কথা বলেছেন, মা দ্বিচারিণী হলেও তার সেবা করতে হয়। স্ত্রী সতীসাধ্বী হলে তার জন্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে যেতে হয়। ঠাকুর নিজে মাঠাকরুণের জন্য একটি কুটীর রেখে গিছলেন, আর চারশ' টাকা। সখীভাবের সাধনের সময় যে সব অলঙ্কার দিছলেন মথুরবাবু সেইগুলি বিক্রী করে এই চারশ' টাকা হয়। বলরামবাবুদের জমিদারীতে জমা ছিল। সুদ হতো বছরে ত্রিশ টাকা। (সহাস্যে) ঠাকুর মাঝে মাঝে আমাদের জিজ্ঞেস করতেন, আচ্ছা, একজন ব্রাহ্মণ বিধবার মাসে দু টাকা হলেই হয়ে যায়, কি বল? এদিকে তো দিনরাতের খবর নাই, গায়ে কাপড় আছে কি নাই তার খবর নাই, ওদিকে কত ভাবনা! কেন এসব করলেন, না অপরে ইহা পালন করবে।

হরিশকে বললেন, 'তোমার যদি একান্তই ব্যাকুলতা হয়, ঈশ্বর-চিন্তার জন্য, বেশ তো কর না! তবে আগে স্ত্রীর অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে কর।' স্ত্রীপুত্র খেতে পাচ্ছে না, আর পতি ধর্ম্ম করুক, এ তাঁর মত নয়।

রামপ্রসন্ন কৃষ্ণকিশোরের ছেলে। তার মা খেতে পাচ্ছে না। আর সে সাধুসেবার নাম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর তার এই আচরণকে

condemn (তীব্র নিন্দা) করলেন।

ঠাকুর নিজের গর্ভধারিণীকে নিজের কাছে রেখে দিছলেন অনেক বছর। প্রথমে কুঠীর ঘরে থাকতেন। সেই ঘরে ঠাকুরের মা, অক্ষয় ও ঠাকুর থাকতেন। অক্ষয়ের শরীর ত্যাগ হলে সেই ঘর ছেড়ে এ ঘরে এলেন, এখন যেখানে বিছানা। দেখ নিজের দেহজ্ঞান বোধ নাই, সেই অবস্থায় মাকে এনে কাছে রেখেছিলেন। রোজ সকালে মাকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করতেন, 'মা, ভাল আছ?' — রোজই এক কথা। আমাদের গল্প করে বলতেন এসব কথা।

বাপ মা'র চোখের জল পড়লে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান রুখে দাঁড়াবে। এমনি কাণ্ড। তবে যদি ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাকুল হয়, দেহের জ্ঞান না থাকে, তখন এই কর্তব্য থাকে না। তখন ঈশ্বর স্বয়ং তাদের ভার লন। সে ক'জনের হচ্ছে? তা না হ'লে মা বাপের সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাত্রি দশটায় সভা ভঙ্গ হইল।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
৯ই জুন ১৯২৪ খ্রীঃ। ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল।
সোমবার, শুক্লা সপ্তমী ৫৩।৩ পল।

সপ্তম অধ্যায়

জীবশিব সেবায় নিয়োজিত ব্রহ্মজ্ঞ নরেন্দ্র

১

আজ ১০ই জুন, ১৯২৪ খ্রীঃ, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল, মঙ্গলবার। অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা। বেশ গরম। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের খাজাঞ্চি যোগেন আসিয়াছেন, সঙ্গে পুত্র খোকা ও একজন সঙ্গী। তাঁহারা দ্বিতলের 'আশ্রম' ঘরে বসিয়াছেন জগবন্ধুর নিকট। ঘরে মণি আর গদাধরও আছেন। শ্রীম পাঁচটায় চারতলা হইতে ঐ ঘরে আসিলেন। একটু পর ভক্তপ্রবর ডাক্তার কার্ত্তিক বক্সী আসিলেন। যোগেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কর্মচারীদের কথা কহিতেছেন।

যোগেন (শ্রীম-র প্রতি) — ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না। কিছুতেই চুরি বন্ধ করা যায় না। এ অবস্থায় কি করে ওখানে থাকা যায়? আবার ওরা সকলে এক জোট।

শ্রীম — ওরা সব family men (গৃহস্থ)। ওসব করে familyর (পরিবারবর্গের) জন্য। ওদের তো খাওয়াতে হবে? তাই না ক'রে করে কি? নীতি শাস্ত্রে আছে, 'না বলিয়া লইলেই চুরি করা হয়'। কিন্তু এ নীতি পালন করা সাধারণের পক্ষে বড়ই কঠিন। মনে কর, পুত্র অনাহারে মরছে। তখন নীতি-টিতি উল্টে যায়। তাই ঠাকুর বলতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। মানুষের জীবন-ধারণের জন্য যা bare necessity (একান্ত আবশ্যক), সেটি না পেলে সব নীতি ভুলে যায়। দু'চার জন exception (ব্যতিক্রম) হতে পারে।

আপনি সব শোধরাতে যাবেন না। তা হলে পারবেন না। শেষে নিজেকেই সরে যেতে হবে। অমন স্থানে থাকা! ঠাকুর ত্রিশ বছর ছিলেন ওখানে। এই জন্যই তো ওখানে রয়েছেন। আর জগদম্বার সেবা দেখা। ব্যস, এই পর্যন্ত হলেই হল। ওদের ভাল কথায় দুই

একবার বলা। কিছু ফল না হলে, চুপ করে আপনার কাজ আপনি দেখা। পেটে খেলে পিঠে সয়, ঠাকুর বলতেন।

ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। যে স্থানটা দিয়ে জল পড়ছে সে স্থানটি সেরে দেওয়া। তা না পারলে ছাতা ধরে বসে থাক। যখন সমস্তটা ছাদ দিয়ে জল পড়ে তখন মনিবকে বল সারাতে। ওটা আপনার কাজ নয়। আপনার কাজ ছাতা ধরে বসে থাকা — ঈশ্বর চিন্তা করা। খেতে পাচ্ছেন, পরতে পাচ্ছেন, থাকার জন্য অত বড় ঘর পাচ্ছেন। আবার কিছু নগদও পাচ্ছেন। এসব সুবিধা দেখছেন না? একসঙ্গে অত সুবিধা কোথায় পাবেন? কি জন্য ওখানে থাকা, এ উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে অন্য সব আপনি ঠিক হয়ে যাবে। ভগবান মানুষ-শরীরে ওখানে ত্রিশ বছর ছিলেন। ওখানকার প্রতি ধূলিকণা অতি পবিত্র। এই ঐশ্বর্যের লোভেই না ওখানে থাকা?

যোগেন — এতে আমার পাপ হবে না, দেখে বুঝেও যদি বাধা না দিই?

শ্রীম — শক্তি যদি থাকে তবে বাধা দেওয়া। শক্তি না থাকলে ভগবানকে বলা। আর আপন কাজ করে যাওয়া। শ্রীকৃষ্ণ তাই জরাসন্ধকে বলেছিলেন, আমার শক্তি আছে তোমার এই অন্যায় কার্যে বাধা দেবার। জরাসন্ধ ছিয়াশিজন রাজাকে জোর করে বেঁধে রেখেছিল। (যোগেনের প্রতি) দেখুন, আপনি যদি পারেন ঐরূপ প্রতিকার করতে। কে শুনবে আপনার কথা? মন্দিরের মালিকরা তা জানে না? সাধ্যের অতিরিক্ত হলে তখন ভগবানের উপর ভার দিতে হয়। জগতে কতরকম পাপাচরণ হচ্ছে। ভাল লোক কি তা বুঝতে পারছে না? কি করে, প্রতিকার সাধ্যের অতীত। তাই ভগবানকে ভার দেয়। এজন্য ভগবান যুগে যুগে এসে খানিকটা ভাল করে দিয়ে যান। আবার মলিনতা আসবে! সংসারে এসব থাকবেই। দোষে গুণে জগৎ। খাদ না হলে গড়ন হয় না। নির্দোষ এক ভগবান। আর দেখছি তাঁরই অবতাররূপ ঠাকুরকে। ঠাকুরও 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'। ব্রহ্ম ও জগতের সন্ধিস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ।

আমাদের দরোয়ান পীতাম্বর সতের টাকা পায় এখানে। কয়েক দিন থেকে খালি বলছে, ‘মেরা বিমার হো গিয়া’। কিন্তু অন্য স্থানে তলেতলে কর্মের চেষ্টা করছে। মাইনে হবে বিশ টাকা। শুনে আমার রাগ হলো। তখন আর একজন (শ্রীম-র স্ত্রী) আমায় বোঝাচ্ছেন, কি হয়েছে তাতে? সে গরীব লোক। বেশী টাকার জন্য চেষ্টা করছে। তা'তে দোষ কি? বাবুরা যে নূতন কর্ম্মের চেষ্টা করে তাতে দোষ নাই? এই কথা শুনে তখন আমার চৈতন্য হ'ল। ভাবলাম, তাইতো সকলেই তো বেশী পেতে চেষ্টা করে। সংসারী লোক করে কি? কত দিকে তার অভাব। তার পর আবার বাসনার পিষণ রয়েছে।

সত্যিকার দোষ, পাপ — যা ঈশ্বর থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায়। আর পুণ্য, ধর্ম — যা ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। এটা হলো পাপপুণ্যের general standard (সাধারণ নিয়ম)।

যার পেটে অন্ন নাই, পরনে বস্ত্র নাই, অসুখে ছেলে মরছে, সে কি শুনবে তোমার এ কথা? তাই ভগবান নিজেই অন্ন বস্ত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছেন। আবার বুদ্ধিও দিয়েছেন ভগবান। শরীর দিয়েছেন, খেটে খেতে। এতেও যখন পেরে ওঠে না তখন করে কি?

সন্ধ্যার পর ছাদে ভক্তসভা বসিয়াছে। বড় জিতেন, শুকলাল, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, জগবন্ধু, গদাধর, ছোট জিতেন প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া শ্রীম মাদুরে বসিয়া আছেন। কথাবার্তা হইতেছে।

বড় জিতেন — আশুবাবুর অনেক গুণের কথা শোনা যাচ্ছে।

শ্রীম — আজ একজনের কাছে শুনলাম, ইউনিভারসিটিতে অত সব কর্মচারী, এদের সকলের ঘরের খবর রাখতেন আশুবাবু। এরূপ দয়া না থাকলে অত বড় হতে পারে? মান্‌বে কেন লোক? ভয়ে কয় জন মানে, আর কয় দিন মানে? হৃদয়ের টান হয় দয়া স্নেহ পেলে। একটি ঘটনার কথা শোনা গেল। একদিন একজন কর্মচারী অফিসে এসে খুব কড়া কড়া কথা বলছিল আশুবাবুর সঙ্গে। তিনি তো অবাক্। তাই কিছু না বলে অন্য একজন কর্মচারীকে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। সে এসে দেখে ওর ছেলে মর মর, আবার

দারুণ অভাব। ঐ কথা আশুবাবু শুনে তখনই ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য ও সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আর তাকে ছুটি দিলেন। এটি কত বড় গুণ? তবেই তো লোক এঁর কেনা হয়ে থাকতো!

দয়া না থাকলে আবার মানুষ? ঠাকুর বলতেন, দয়া সত্ত্ব গুণের ঐশ্বর্য। বিদ্যাসাগর মশায়ের কত দয়া। তাইতো ঠাকুর নিজে গেলেন দেখা করতে। বিদ্যাসাগর মশায় জানতেন, তিনি যাদের উপকার করেন, তারা অনেকে তাঁর নিন্দা করে। তবুও তিনি দয়া ছাড়েন নাই।

দুটো স্ট্যান্ডার্ড আছে, একটা সাধারণ মানুষের, আর একটা তার উপরে যারা আছে তাদের। একটা স্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে বিচার করলে চলবে কেন? যে যে স্তরের, সেই মাপকাঠিতে তাকে দেখতে হবে। ঠাকুরের স্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে কি সকলকে মাপা চলে? মাপলে দেখা যাবে সব found wanting (কম পড়ছে)। ঠাকুরের কাছে ভাল, যাতে মন ভগবানে যায় তাই, আর সব মন্দ। এ আদর্শ ক'জনে নিতে পারে?

ডাক্তার কার্তিক বক্সী বীর ভক্ত। গৃহে থাকিয়া তীব্র সাধনা করিতেছেন। একটি সন্তানের পর ভাইবোনের মত স্বামী-স্ত্রীতে বসবাস করিতেছেন।

ডাক্তার বক্সী (শ্রীম-র প্রতি) — ঘরে থেকে ব্রহ্মচর্য বড়ই কঠিন।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, বদ রক্ত বের হয়ে যাওয়া ভাল। বিশ হাজার বছর পূর্বে ঋষিরাও এই কথাই বলেছেন। সারাদিন তাঁরা তপস্যা করেছেন, রাত্রিতে স্বপ্নদোষ হয়ে গেল। তখন উঠে কাঁদছেন। এমনি কাণ্ড।

এসব অন্ত্রের দোষে হয়, ঠাকুর বলতেন। তাছাড়া পূর্বজন্মের সব সংস্কার রয়েছে। এ জন্মে না হয় বিয়ে না করলে? ও সব সংস্কার মনে ওঠে রাত্রিতে। তাছাড়া sights and scenes-এর (বাহ্য বিষয়ের) প্রভাবও রয়েছে।

ঠাকুর বলতেন, ওতে দোষ নাই, ওরকম হয়। ঈশ্বরেতে মন রাখার চেষ্টা করলে ক্রমে এই সব দোষ চলে যায়। একজন ভক্তকে

(শ্রীমকে) অভয় দিয়ে ঠাকুর বলেছিলেন, তোমার কামজয় হবে। শেষে তাই হলো। ভগবানদর্শন করলে কাম যায়। তখন কামাদি পোড়া দড়ির মত থাকে। তাতে বন্ধনের কার্য হয় না, ফুঁ দিলে উড়ে যায়।

ভয় নাই, ঠাকুরকে ধরে থাকলে তিনি নিশ্চয় সব করে দিবেন।

এইবার ‘কথামৃত’ পাঠ হইতেছে — তৃতীয় ভাগ, দ্বাদশ খণ্ড। শ্রীম ধ্যানস্থ হইয়া শুনিতেছেন। যেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দৃশ্যগুলি ভাসিতেছে। কিছুক্ষণ ধরিয়া একটি প্রশান্ত ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, অনেকক্ষণ পর শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — তিনি যদি গ্রহণ করেন তা হলে আর ভয় নাই। তখন গৃহেই রাখুন, বা সব ত্যাগ করিয়েই নিন, তাদের তাঁর কাজে লাগান। কেবল অবতার পারেন এটি করতে, অপরে পারে না।

নিজেকে কত করে প্রকাশ করেছেন, স্পষ্ট বলেছেন, আমি যুগে যুগে অবতার হই। আবার বলেছেন, ‘এবার দেখলাম সত্ত্বগুণের পূর্ণ আবির্ভাব।’ তাইতো বেশী লোক টের পায় নাই। রজঃ তমের ঐশ্বর্য থাকলে বহু লোক আকৃষ্ট হয়। সত্ত্ব সকলে ধরতে পারে না। যাদের সত্ত্বগুণ প্রধান তারাই কতক ধরতে পারে।

আবার কেমন justify (নিজের অবতারত্ব সমর্থন) করছেন, দেখ যদি কেউ বলে, যদি ঈশ্বরই অবতার হয়ে অর্থাৎ মানুষ শরীর নিয়ে এসেছেন, তবে মা কালীর দর্শনের জন্য এতো তপস্যা কেন করলেন? তার উত্তর নিজেই দিয়েছেন, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল। আবার রাম অকালে দেবীর অর্চনা করেছিলেন।

এর মানে এই, দেহ ধারণ করলেই শক্তির এলাকায় এলো। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ হলেও দেহধারী মাত্রই শক্তির এলাকায়। তা জীবই হউক কি অবতারই হউক। তাই শক্তির পূজা দরকার। এই সত্যটি জগৎকে শেখাবার জন্য শক্তির আরাধনা নিজে করলেন।

তিনি নিজেই শক্তি, নিজেই ব্রহ্ম আবার নিজেই ভক্ত।

ভক্তগণ কেউ কেউ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — দেখুন, কাল 'কথামৃত' পড়া হচ্ছিল, মা দ্বিচারিণী হলেও পুত্র মায়ের সেবা করবে। আজ আবার বললেন, যে-মা ও কথা বলে সে-মা মা নয় — সে অবিদ্যারূপিণী। সে-মা'র কথা না শুনলে দোষ নাই। সে-মা ঈশ্বর লাভের পথে বিঘ্ন। তাই তার কথা না শোনা। নজীর দিলেন, ভরত কৈকেয়ীর কথা শোনেন নাই।

কেবল ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে মায়ের কথা শুনবে না। কিন্তু আর অন্য সব কথা শুনতে হয়, এই কথাই ঠাকুরের অভিপ্রায়।

এই সব কথাতে বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ করা যায়। এমন যে বাপ মা, যাদের ঋণের শোধ হয় না, তাদেরও ত্যাগ করা যায়। কিন্তু খাঁটি ভালবাসা হওয়া চাই ঈশ্বরের জন্য। কেন বললেন এ কথা? এর কারণ এই, ঈশ্বর সকলের আত্মা, বাপ মায়েরও আত্মা। তাই এই পরমাত্মার জন্য অন্য সব ত্যাজ্য।

রাত্রি দশটায় সভা ভঙ্গ।

২

মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দা। সকাল আটটা। আজ ১১ই জুন ১৯২৪ খ্রীঃ, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল, বুধবার।

শ্রীম বেঞ্চেতে দক্ষিণাস্য বসিয়া আছেন। সম্মুখের ঘরে জগবন্ধু মণি প্রভৃতি ভক্তগণ। মর্টন স্কুলের শিক্ষক জ্ঞান চক্রবর্তী আসিয়াছেন। স্কুলের কথা হইতেছে।

শ্রীম (জ্ঞানের প্রতি) — আপনার কি মত বাংলার মাধ্যমে পড়ানো সম্বন্ধে? ইংরেজীতে যে পড়ানো হচ্ছে এতে কিছুই কাজ হচ্ছে না। বরং উল্টো উৎপত্তি হচ্ছে। অযথা সব energy (শক্তি) নষ্ট হচ্ছে। মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা হলে সেটি হয় পাকা শিক্ষা আর স্বাভাবিক। আমাদের স্কুলে যে বাংলায় পড়ান হচ্ছে এতে ভাল

হচ্ছে কি?

জ্ঞান — ভাল তো হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষকদের তেমন ইচ্ছা নাই। খাটুনি বেড়ে গেছে। তারা নিজেরা ইংরেজীতে পড়েছে। তাই সেই অভ্যাসটা ছাড়তে চাইছে না।

শ্রীম — ছেলেদের উপকার তো হচ্ছে? তবেই হলো। শিক্ষকরা প্রথমে আপত্তি করলেও পরে বুঝতে পারবে এ প্রণালীই ভাল। আর ভবিষ্যতে ঐ প্রণালীতে শিক্ষা চলবে না। মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতেই হবে। দুদিন আগে আর পরে। তা আমরাই প্রথমে আরম্ভ করলাম কিছু আগে। (সহাস্যে) আপনারা লিডার হলেন আর কি! নতুন কিছু করতে গেলে প্রথমে একটু বাধা আসে, একটু আপত্তি হয়েই থাকে।

অন্তেবাসী অসুস্থ। ডাক্তার কার্তিক বক্সী তাঁহাকে দেখিতেছেন। শ্রীম তাঁহার সহিত ঈশ্বরের পথের বিঘ্নের কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — ভোগান্ত না হলে মন যায় না ভগবানে। দেখুন না আশুবাবুকে। ভগবান তাঁকে কত দিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি, মান, প্রতিষ্ঠা, ধন, ঐশ্বর্য, উচ্চ পদ, আর কত গুণ! তাঁর উচিত ছিল অবসরের পর ঈশ্বর-ভজন করা। তা হলো না, এ জন্মে আর হলো না। কয় জন্ম পিছে পড়ে গেল। এই মনটাই যদি ঈশ্বরের দিকে দেওয়া যায়, তাহলে এসব গুণের দাম সহস্র গুণ লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না।

সকাম ভক্তও অভক্তের চাইতে ঢের ভাল। গীতায় তাকেও উদার বলা হয়েছে। সে জাগতিক ভোগের জন্য ঈশ্বরকে ডাকে। জন্ম জন্ম সংসার ভোগ করে — সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ভোগেরও অন্ত নাই — তখন বুঝতে পারে এতে শান্তি নাই, শাশ্বত সুখ নাই। একেই বলে ভোগান্ত। তখন কেবল ঈশ্বরকে চায়, তাঁর জন্য ব্যাকুলতা হয়। রাবণ, ধ্রুব, সুরথ রাজা এঁরা সকাম ভোগের জন্য তপস্যা করেছিলেন। এ তপস্যাটাও কাজে আসে পরে। এতে মনে একাগ্রতা, সংযম এসব হয়। এই মনটাই শেষে ঈশ্বরের দিকে দিলে, জ্ঞান, ভক্তির জন্য তাতেই তাঁর কৃপায় তাঁর দর্শন হতে পারে। তপস্যা একই রকম।

পার্থক্য কেবল প্রার্থনায়। সকাম ভক্ত চায় সংসারের ঐশ্বর্য, আর নিষ্কাম ভক্ত চায় জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, সমাধি এইসব ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য। সকাম ভক্তের মনটা তো তৈরী হয়ে রইলো।

এখন সন্ধ্যা আটটা। ছাদে ভক্তসভা বসিয়াছে। বড় জিতেন, শুকলাল, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, জগবন্ধু, ছোট জিতেন, ছোট নলিনী, গদাধর, মনোরঞ্জন, বলাই প্রভৃতি আসিয়াছেন। শ্রীম ভক্তপরিবৃত হইয়া চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়াছেন। আকাশের চাঁদ দেখিতেছেন একমনে। তারপর 'কথামৃত' বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কুন্তীদেবীকে শ্রীকৃষ্ণ ধরা দিছলেন। যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, এঁরাও ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভুলিয়ে দিতেন। তা নইলে যে লীলা হয় না। অবতার হয়ে এসেছেনই ভক্তদের নিয়ে কাজ করতে। তবে জগতে সাধুদের পরিত্রাণ হবে, আর অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের সংস্থাপন হবে। সকলের যদি সর্বদা তাঁর স্বরূপের জ্ঞান থাকে, তবে তাঁকে নিয়েই তারা পড়ে থাকবে। তখন কাজ করবে কে? তাই ভক্তদের এক একবার পরিচয় দেন, আবার সব ভুলিয়ে অজ্ঞানে ফেলে দেন। এই করে কাজ করিয়ে নেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, অর্জ্জুন স্তব করলেন, 'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুযোত্তম' (গীতা ১০/১৫)। আবার যুদ্ধের পর সব ভুলে গেলেন। তাঁর ভুবনমোহিনী মায়ার এমনি খেলা!

যুধিষ্ঠির অতবড় জ্ঞানী, তাঁরই ভুল লাগিয়ে দিলেন। যুদ্ধের পর ইনি বলতে লাগলেন, আমি রাজা, আমার জন্যই এই সব লোকক্ষয় হয়েছে। এ ভেবে ভেবে মহা অশান্ত হয়ে পড়লেন। কত বোঝালেন, কৃষ্ণ স্বয়ং — তোমার পাপ হয় নাই। আমার কথাতেই যুদ্ধ হয়েছে। সব দায়িত্ব আমার। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অহংকার গেল না। ভীষ্ম, ব্যাস, এঁদের কথায়ও শান্ত হতে পারলেন না। কেন, এটি হল? তা নইলে যে রাজসূয় হয় না। রাজসূয় না হলে ধর্ম-স্থাপন হয় না। এই জন্য যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি ঐরূপ হল। নইলে কৃষ্ণ কি যুধিষ্ঠিরের ঐ ভাবটা মন থেকে দূর করতে পারতেন না? আর রাজসূয়ের আর একটা

ফল হল — শ্রীকৃষ্ণকে best man, ideal man (পুরুষোত্তম, আদর্শ পুরুষ) বলে প্রচার করা হলো। কেন ideal man (আদর্শ পুরুষ)? তার উত্তর নিজেই দিচ্ছেন ঃ—

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে।।

(গীতা ৪/১৪)

অত কর্ম করলেন, যুদ্ধ বিগ্রহ কত কি। কিন্তু বলছেন, 'ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি' — কর্ম আমাকে লিপ্ত, আসক্ত করতে পারে না। কি করে করবে? এর একটু পূর্বেই বললেন, 'সম্ভবামি যুগে যুগে' (গীতা ৪/৮)। অর্থাৎ আমি পরমাত্মা, ইদানীং নররূপ ধারণ করেছি। আবার বলছেন, যে আমাকে এই রূপে অর্থাৎ পরমাত্মারূপে জানবে সেও কর্মে আসক্ত হবে না, শত কর্ম করেও। এইরূপ জ্ঞানবানের কর্ম তখন হবে প্রত্যাদিষ্ট কর্ম, লোক শিক্ষার জন্য।

দেখ না, নরেন্দ্রকে। কত কর্ম করলেন — বক্তৃতা, প্রচার, মঠ স্থাপন কত কি। কিন্তু তিনি কিছুতেই আবদ্ধ হন নাই। কেন? পরমাত্মাকে, ঠাকুরকে জেনে করেছে তাই। তাঁকে ঠাকুর জানিয়েছিলেন, পরমাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। তবেই তো স্তব করলেন ঠাকুরকে, 'খণ্ডন ভব-বন্ধন' বলে। ঠাকুর বলেছিলেন, 'চাবিকাটি আমার হাতে রইল। সময় হলে খুলে দিব। এখন যা, মা'র কাজ কর।' দেখ কি কাণ্ড! আত্মদ্রষ্টাকেও ঠাকুর, ঈশ্বর ইচ্ছামত কাজে লাগাতে পারেন। এ রহস্য কেবল বিচার করে বোঝা যায় না।

তাই ঠাকুর বলতেন, সব তাঁর (জগদম্বার) 'অণ্ডারে'। শরীর ধারণ করলেই জগদম্বার এলাকায় এসে গেল।

নরেন্দ্র যদি সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতেন তবে মায়ের কাজ করতো কে? ভারত ও জগতের কল্যাণের জন্যই সমাধিবান নরেন্দ্রকেও কাজে লাগালেন।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা প্রসঙ্গে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — তিনি সর্বদা ভুলিয়ে দেন।

আমাদের বেয়ারা পীতাম্বর, মিথ্যা কথা বলে বেশী টাকায় অন্য খানে কাজ নিয়েছে শুনে, আমাদের রাগ হল। আমাদের তিনি ভুলিয়ে দিলেন। আবার অন্য একজনের মুখ দিয়ে যখন তিনি শোনালেন যে, দেহ ধারণের প্রয়োজনে সে মিথ্যা বলেছে, তখন আমাদের চৈতন্য ফিরে এল। এই ভাবলুম, ও দেহরক্ষার জন্য মিথ্যা বলেছে। ঈশ্বরই দেহ ধারণের জন্য এই চেষ্টা দিয়েছেন। তা নইলে জগৎ থাকে না। শাস্ত্রে আছে এ কথা, দেহরক্ষার জন্য মিথ্যাও বলা যায়। অবশ্য এটা নিম্নাদর্শের, জাগতিক দৃষ্টির দিক দিয়ে বলা হয়েছে এ কথা। সত্য কথা বলে ক্রাইস্ট ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। এটি উচ্চাদর্শ।

আমরা একটা বিড়ালছানার সেবা করেছিলাম, খাইয়ে দাইয়ে বেশ বড় করা গেল। কোত্থেকে এসে পড়েছিল। তখন বাধ্য হয়ে অতিথি নারায়ণের সেবা করতে হল। বড় হয়ে ছাদে পাখীদের তাড়া করতো। একদিন দেখি একটি পাখি মেরে বসে খাচ্ছে। আমাদের বেশ রাগ হলো। তখন একটি শিশু, বছর ছয়েক বয়স, আমায় চৈতন্য করিয়ে দিল। সে বললো, 'স্যার, এর দোষ কি? ওর স্বভাব যে এই'। এই কথা শুনে আমার চৈতন্য হ'ল।

দেখুন সব ভুলিয়ে দেন মহামায়া। আবার তিনিই সময়ে চৈতন্য করিয়ে দেন। তিনি ভুলিয়ে রাগ করালেন, আবার তিনিই শিশুর মুখ দিয়ে চৈতন্য করালেন।

এই lower 'I'টা (কাঁচা আমিটা) দিয়ে সব ভুলিয়ে দেন। নইলে যে কেউ কাজ করবে না! তিনি জগৎ রক্ষার জন্য এই আলো-আঁধারের খেলা খেলছেন। মানুষ হয়ে এসে ঠিক মানুষের মত ব্যবহার, স্নেহ-মমতা, কত কি দেখালেন। আবার আর এক অবস্থায় এসব জিনিষে মন নাই। সব পড়ে আছে এখানে। মন ভগবানে মগ্ন। নুনের পুতুল, সমুদ্র মাপতে গেছে। জল গায়ে লাগতেই গলে জল হয়ে গেল। কাঁচা 'আমি'টা পাকা 'আমি'তে লয় হয়ে গেল। ঠাকুরের মন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণে বিচরণ করছে। যেন একতলা

থেকে চারতলায় উঠছে আবার নীচে নামছে। যেন নৌকোর 'বাচ' খেলা।

ঠাকুরের জীবনের এই সব দিক দেখে সংসারে থাকলে আর ভয় নাই। সে ব্যক্তি কর্ম বন্ধনে পড়বে না — 'কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে'। জীবন্মুক্ত।

উপায়ও বলে দিলেন — নিত্য সাধু সঙ্গ কর আর নির্জনে, গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বল, প্রভো আমায় বুঝিয়ে দাও। ঠাকুর নিজে এই সহজ পথ দিয়ে গিছলেন। এই সহজ পথ দেখাবার জন্যই তাঁর আগমন।

তাঁর এই কথায় বিশ্বাস হলে আর কিছু করতে হয় না। তখন সব ভার তাঁর। নইলে কর্ম বেড়ে যায়। তখন রাজসূয় করতে হয়।

সভা ভঙ্গ, রাত্রি দশটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১১ই জুন, ১৯২৪ খ্রীঃ, বুধবার।

অষ্টম অধ্যায়

সন্ধিস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ

১

আজ দশহরা গঙ্গাপূজা। শ্রীম অতি ভোরেই ভক্তদের মঠে যাইতে বলিলেন। জগবন্ধু, বিনয় ও ছোট জিতেন ছয়টায় রওনা হইয়া গেলেন। আজের দিনে গঙ্গার সমগ্র তীরবর্তী সকল স্থানে আনুষ্ঠানিকভাবে গঙ্গা পূজা প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক দশ প্রকার পাপ নাশ হয় আজ গঙ্গা স্নান করিলে, তাই দশহরা গঙ্গাস্নান বলা হয়।

বেলুড় মঠেও গঙ্গাতীরে অতি শ্রদ্ধার সহিত আনুষ্ঠানিক পূজা হইতেছে। গঙ্গা জোয়ারের জলে পরিপূর্ণ। আজ মঠে বহু ভক্ত সমাগম। তাঁহারা ও সাধুগণ গঙ্গায় স্নান করিতেছেন। কেহ কেহ সন্তরণ করিয়া অপর পারে গিয়াছেন। খুব আনন্দোৎসব চলিতেছে। পূজার পর প্রসাদী কাঁটাল, আম প্রভৃতি বহুবিধ ফল, আর দুধ, পায়েস ও সন্দেশাদি মিষ্টি, জলে উৎসর্গ করা হইতেছে। সাধু, ভক্তগণ সন্তরণরতাবস্থায় ঐ সব প্রসাদ লুফিয়া লইতেছেন। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই আনন্দোৎসব দর্শন করিতেছেন।

মধ্যাহ্নে আজ কাশীপুরে ডাক্তার বক্সীর গৃহেও আনন্দোৎসব। ভক্তগণ সারাদিন পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যান ও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন।

সন্ধ্যায় ভক্তসভা বসিয়াছে মর্টন স্কুলের ছাদে। শ্রীম মাদুরে বসা, উত্তরাস্য। তাঁহার তিনদিকে বসিয়া আছেন বড় জিতেন, শুকলাল, এটর্নি বীরেন, উকীল ললিত ব্যানার্জী, বলাই, ছোট রমেশ, বড়

অমূল্য, শান্তি, অমৃত, গদাধর, বিক্রমপুরের ভক্ত ও তাহার সঙ্গী, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, ছোট জিতেন, জগবন্ধু প্রভৃতি।

একটি বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়াছেন, সঙ্গে দুইজন বন্ধু। শ্রীম তাঁহাকে মাদুরে বসিতে বলিলেন। উনি শ্রীম-র সঙ্গে একাসনে বসিবেন না। শ্রীম যত বলিতেছেন বসিতে, ভক্ত তত 'না-না' করিয়া শ্রীম-র অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। শ্রীম বিরক্ত হইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি) — আপনি যখন আমাদিগকে অত ভক্তি করেন, তখন আমাদের কথা শুনতে হয়। ভক্তি করছি অথচ কথা শুনছি না, এ কেমন কথা? তাই বুঝি ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?' (St. Luke 6:46) এদিকে 'প্রভো প্রভো' করা হচ্ছে আবার কথা শোনা হচ্ছে না, এ কেমন ভক্তি?

কথা শুনতে হয়, গুরুজনদের কথা। গুরু মানে ঈশ্বর, অবতার। নররূপী যে গুরু, তাঁকেও ঈশ্বরের রূপ মনে করতে হয়। তাই কথা মান্য করতে হয়। মহাজনদের আদেশই প্রসাদ।

দক্ষিণেশ্বরে এক বৈষ্ণব সাধুকে ঠাকুর প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সাধু লুচিটুচি সব ছুঁড়ে ফেলে দিল। মা কালীর প্রসাদ খাবে না। শুনে ঠাকুরের খুব রাগ হল। বললেন, শালাকে কেউ পা থেকে মাথা পর্যন্ত মেরে মেরে তাড়িয়ে দেয়, তবে আমার আহ্লাদ হয়। তিন চারদিন পর মালীদের সঙ্গে ঝগড়া করায়, ওরা মেরে তাড়িয়ে দেয়। বলেছিলেন, 'শালা মায়ের প্রসাদ ছুঁড়ে ফেলে দিল? না খাও তো অপরকে দিয়ে দাও, নয়তো ফিরিয়ে দাও। তা না করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে?' গুরুজনদের আজ্ঞাই প্রসাদ।

'তৃণাদপি সুনীচেন', এখানে এটা নয়। তারপর, হৃদয়ে ভগবান আছেন কিনা তাই তাঁকে আসনে বসাতে হয়।

ভক্তটি এতক্ষণে আসিয়া মাদুরে বসিলেন। শ্রীম গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আজ খুব দিন গেছে। 'ফেরি'তে গেলে

দেখা যায় গঙ্গার দুধারে অগণিত লোক স্নান করছে। কেউ আসছে কেউ যাচ্ছে। এই সব দিনে যেন ধর্ম মূর্তিমান হয়ে ওঠে। এ সব দর্শন করলে চৈতন্য হয়।

শ্রীম — আজ কেউ মঠে গিছলেন? জগবন্ধুবাবু এসেছেন?

জগবন্ধু — মঠে দশটা পর্যন্ত ছিলাম।

শ্রীম — দক্ষিণেশ্বর যান নাই?

জগবন্ধু — আজ্ঞে না।

শ্রীম —ওখানে গেলে একটি সিন দেখতে পেতেন, কত লোক স্নান করছে। একবার আমি ওখানে ছিলাম এই দিনে। গঙ্গাস্নান করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেরী হয়ে গেল। ঠাকুর বললেন, এক কাজ কর, মাথায় গঙ্গা ছিটিয়ে দাও। তা হলেই হবে। ভিতরে আমার ইচ্ছা ছিল কিনা তাই বললেন, অন্তর্যামী। আজও বাবুঘাটে ঐ করলুম, মাথায় গঙ্গা ছিটিয়ে দিলুম। ট্রামে গিছলাম।

শ্রীম (বৈষ্ণব ভক্তের প্রতি) — তাঁর তীর্থস্থানে যেতে হয়। অধ্যাত্মে আছে, 'যেখানে আমার উৎসব হয়, সেখানে আমি থাকি।' ক্রাইস্টও এই কথা বলেছিলেন, 'For where two or three are gathered together in my name there am I in the midst of them'. (St. Matthew 18:20)

পুরাণ শাস্ত্রে আছে,

'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম্ হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।।'

তাই উৎসবে যেতে হয়। আজ গেল একটি উৎসব।

বড় অমূল্য — সে দিন মঠে কথা হচ্ছিল 'কথামৃত'এর সম্বন্ধে, ঠাকুরের সম্বন্ধে। স্বামী শুদ্ধানন্দ, মঠের পণ্ডিত তারাসার তর্কতীর্থ প্রভৃতি অনেক সাধু ও ভক্ত ছিলেন। পণ্ডিতমশায় বলেছিলেন, মহাশক্তিধর পুরুষ ছিলেন ঠাকুর। উত্তরপাড়ার পণ্ডিতকে কেমন করে বদলিয়ে দিলেন ইচ্ছামাত্র। আবার যখন তাঁর দিব্য ভাব-বিলাসের কথা পড়ি, সমাধির কথা শুনি, তখন মাথা হেঁট হয়ে যায়, তখন

তর্ক-ফর্ক বন্ধ হয়ে যায়। এটা সকলে বুঝতে পারে না। তাই সেদিন একজন বলেছিলেন, 'কথামৃত' সাধারণ লোকের জন্য, ছেলেদের জন্য ।

শ্রীম (স্মিত হাস্যে) — 'For of such (children) is the kingdom of God — ক্রাইস্ট বলতেন। শিশুর মত সরল না হলে ভগবান দর্শন দেন না। আবার ভগবান যখন মানুষ হয়ে আসেন, তাঁর কথাও সরল, এতো সরল যে শিশুও তা বুঝতে পারে।

(সহাস্যে) 'পিসিমা যা বলেছিলেন শেষে তাই হল।' চরণদাস বাবাজী বলেছিলেন এই কথা। অল্প বয়সে কলেজে ইংরেজী পড়ছে। তখন পিসিমাকে তুলসীতলায় পিদীপ দিচ্ছে দেখে বলেছিল, এ কি কচ্ছ পিসিমা, পাগল হলে নাকি? একটা গাছকে কেন পিদীপ দেখাচ্ছ? পিসিমা বলেছিলেন, বাবা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন তুলসীতলায় আমার মতি থাকে। শেষে বিয়ে হ'ল, চাকরী হ'ল, ছেলেপুলে হল, অনেক ধাক্কা খেয়ে খেয়ে তখন ঐ হলেন অর্থাৎ সাধু। তখন নিজেই তুলসীতলায় পিদীপ দিচ্ছেন, বৈষ্ণব সাধু কি না! আমায় নিজেই বলেছিলেন এই কথা পুরীতে জাজপিটার মঠে।

প্রথম agnostic (উদাসীন) তারপর atheist (নাস্তিক), তারপর 'ফেলাজফিস্ট'। তখনই পিসিমাকে ঐ কথা বলেন। এই রকম এক একটা স্টেজ আসে মানুষের। এরপর ক্রমে দুর্গা, কালী, শিব সব দেবদেবী মানতে লাগলেন। বেদান্ত ফিলজফি দিয়ে analyse (বিশ্লেষণ) করে দেখতে লাগলেন, শেষ অবধি 'আমি'টা থাকে না, আমি নাই সবই তুমি। তখন বুঝতে পারলেন ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন। তখন নিজহাতে পিদীপ দিয়ে তুলসীতে ভগবানের পূজা করেন।

শ্রীম (বড় অমূল্যের প্রতি) — আত্মদর্শনের পর মানুষ শিশুর মত সরল হয়ে যায়। বৃহদারণ্যকে আছে, 'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ'।

ডাক্তার বক্সী — শিশুর মত হওয়া মানে, যে যা বলে তাই বিশ্বাস করা?

শ্রীম — তা কি হয়? শিশু সকলের কথা শোনে না। যে ভালবাসে তার কথা শোনে। তা ছাড়া, এ শিশু আর ও শিশুতে তফাৎ আছে। এ, বুড়ো হয়ে, ছেলে হওয়া। এ-ছেলে নিজেকে সর্বদা দেখেন জগদম্বার কোলে, যেমন ঠাকুর।

একজন জার্মান ফিলজফার world-কে compare (জগতের তুলনা) করছেন একটা ভাঙ্গা আয়নাতে প্রতিবিম্বের মত। মানুষের মনটা যেন একটা ভাঙ্গা আয়না। তাতে ছাপ পড়েছে বাহ্য জগতের, তাই এরূপ বিচিত্র দেখাচ্ছে। মনটি যখন বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন জগৎ নাই, সব ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দ।

বড় অমূল্য — 'কথামৃতে'র কথা অসংস্কৃত বলে কি ওরূপ বলে — এ সব ছেলেদের জন্য।...

শ্রীম (কথা শেষ না হইতেই) — না, না। তা নয় — colloqual language-এ (কথ্য ভাষায়) আছে বলে নয়। একশ-পাঁচ ডিগ্রি জ্বর, প্রলাপ হচ্চে। তখন কুইনাইন কাজ করবে কেন? জ্বর একটু কমুক, প্রলাপ বন্ধ হোক, তখন কাজ করবে। বিষয়ভোগে মন ডুবে আছে, প্রলাপ চলছে, এ সময় কি করে ঠাকুরের কথা বুঝবে! জন্ম জন্ম চেষ্টা করে মন পরিষ্কার হলে, তখন বুঝতে পারবে ঠাকুরের কথা। ঠাকুর কথা কইতেন summit-এ (উচ্চ শৃঙ্গে) বসে। ঈশ্বর ও জগতের মিলনভূমিতে ঠাকুরের অবস্থান। অত উঁচু কথা কি করে বোঝে অত নীচের লোক? যেখানে ঈশ্বরের জ্ঞান সদা জাগ্রত আর জগতের জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত, সেই স্থানে বসে ঠাকুর কথা কইতেন।

ঠাকুরের এক একটি কথা কি বুঝবার যো আছে! 'ঝাঁটা মারি লোকমান্যে' — এই একটি কথাই ধরুন। লোক শুনে বলে, বা, বা বড় সুন্দর কথা। কিন্তু এ কথাটার ধারণা হচ্ছে কৈ? যে এটা বুঝতে পারবে, ধারণা করবে, সে চুপ হয়ে যাবে। লোকে এই কথা শুনে বলে, বড় সুন্দর কথা! তার এ কথার, এ বোঝার, কি মূল্য আছে?

তা এ কথা ধারণা করবে কেমন করে? মন হাব্জা গোব্জাতে ভর্তি আছে, সব lower ideas-এ (বিষয়-চিন্তায়) পরিপূর্ণ। সেই

সব ভাবনাই দিনরাত করছে, আবার তাই বলছে বা শুনছে। সব বিষয়ভোগের কথা। ঠাকুরের কথা সব পরমানন্দের কথা। এই পরমানন্দ-সম্ভোগ কি সকলের ভাগ্যে হয়? সময়ে সব হয়। অনেক জন্ম বিষয়ভোগ করে সংসারে আলুনি লাগলে, তখন বুঝবে 'কথামৃত'এর কথা। কেউ হয়তো এক জন্মে, কেউ দশ জন্মে, কেউ অসংখ্য জন্মে বুঝতে পারবে। বুঝবে সকলেই একদিন। উহা যে মানুষের জন্মগত অধিকার!

তাই ঠাকুর বলতেন, 'শুনে রাখা ভাল। সময় হলে তখন বুঝবে, ও এই।' শুনে রাখা মানে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার মত। একটা নৌকো স্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওটাতে শিকল বাঁধা। শিকলটা বাঁধা আবার তীরে, গাছের গুঁড়িতে। যেই স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অমনি টান পড়ছে শিকলে, গাছের গোড়ায়। তখন রক্ষা হয়ে গেল।

কথা তো সকলেই কয়। কিন্তু কার কথা শুনতে হবে? যে পরমার্থ চায়, তাকে শুনতে হবে অবতারের কথা, বেদের কথা। অবতার মানে মানুষ-শরীরে ঈশ্বর। তিনি সংসারের রোগ ও তার প্রতিকার জানেন। তাঁর কথা শুনলে দুঃখপূর্ণ এই সংসারে আনন্দে থাকতে পারবে। এ-বৈ আর উপায় নাই। বেদের কথাও বুঝতে পারে না লোক। কালক্রমে সদর্থ মলিন হয়ে যায়। তখন ভগবান মানুষ হয়ে এসে, আবার সদর্থ প্রকাশ করেন, নিজে পালন করেন। তবে কেউ কেউ বুঝতে পারে।

সংস্কার না থাকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস হয় না। সংস্কার মানে পূর্বজন্মের চেষ্টা, তপস্যা। ভোগান্ত হলে তাঁকে ধরতে পারে। 'He that hath ears to hear, let him hear', (St. Mark 4:9) — ক্রাইস্টের মহাবাক্য।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — বালকের মত সরল না হলে তাঁকে লাভ হয় না। ঠাকুর যেন পাঁচ বছরের বালক। কোমরে কাপড়খানা পর্যন্ত রাখতে পারেন নাই। কি অবস্থা! মন সদা পরব্রহ্মে লীন! কে যেন টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। নীচে নেমেও দেখছেন,

ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন। বেশ্যা রতির মা, মজুর মেয়ে, কুকুর — সব দেখছেন মায়ের রূপ।

তাই ঠাকুর ‘আমি’ ‘আমার’ বলতে পারতেন না। বলতেন, ‘ইনি’ ‘এখানকার’ ‘এখানে’। খেলে বলতেন, ইনি খেয়েছেন। মথুরবাবু একদিন বললেন, বাবা তুমি তো বালক। তুমি কেন ‘ইনি খেয়েছেন’ বলছো? তোমারও অহংকারের ভয় আছে? তুমি যে জগদম্বার শিশু!

এইবার ‘কথামৃত’ ৪র্থ ভাগ ঊনবিংশ খণ্ড শ্রীম নিজে বাহির করিয়া দিলেন। জগবন্ধু পাঠ করিতেছেন। ঠাকুর জ্ঞানবাবুকে বলিতেছেন, বার-আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে চার-আনা মন লয়ে কাজকর্ম করা। কোন্নগরের তমোগুণী সাধককে লক্ষ্য করিয়া নরেন্দ্রকে বলছেন, ‘বুঝেছিস, বেদে কেবল আভাস।’ সাধক বিদায় লইলে, ঠাকুর ভাবে বলিতেছেন, ‘মা, আমি না, তুমি? আমি কি করি? না, না, তুমি।’

পাঠান্তে ভক্তগণ আম ও কাঁঠাল প্রসাদ পাইতেছেন। একটি বড় আম শ্রীম-র জন্য তুলিয়া রাখা হইল। শ্রীম উহা আনিয়া ভক্ত-সেবায় দিলেন।

রাত্রি সাড়ে দশটায় সভাভঙ্গ।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১২ই জুন, ১৯২৪, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সাল।
বৃহস্পতিবার, শুক্লা দশমী ৪৩।২২ পল।

নবম অধ্যায়

মঠের শিক্ষাই ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

১

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদ। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। শ্রীম ছাদে মাদুরে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। শ্রীম-র চারিদিকে বসা ভক্তগণ — বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বলাই, বিনয়, গদাধর, ছোট রমেশ, জগবন্ধু, প্রভৃতি। হ্যারিকেনের আলো আসিতেই শ্রীম ও ভক্তগণ কিছুক্ষণ ধ্যান করিতেছেন।

আজ ১৩ই জুন ১৯২৪ খ্রীঃ, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ সাল, শুক্রবার, একাদশী, ৩৮।২৫ পল।

গতকাল 'কথামৃত' পাঠ হইতেছিল। কোন্নগরের তমোগুণী সাধক ঠাকুরের কাছে আসিয়াছে, আর অনবরত শ্লোক আবৃত্তি করিতেছে। এই সব কথার আলোচনা চলিতেছে।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর কোনও শ্লোক মুখস্থ বলতেন না, পাছে ভক্তরা ঐ রকম করে বেড়ায়। কতকগুলি শ্লোক তাঁর মুখস্থ ছিল।

'শুধু বললে কি হবে? ঐ সব পালন করতে হয়, ধারণা চাই' — ঠাকুরের এই কথা শুনে সাধক রেগে গেল। তা বলে কি হবে, তিনি তার কল্যাণের জন্যই বলেছেন! ঠাকুরের ভিতর তো হিংসা-দ্বেষ ছিল না। তিনি সকলকেই নারায়ণের রূপ দেখতেন। যে নারায়ণ যে দ্রব্যে পূজার যোগ্য, তাকে তা দিয়ে পূজা করছেন। (সহাস্যে) 'কই আপনাদের সঙ্গেও দেখছি এঁর মিলে না' — ঠাকুর সাধকের সঙ্গীদের বললেন। সাধকের সামনেই সমাধি হল। নেমে এসে, তখনও ভাবাবেশ রয়েছে, নরেন্দ্রকে বলছেন, 'বেদে কেবল আভাস'।

(সহাস্যে) শ্লোক বললে একটু আত্মশ্লাঘা হয়, অহংকার হয়। ঠাকুর শ্লোক না বলে মুর্দ্দাটা বলে ফেলতেন। (ছোট রমেশের প্রতি) বল হয় কি না?

শ্রীম (কিছুক্ষণ ভাবান্তরের পর) — 'রজ্জু ভ্রমে সর্প'; মায়াবতীর ব্রাঞ্চ আশ্রমে আজ এর জীবন্ত অভিনয় হয়ে গেল*। প্রভুমহারাজ স্বপ্ন দর্শন করে 'সাপ সাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। কাছেই একটা কোমরবন্ধ (বেল্ট) পড়েছিল। ঐ চীৎকার শুনে একজন মাদ্রাজী সাধু জেগে ঘুমের ঘোরে ঐ কোমরবন্ধকে সাপ মনে করে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়িতে চৌকাটে মাথা ঠেকে রক্ত পড়তে লাগলো, আর সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে গিয়ে পড়লো। ঠোঁটমুখ কেটে হয়রাণ। শেষে ডাক্তার দুর্গাপদকে ডাকা হয়। দেখ, যে লোক এতগুলি ভাত খেতো, সে এখন চামচে দিয়ে একটু করে দুধ খাচ্ছে। এমনি কাণ্ড এই ভ্রম থেকে!

শাস্ত্রে আছে, রজ্জুতে সর্পভ্রম। আমরা সকলে এই ভ্রমে রয়েছি। আমি অমুকের পিতা, অমুকের মাতা, অমুকের পতি, এই সবই এই ভ্রম। 'আমি'-টাকে ভাগ ভাগ করে ফেলা হচ্ছে। বস্তুতঃ সর্পও নাই,

---

*বিগত ১১.৩.৭৫ তারিখে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ এক পত্রে গ্রন্থকারকে জানাইয়াছেন — "এই বিবরণ ঠিক নয়। আমি স্বপ্নে "সাপ সাপ" বলিয়া উঠিও নাই বা দৌড়াইও নাই এবং পড়িয়াও যাই নাই। প্রকৃত ঘটনাটি এইরূপ ঃ শঙ্কর ঘোষ লেনে অদ্বৈত আশ্রমে থাকাকালীন গরমের সময় এক রাত্রিতে আমরা অনেকে ছাদের ওপর পাশাপাশি শুইয়াছিলাম। সেইদিন স্বামী গঙ্গেশানন্দজীও (দ্বিজেন মহারাজ) সেখানে ছিলেন। তিনি শেষরাত্রে মজা করিবার জন্য তাঁহার পাশে যিনি শুইয়াছিলেন (সম্ভবতঃ স্বামী দয়ানন্দজী — বিমল মহারাজ) তাঁহাকে হঠাৎ "সাপ, সাপ" বলিয়া উঠেন। সে সময় আমার ও অন্যান্যদের আগে থাকিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ওঁর "সাপ সাপ" বাক্য শুনিয়া কেহই উঠিও নাই, দৌড়াইও নাই, কিছুই করি নাই। কিন্তু তাঁহার ওই কথা শুনিয়া এক দক্ষিণ ভারতীয় ব্রহ্মচারী, যে একটু দূরে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, চমকাইয়া উঠিয়া পড়ে ও দৌড়াইয়া পলাইতে গিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় পড়িয়া যায় এবং বেশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এই হইল প্রকৃত ঘটনা। পরবর্তী সংস্করণে এইটি সংশোধন করিলে সুখী হইব।"

পিতামাতা, পতিও নাই। কিছুই নাই। শুধু আছে রজ্জু অর্থাৎ ঈশ্বর।

বড় জিতেন (কাতরভাবে) — আর একটু কৃপা করলেই তো হয়! হউক না আর একটু কৃপা। তাহলে আর এ ভ্রমে থাকতে হয় না।

শ্রীম (বিরক্তির সহিত) — আর একটু আর একটু করলে কি হয়? কাজ করতে হয় তার জন্য। কর না, ঠাকুর যা বলে গেছেন। নির্জনে গোপনে কাঁদতে পারলে হয়। তিনি যা বলে গেছেন, তা না করলে কেমন করে হবে? তা না করে ইষ্টিক হাতে আর্ম-চেয়ারে বসে — হউক না একটু কৃপা, আর একটু হলে বেশ — বললে কি হয়? লজ্জা করে না এরূপ বলতে?

অর্জুনকে ‘আর একটু কৃপা’ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর একেবারে ‘বেপথুঃ’। Modern language-এ (আজকালকার ভাষায়) যাকে heart failure (হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ) হয় বলে তাই হয় আর কি, বিশ্বরূপ দর্শন করে।

ঠাকুর কেন এই কঠোর সাধন করলেন? না, ভক্তদের শিক্ষার জন্য। তিনি বলতেন, ‘কত রাত কেটে গেছে, গায়ের উপর দিয়ে সাপ চলে যেতো, তবুও হুঁস নাই। পঞ্চবটীর জঙ্গলে পড়ে থাকতাম।’

বিকারের রোগী কি না বলে! বলে, এক জালা জল খাব, একথালা পান্তাভাত খাব। সামনে ধর, এদিকে লক্ষ্যও নাই। কি করে থাকে লক্ষ্য? হুঁস নাই যে, বিকার যে! ওটা কেটে গেলে হবে। দু চার মাস হয়তো ঈশ্বরের নাম করবারও ইচ্ছা হয় না, বিষয়কর্মে মন এমনি মজে আছে। যদিও বা কখনও অবসর হলো, তা সে সময় বসে তাস খেলবে। তবে কৃপা হয় কি করে?

তাঁকে ডাক আহার নিদ্রা ছেড়ে, কেঁদে বল — দেখা দাও নইলে খাব না। প্রাণ যায় যাক্। বলা নাই কওয়া নাই, চেষ্টা নাই, আর অমনি হয়ে যাবে? চার ফেলবে না, বঁড়শি ফেলে বসবে না — আর মাছ ধরে এনে আমার হাতে দাও! দই পাতবে না, মন্থন করবে না — মাখন এনে আমার মুখে তুলে দাও! লজ্জা হয় না বলতে?

চেষ্টাচরিত্র করে না পারলে তখন বলা যায়, মশায় আর পারলাম না। এখন তোমার ইচ্ছা হয় তো দেখা দাও। তখন শরণাগতি! তা ছাড়া মনের খেদ মেটে? কি করলুম তাঁর জন্য আমরা?

এ সংসারে ঈশ্বর কত রকম করে আমাদের পালন করছেন। জল, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, মেঘ, বৃষ্টি, তারপর কতরকম আহার্য, এ সবই আমাদের রক্ষার জন্য। আবার নিজে অবতার হয়ে, গুরুরূপে বলে গেছেন, কি করে তাঁকে প্রসন্ন করে কৃপা লাভ হয়, তাঁর দর্শন হয়। ও-সবের কিছুই করবো না, আর বলা, সব করে দাও — বেশ তো আবদার!

বড় জিতেন (যুক্ত করে বিনীতভাবে) — নিবেদন করা রইল।

শ্রীম উঠিয়া গিয়া অন্তেবাসীর ঘর হইতে ভাগবতখানা লইয়া আসিলেন, আর একাদশ স্কন্ধের সূচীপত্র পড়িতেছেন। ঊনত্রিশ অধ্যায় পড়িতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হইবেন। উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে যাইয়া ভাগবতধর্ম আচরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। পাঠক পড়িতেছেন, আর শ্রীম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুনিতেছেন।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি) — ভাগবতধর্ম কি, এটা আর একবার পড়ুন তো?

পাঠক — (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) আমাকে স্মরণ করিয়া সব কাজ করিবে। আমাতে মন ও চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমার সেবায় মগ্ন হইবে। পবিত্র তীর্থস্থানে আমার ভক্তগণের সহিত বাস করিবে। আর আমার লীলাকথার আলোচনা করিবে। নৃত্য-গীত ও আমার উৎসব করিবে। সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে আমি, ইহা চিন্তা করিবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যে আপনারা সব মঠে যান, উৎসবে যোগদান করেন, সাধুভক্তের সেবা করেন, এরই নাম ভাগবতধর্ম।

সকল জীবের অন্তরে তিনি, আবার বাইরেও জীবজগৎরূপে তিনি, এইরূপ ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যায় মানুষ। গোপীদের এইরূপ হয়েছিল।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — যদি হৃদয়বিহারী ঈশ্বরে মনোনিবেশ না হয়, যদি বাহ্য বিষয়ে মন যায়, তা হলে কি করা? এইসব বাহ্য বিষয়ের অন্তরে-বাহিরে তিনি, এইরূপ চিন্তা করা। To idealise the real (ঈশ্বর জগদ্ব্যাপ্ত) ভাবনা করা। 'real' বস্তুতঃ ঈশ্বর, কিন্তু তাঁর মায়াতে তাঁকেই unreal (অসত্য) বলে মনে হয়; আর unreal (অসত্য) যে জগৎ, সেটা মনে হয় real (সত্য)। কি করা যায়, যদি মন 'ideal'-এ (ঈশ্বরে) না থাকতে চায়, তবে real-কে (জগৎকে), তাঁর কথা, কার্য, চিন্তা দ্বারা মণ্ডিত করা।

ঘরে বসে এ-সব ভাবনা হয় না। তাই ঠাকুর বলতেন, নিত্য সৎসঙ্গ চাই। আর মাঝে মাঝে নির্জনে যেতে হয়। Compare (তুলনা) করা চলে, নির্জনে গেলে। প্রথমে সৎসঙ্গে ঈশ্বরের কথা শোনা, তাঁদের আচরণ দেখা, তারপর নির্জনে গিয়ে নিজের হাতে আনার চেষ্টা করা। উদ্ধবকে এতকাল কাছে রেখে বললেন, 'যাও বদরিকাশ্রম, সব ছেড়ে। তাঁর ধ্যানে গিয়ে মগ্ন হও।' আর অর্জুনকে বললেন, 'যুদ্ধ কর আমার কাজ জেনে।'

মানুষ দু'পাতা পড়েই বলে, বুঝে ফেলেছি। তা হবার যো নাই। তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। মহামায়া সব উল্টে দেন। কেন দেন? তা না হলে যে জগৎলীলা চলে না। তবে তাঁর কথায় চললে তিনি সহায় হন, পথ ছেড়ে দেন, তখন ঈশ্বরদর্শন হয়।

ঠাকুর এক এক দিন বলতেন, মানুষের কি অজ্ঞান দেখ! এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে যায় বিচার করতে, ঈশ্বর আছে কি না, এইসব। এক ছটাক বুদ্ধি দিয়ে যায় অনন্তকে মাপতে। তাই তাঁর ব্যবস্থা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

ঠাকুরের কাছে বসে ভক্তরা ঈশ্বরের কার্যের সমালোচনা করছিল। বলছিল, ভগবানের কি অন্যায়, অতগুলি নিরপরাধ লোককে মেরে ফেললেন। চাঁদবালিতে জাহাজ ডুবে গিছলো! ঠাকুর শুনে বললেন, 'তোমরা কি বলছো? তিনি যদি এর পর এদের আরও ভাল স্থানে নিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে কি হবে?' শুনেই সকলে নির্বাক। আর

একবার বরিশালে লোকক্ষয় হলেও সমালোচনার উত্তরে এই কথাই বলেছিলেন।

মানুষের এই সংকীর্ণ দৃষ্টি, এ নিয়ে আবার ঈশ্বরের কাজের বিচার! অত তো কলর কলর করছে। রাত্রিতে যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন যদি কেউ মুখে মুতে দেয় তার নাই খবর। এমনি দুরবস্থায় থেকেও বড় বড় কথা? লজ্জা হয় না?

তাঁর অনন্ত কাণ্ড! (আকাশ দেখাইয়া) দেখ না চেয়ে, কি চলছে? এক তারার খবরও কেউ করতে পারছে না আজ পর্য্যন্ত। আজকাল এরা বলছে এক একটা তারাও এক একটা সূর্য। কত সূর্যমণ্ডল তা হলে? এই অনন্তের যিনি কর্ত্তা, তিনি মানুষ হয়ে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বললেন উদ্ধবকে।

ঠাকুরও সেই পরমপুরুষ, জগতের কর্তা। এইসব শাস্ত্র শুনলে তবে তাঁর কৃপায় বোঝা যায়।

একজন অবতার আর একজন অবতারকে প্রচার করতে, প্রতিষ্ঠিত করতে আসেন। সাধুসঙ্গ করলে এ সব কথা বোঝা যায় তাঁর কৃপায়। সাধু মানে, যিনি বুঝেছেন ঈশ্বরের লীলা। ভাগবতেও এই কথাই হলো, সাধুসঙ্গ কর, আর সাধুসেবা!

সভাভঙ্গ, রাত্রি দশটা।

২

পরের দিন শনিবার। অপরাহ্ন চারিটার সময় শনিবারের ভক্তগণ, ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ প্রভৃতি আসিয়াছেন। তাঁহারা দ্বিতলের 'আশ্রম' ঘরে বসিয়াছেন। মর্টন স্কুল এখন ছুটি। তাই শ্রীম-র আদেশে দ্বিতলের মধ্য অংশটি সাময়িক আশ্রমে পরিণত হইয়াছে। অন্তেবাসী প্রভৃতি এই ঘরেই বাস করেন। দেখিতে দেখিতে বড় অমূল্য, এটর্নি বীরেন প্রভৃতিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীম চারতলার ঘর হইতে নামিয়া আসিলেন পাঁচটায়। কথা প্রসঙ্গে বর্তমান শিক্ষার কথা উঠিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — না, এ শিক্ষাতে মোটেই চরিত্র গঠিত হচ্ছে না। হবে কি করে? ধর্ম শিক্ষার নামও নাই। ভগবানে বিশ্বাস না থাকলে চরিত্র গঠিত হয় না।

(ললিতের প্রতি) বাড়ির ছেলেপুলের শিক্ষার জন্য ঠাকুরঘর করার প্রথা ছিল। এখন আর ও পাট নাই। ছেলেমেয়েদের ঠাকুরসেবা শেখাতে হয়। ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, ঘর পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, মালা গাঁথা, ধুপ, দীপ দেওয়া, এ-সব অতি ছেলেবেলা থেকে শেখান দরকার। এর একটা সংস্কার মনে পড়ে যায়। বড় হয়ে যখন ধাক্কা খাবে সংসারের, তখন এই সংস্কার কাজ দিবে। তখন ঐ সব করবে শ্রদ্ধার সহিত। প্রথমে অভ্যাস তারপর শ্রদ্ধা।

এইবার বেলুড় মঠের কথা উঠিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আজকাল মঠে এম.এ., বি.এ. পাশ অনেকগুলি সাধু এসেছেন। আবার বি.এলও আছে। সীতাপতি একজন। চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর নাম। এদের কি brilliant prospect (উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ) ছিল। সংসারের এ-সব ছেড়ে এসেছে তাঁর নাম শুনে। যেখানে যে ফুলটি ফুটেছে, সেটিই এসে উপস্থিত হচ্ছে মঠে। এ ফুলের মালা দেবসেবায় লাগবে। কি সুন্দর ট্রেনিং হচ্ছে মঠে — মন প্রাণ সর্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা করতে শেখানো হচ্ছে। সর্বভূতে ভগবানের অধিষ্ঠান জেনে তারা সেবা করে ঈশ্বরের। এটি হলো সত্যিকার বেদান্ত। মঠ যেন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্ট ইউনিভারসিটির। সেবাহীন শিক্ষা শিক্ষাই নয়। গুরুগৃহে এই সব হতো, সেবার সঙ্গে শিক্ষা, head and heart-এর (বিদ্যা-বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের) সম্মিলনে শিক্ষা।

কেবল টাকা করা, বাড়িঘর করা, গাড়ীঘোড়া, নাম-যশ করার জন্য যে শিক্ষা, উহা শিক্ষাই নয়, ভারতীয় দৃষ্টিতে। যদি একে education (শিক্ষা) বল, তবে তোমায় বলতে হচ্ছে at the risk of the ideal and traditions of your country (ভারতের আদর্শ ও অতীত ইতিহাসকে বিসর্জন দিয়ে)।

মঠের সাধুদের যে শিক্ষা হচ্ছে এইটেই এ দেশের ধারা। ঈশ্বর-বিশ্বাস, গুরুসেবা, বৃদ্ধের সেবা, সমাজ সেবা, দরিদ্রনারায়ণ সেবার সঙ্গে লৌকিক বিদ্যার মিলন ওখানে হচ্ছে। এতে Culture (সংস্কৃতি) হচ্ছে। আর চরিত্র সুগঠিত হচ্ছে। কতকগুলি বই মুখস্থ করাকে শিক্ষা বলা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন, এ দিকে যা সব শিখেছি সেগুলি ভুলতে পারলে বাঁচি।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — ঠাকুর পড়া সম্বন্ধে কারুকে কিছু বলতেন না — তুমি পড়, কি ছাড়। এ সম্বন্ধে silent (নীরব) থাকতেন। কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের অসুখ। বিবেকানন্দ সেখানে যেতে পারতেন না, 'ল' examination-এর (আইন পরীক্ষার) জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। শেষ অবধি আর থাকতে পারলেন না। একদিন দৌড়ে গিয়ে হাজির। পায়ে চটি, পরণে ময়লা একখানা কাপড় আর গায়ে চাদর। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রে, তুই যে এলি; তোর তো 'এ্যগ্‌জামিন্'? বিবেকানন্দ তখনই বলেছিলেন, 'আর এ্যগ্‌জামিন্; যা সব শিখেছি সেগুলি ভুলতে পারলে বাঁচি!'

ঠাকুর লেখাপড়া সম্বন্ধে মুখে কিছু বলতেন না বটে, কিন্তু ভিতর ফাঁক করে দিতেন। বিবেকানন্দের আর এ্যগ্‌জামিন দেওয়া হলো না; চৈতন্য হলো, ছিঃ, এঁর এই অবস্থা আর আমি এ্যগ্‌জামিন্ দিচ্ছি! তখন সব ছেড়ে দিনরাত ঠাকুরের সেবায় লেগে গেলেন।

বীরেন প্রভৃতি ভক্তগণ কথা প্রসঙ্গে সত্যরক্ষার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সত্য যাতে রক্ষা হয় না এমন কাজ কেন করা? ওকালতিতে ভারি মিথ্যা কথা বলতে হয় নাকি শুনেছি। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং-এও তাই। মিথ্যা বলে বড়লোক হলে, আরামে খেলে পরলে, বড় বাড়ি গাড়ী ঘোড়া করলে। কিন্তু ঠাকুর যে বললেন, 'সত্য কথা কলির তপস্যা' তার কি করলে?

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — আহা, কি ভালবাসাই বাসতেন!

বিবেকানন্দকে দেখলেই ঠাকুর দাঁড়িয়ে উঠতেন। আবার কখনও কখনও সমাধি। হাস্য করে জনাইয়ের (প্রাণকৃষ্ণ) মুখুজ্যে ঠাকুরকে বলতেন, 'আপনি এই কায়েতের ছেলেটাকে নিয়ে এতো করছেন কেন? পড়াশোনাও তো তেমন নয়, মাত্র ফার্স্ট আর্ট পড়ছে। তা তাকে নিয়ে এতো নাচানাচি কেন?'

মুখুয্যে মশায় তো জানেন না, ঠাকুর কি ভালবাসাই এঁদের বাসেন। আপনার লোক যে! ইনি দেখছেন কায়স্থ। ঠাকুর তো তা দেখছেন না। তিনি দেখছেন ভিতরটা। আপনার লোক।

বাবা, তুমি জনাইয়ের মুখুয্যেই হও আর যেই হও, সেই দৃষ্টি কার আছে যা দিয়ে ঠাকুর দেখছেন?

আবার শুধু তা নয়। কিছুদিন না গেলে পাগল হয়ে ছুটে আসতেন ওদের বাড়িতে গাড়ী করে, তাকে দেখবেন বলে। আহা, আপনার লোক না হলে কি এতো টান্?

বিবেকানন্দকে দিয়ে কত কাজ করাবেন, সব মায়ের কাজ। 'মঠ কেন আবার করা?' গুরু ভাইরা কেউ কেউ এ কথা বললে তিনি উত্তর করেছিলেন, 'না খেতে পেলে কি কষ্ট আমি তা বুঝতে পেরেছি। তাই মঠ করেছি। এরপর অনেক ছেলে আসবে। মঠে তারা তবুও দু'টি খেতে পাবে।' অন্নগত প্রাণ কলিতে। একবেলা দু'টি খেতে না পেলে মুখ শুকিয়ে যায়। তার জন্যেই তো মঠ করেছেন! যেমন একটি পাখী উড়তে উড়তে পরিশ্রান্ত হয়ে একটা ডালে বসে বিশ্রাম করে, তেমনি মঠ। সাধন ভজন করে দেহ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন ওখানে এসে দিন কতক বিশ্রাম করতে পারবে বলে মঠ করেছেন।

আবার এই মঠকে কেন্দ্র করে প্রথমে ভারতের, তারপর জগতের regeneration (পুনরুত্থান) হবে।

বিবেকানন্দকে দিয়ে কত কাজ করিয়েছেন ঠাকুর। আমেরিকায় যা করলেন ওটি তাঁরই কাজ। তিনিই উপযুক্ত লোক। অন্য কারও সাধ্য নাই ঐ কার্য করে। তিনি ধর্মজগতের মাথার উপর বসিয়ে

দিলেন, ভারতের ধর্ম, দর্শন ও সভ্যতাকে।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। শ্রীম উঠিয়া পাশের কল-ঘরে গেলেন। হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া পুনরায় পূর্বের আসনে বসিলেন।

শ্রীম (বড় ললিতের প্রতি) — ললিতবাবু, আপনার গঙ্গার স্তবটি হউক না।

মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি বসুধা-শৃঙ্গার হারাবলি।

স্বর্গারোহণ বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে॥ ইত্যাদি ভোলানাথ গাহিতেছেন।

গান। কি হবে কি হবে ভবরাণী তবে
ভবেতে আনিয়ে ভাবালি আমায়।
না জানি সাধন না জানি পূজন,
বিষয়বিষ ভোজন করে প্রাণ যায়।।
কাতরেতে তাই ডাকি ভবদারা
কখন আছি কখন যেতে হবে তারা।
এ দেহ সন্দেহ ত্বরায় দেখা দেহ,
রসিকের এ দেহ জলবিম্ব প্রায়॥

শ্রীম — ঐটাও হউক না।

ভোলানাথ আবার গাহিতেছেন।

গান। বিকল্প বিহীন সমাধি বিলীন,
ব্রহ্মে চিরদিন তোমার আসন। ইত্যাদি।

শ্রীম এখন অন্তর্মুখ। তাই অমূল্য ঠাকুরের গান গাহিতেছেন শ্রীম-র ইচ্ছায়।

গান। শ্যামাধন কি সবায় পায় কালীধন কি সবায় পায়।
অবোধ মন বোঝে না একি দায়। ইত্যাদি।

গান। গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী ব'লে অজপা যদি ফুরায়॥ ইত্যাদি।

গান। মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীল-কমলে।
বিষয়মধু তুচ্ছ হ'ল কামাদি কুসুম সকলে॥ ইত্যাদি।

ভাগবত পাঠ হইতেছে — শেষ দুই অধ্যায়। অমূল্য পড়িতেছেন। পাঠ শেষ হইলে শ্রীম-র কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যদুবংশ গেল, দ্বারকা গেল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আছেন। পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেল তবুও তাঁর ভাব সব জীবন্ত। যাবৎ জগৎ থাকবে তাবৎ ঐ ভাবও থাকবে।

এই সব শুনে এই সিদ্ধান্তই নিশ্চয় হয়, যাবৎ সংসার, তাবৎ দুঃখ কষ্ট, তাবৎ শোকতাপ। যদি এরই মধ্যে আনন্দে থাকতে চাও তবে ঈশ্বরকে ধর, ঠাকুরকে ধর। তাঁর শরণাগত হয়ে থাকলে এই শোক দুঃখ অভিভূত করতে পারবে না। দেখ না শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত! সমস্ত বংশ লোপ হ'ল চোখের সম্মুখে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বগল তলায় হাত রেখে বীর বেশে। বাহ্য বিষয়ে যেন উদাসীন, আত্মস্থ। একদিকে দুঃখ শোক অপর দিকে স্বরূপের আনন্দ। নিজেই রচনা করলেন যদু বংশ, দ্বারকা, নিজেই তার বিনাশ করছেন। এই সৃজন আর বিনাশের পরপারে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণ — ঈশ্বর, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। স্বরূপাবস্থানে দুঃখ নাশ। তাই ঠাকুর সেই সচ্চিদানন্দ মানুষ হয়ে সেদিন বলে গেলেন, 'আমায় ধর, আর সংসার কর'।

৩

আজ পানিহাটিতে দণ্ড মহোৎসব। শ্রীম জগবন্ধু, বিনয়, ছোট জিতেনকে উৎসবে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা রেলে সোদপুর যান; সেখান হইতে পদব্রজে উৎসবস্থলীতে। ভাটপাড়া হইতে ললিত রায়, ভোলানাথ মুখার্জী প্রভৃতিও আসিয়াছেন। ভক্তগণ চারিশত বৎসরের প্রাচীন বটবৃক্ষতলে আসন পাতিলেন। গঙ্গাস্নান করিয়া নূতন মালসায় দই, চিঁড়া, আম্রাদি নিবেদন করিলেন। পাশেই সাধক কীর্তনীয়া রামদাস বাবাজী অতি করুণ ও হৃদয়স্পর্শী কীর্তনে নিমগ্ন। তাঁহার দুই চক্ষে প্রেমাশ্রু। আর মাঝে মাঝে শরীরে পুলক ও কম্পন, কণ্ঠে আনন্দ হুংকার।

আজ ১৫ই জুন ১৯২৪ খ্রীঃ, ১লা আষাঢ় ১৩৩১ সাল, রবিবার

শুক্লা ত্রয়োদশী ২৬।৫৪ পল। উৎসবস্থলীতে অনেক দোকানপাট বসিয়াছে। বহু কীর্তনের দল আসিয়াছে। প্রাচীন মন্দির রাঘব পণ্ডিতের দেবালয়। দলে দলে কীর্তনীয়াগণ কীর্তন করিতে করিতে প্রবেশ করিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতেছে।

প্রভু নিত্যানন্দ এই উৎসবের প্রবর্তন করেন। চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ রঘুনাথ দাস তখন নব যুবক। তিনি ছিলেন পূর্বাশ্রমে সপ্তগ্রামের বিখ্যাত জমিদারপুত্র। তিনি গোপনে রাঘব পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে আসিয়া সৎসঙ্গ করিয়া ঈশ্বরানন্দ লাভ করিতেন। নিত্যানন্দ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সস্নেহে রঘুনাথকে বলিলেন, 'চোরা, তুই একা একা লুকিয়ে অমৃতরস পান করছিস। তোর অপরাধ হয়েছে। তাই দণ্ড স্বরূপ তুই সকল ভক্তদের নিয়ে আনন্দোৎসব কর।' সেই অবধি এই উৎসব প্রতি বৎসর হইয়া আসিতেছে।

ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকবার এই উৎসবে আসিয়াছিলেন। মণি সেনের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে তখন বিশ্রাম করিতেন। অদ্যাবধি সেন পরিবার এই গৃহে এই উৎসবের সময় ভক্তসেবা করিয়া থাকেন। আজও ডাল ভাত তরকারি অকাতরে বিতরণ করিতেছেন। স্কুল বাড়ির ভক্তগণও গৃহস্বামীর অনুরোধে প্রসাদ পাইলেন।

ফিরিবার পথে নৌকাযোগে ভক্তগণ বেলুড় মঠে আসিলেন। এখানে স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। বক্তাগণ স্বামীজীর সর্বতোমুখী প্রতিভার — ধর্ম, দর্শন, জ্ঞান, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম-বিজ্ঞান প্রভৃতির কথা বলিতেছেন।

রাত্রি নয়টার সময় বাগবাজার হইতে পদব্রজে ভক্তগণ মর্টন স্কুলে পৌঁছিলেন। শ্রীম দ্বিতলের 'আশ্রমে' বসিয়া আছেন। তাঁহার চারিদিকে মাদুরে বড় জিতেন, শুকলাল প্রভৃতি ভক্তগণ পানিহাটির যাত্রীদের অপেক্ষায় বসা।

শ্রীম ভক্তদের নিকট হইতে খুঁটিনাটি সব সংবাদ লইতেছেন। কয়টি সংকীর্তনের দল, কি নাম-কীর্তন হইয়াছিল, মালসায় আম, কলা, কাঁঠাল, দই চিঁড়ার ভোগ দেওয়া হইয়াছিল কিনা, রামদাস

বাবাজী গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন কিনা, ইত্যাদি। এরপর সকলে পানিহাটির প্রসাদ পাইতেছেন।

জগবন্ধু — ঠাকুর মণি সেনের ঠাকুরবাড়িতে কোথায় বসেছিলেন, বৈঠকখানায়?

শ্রীম — ঢালা বিছানায় বসেছিলেন, বিশ্রামও করেছিলেন।

জগবন্ধু — ঘরে কৌচ ছিল কি? একটি ঘরে পুরানো কৌচ রাখা আছে।

শ্রীম — কৌচ টৌচ থাকতে পারে। কিন্তু তিনি মেঝেতে বসেছিলেন প্রথমে। মনে পড়ছে — হাঁ, পরে কৌচে বসেছিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এইসব উৎসবে যেতে হয়। ভাগবতে পড়া হল সেদিন, 'যেখানে আমার সাধু ভক্তেরা উৎসব করেন সেই পবিত্র তীর্থে যেতে হয়।' ভগবান আরও বলেছেন, 'আমার পর্ব, যাত্রা, মহোৎসব আর উদ্গীত নৃত্যাদি করাবে।' বেশ হলো এঁরা গিছলেন। আমরা যেতে পারি নাই বুড়ো হয়েছি। তাই ফ্রেণ্ডদের পাঠিয়ে দি। যাদের যাওয়ার সুযোগ সুবিধা আছে তাদের যাওয়া উচিত। উড়িয়ে দিলে হবে না। এই সবই ধর্মের রাস্তা ও আশ্রয়। এইসব করতে করতে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়। ধন লাভের জন্য মানুষ কত চেষ্টা করে। ধর্ম লাভের জন্য কিছুই করতে হবে না, অমনি হবে, এ ভাবা নেহাৎ বোকামী।

এইসব ব্যবস্থা কি মানুষ করেছে? ঈশ্বরই করাচ্ছেন লোক-শিক্ষার জন্য। এর advantage (সুযোগ) নিতে হয়। একেই বলে ভাগবৎ ধর্ম।

কলিকালের জন্য এই ব্যবস্থা, এই ভাগবত ধর্ম। মনে জোর নাই, অন্নগত প্রাণ, তাই এ সহজ পথ।

শরীর, মন, চিত্ত দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা চাই। যারা তাঁকে ভালবাসে তাঁদের দর্শন করলে, সেবা করলে ঐ ভালবাসা সংক্রামিত হয়। এইসব উৎসবে ঐরূপ একান্তশরণ ভক্তগণের সহিত মিলন সহজে হতে পারে।

ঠাকুর বলতেন, 'মা-ই সব হয়ে রয়েছেন'। তবুও ভক্তের ভিতর তাঁর বেশী প্রকাশ। 'ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা', এও ঠাকুরের মহাবাক্য। তাই যেখানে ভক্ত সম্মিলন সেইখানেই ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী।

এ সব উৎসবে যাওয়া উচিত। মন প্রথমে যেতে চায় না। কিন্তু একবার গেলেও বুঝতে পারে, যেন জোর করে কে আনন্দ দিচ্ছে। এমনি মহিমা উৎসবের — 'যত্র গায়ন্তি মদ্ভক্তাঃ তত্র তিষ্ঠামি নারদ'।

৪

মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দা। সকাল সাতটা। শ্রীম চেয়ারে দক্ষিণাস্য বসা। পাশেই আছেন ছোট জিতেন, মণি, বিনয় ও জগবন্ধু। একজন ভক্ত আসিয়া শ্রীম-র সহিত কথা কহিতেছেন।

ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — বেলুড় মঠের সাধুদের ভাব পূর্বের মত আর নেই। ভাব বদলে গেছে। বাইরের দিকে বেশী নজর, ইত্যাদি।

সাধুরা মেশেন না। বাবুরাম মহারাজের সময় মঠে গেলে বোঝা যেত যেন মায়ের কাছে এসেছি। যে কেউ মঠে আসলেই তিনি নিজে গিয়ে যেচে আলাপ করতেন, খাওয়াতেন। এখন সাধুরা নিজেদের ভাবে সব থাকেন।

ভক্তরা কত আশা করে যায় সাধুদের কাছে সংসারজ্বালা জুড়াতে। কিন্তু এক একজনের ব্যবহারে ঐ জ্বালা আরও বেড়ে যায়। এই কয় বছরেই এ-সব পরিবর্তন হয়েছে। এখন ছোকরা সাধুরা কর্তৃত্ব করছে। মনে হয় বুড়োদের কথাও তারা শোনে না।

শ্রীম (বাধা দিয়া) — এত কথায় কাজ কি? আম খেতে যাওয়া মঠে, অর্থাৎ ঠাকুরের দর্শন, সাধু দর্শন করতে যাওয়া। লৌকিকতা আশা করা উচিত নয়। এ-সব করার জন্য তো তারা আসে নাই। নিজের নিজের জ্বালায় তারাও অস্থির! তারপর কত কাজ!

তারপর, পরিবর্তন তো হবেই। জগৎ পরিবর্তনশীল। এ নিয়ে দোষারোপ করে মন খারাপ করা উচিত নয়।

দোষ থাকলেও তাদের আদর্শ কত বড় — ঠাকুর! কালে যখন ঠাকুরকে বুঝতে পারবে তখন সেই দোষ দূর হয়ে যাবে। কাছে অত বড় আদর্শ থাকলেও সকলে ধরতে পারে না। ধরাবার লোক চাই। ধরাবার discipline (সাধন) শেখাতে হয়। সকলেই তো উচ্চ ভাব নিয়ে এসেছে। অতলোক একসঙ্গে থাকলে একটু অন্যরূপ হয়ই। তার জন্য মন খারাপ করতে নেই। গোলাপ গাছে কাঁটা থাকে। প্রকৃতির নিয়ম দোষে গুণে মানুষ।

পুরানো লোকরা যতদিন আছেন ততদিন ভাব ঠিক থাকবে। তারপর অন্যরূপ হবে। এ-সব জেনে শুনে যেতে হয়। তাহলে আর মনে কষ্ট হয় না। যতটা পেলাম তাতেই তুষ্ট।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — সংসারে থাকতে গেলে কত রকম শুনতে হয়। ঠাকুরকেই কত কথা শুনতে হয়েছে। একবার কেঁদে আমাদের বললেন, 'দেখ ওরা এ-সব কথা কয়'। কালীবাড়ির কর্মচারীরা ঈর্ষা করতো। তারপর স্বামীজীকে কত দুর্বাক্য শুনতে হয়েছে ওদেশে ও এখানে। প্রাচীন একটা কথা চলে আসছে, 'তৃণতুলিত জগতাম্' অর্থাৎ যাদের কাছে সমগ্র জগৎ একখণ্ড তৃণের ন্যায়, সেই মহাপুরুষগণও সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা পান না।

সমালোচনার ভাল দিকও আছে। উহা না থাকলে যথেচ্ছাচারিতা আসতে পারে। বিলেতে তাই constitutional opposition-এর (আইনসঙ্গত প্রতিবাদের) সৃষ্টি হয়েছে পার্লামেন্টে।

সাধারণতঃ মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ। প্রতিবাদ থাকলে ঐ দৃষ্টি প্রসারিত হয়। সংসারে থাকলে সব সইতে হয়। 'যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়', এ সব ঠাকুরের কথা।

এখন বেলা সাড়ে আটটা। মঠে আজ যোগীন মা'র ভাণ্ডারা। কয়েক দিন হয় ইনি 'উদ্বোধনে' দেহ রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীম ভক্তদের বলিলেন, এখনই যাওয়া উচিত। গিয়ে সেবা করা উচিত। ভক্তরা মঠে চলিলেন।

শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, আপনি সুধীর মহারাজকে জিজ্ঞাসা

করে আসবেন আমাদের নমস্কার জানিয়ে, (স্বামী) বোধানন্দ কখন start (যাত্রা) করবেন, এক। দুই, বোধানন্দের সম্বন্ধে যে বেদান্ত কেশরীতে Article (প্রবন্ধ) বেরিয়েছে তা কি আপনি লিখেছেন? আর তিন, যাজ্ঞবল্ক্য প্লে কবে হবে? বলুন তো কি বললাম? — অন্তেবাসী পুনরাবৃত্তি করিলেন।

ভক্তগণ বাঁশগোলায় নামিয়া রাত্রি সোওয়া আটটায় মর্টন স্কুলে পোঁছিলেন। চারতলার ছাদে ভক্তসভা বসিয়াছে। এখন অন্য সব কথা বন্ধ করিয়া শ্রীম মঠের উৎসবের বিবরণ শুনিতেছেন। তারপর শুনিলেন তাঁহার তিন প্রশ্নের উত্তর। এইবার যাজ্ঞবল্ক্য অভিনয়ের কথা উঠিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — চৈতন্যদেবও এইরূপ অভিনয় করেছিলেন, নবদ্বীপে একবার আর পুরীতে একবার। নবদ্বীপের কথা বেশ মনে আসছে। তিনি জগন্মাতা সেজেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যারা জিতেন্দ্রিয় কেবল তারা থাক। অমনি সব চলে গেলেন, অদ্বৈত পর্য্যন্ত! নিত্যানন্দও চলে গিছলেন। তারপর আবার ডেকে আনালেন, তোমরা সব এসো। তোমরা সকলেই জিতেন্দ্রিয়।

শ্রীম (স্বগতঃ) — নিতাই পর্য্যন্ত! তা যাবে না? নিতাই শেষে দু'টি বিয়ে করেছিলেন। ওরাই সব মেয়ে সাজতেন। ওদের position (অবস্থা) খুব clear (পরিষ্কার)। বলতেই চলে গেলেন। আবার তিনি ডেকে আনালেন।

বাংলার ভক্তরা সকলেই বছরে একবার পুরীতে যেতেন। ছ'মাস ঐ ভাবে কাটতো। একবার পুরীতে পোঁছে সকলেই গম্ভীরায় গিয়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করলেন। কেবল নিত্যানন্দ যান নাই। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, নিতাই কোথা? ভক্তরা বললেন নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে বসে কাঁদছেন! অমনি, 'আমার নিতাই কোথা, আমার নিতাই কোথা' বলে দৌড়ে গিয়ে নিত্যানন্দকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। আর বললেন, তোমরা সকলে নিতাইয়ের চরণামৃত খাও।

এর মানে, নিতাইকে সকলের কাছে খুব বড় করলেন। তা করবেন না? নিতাইয়ের মত কে অত ভালবেসেছে?

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥

এই নাম, এই ভাব অহর্নিশ নিতাইয়ের মুখে। তাই অত আদর তাঁর।

নিতাইকে বলরামের অবতার বলে। বলরাম যত ভালবেসেছেন কৃষ্ণকে তেমন আর কে ভাল বেসেছে? কালীয়দমনের সময় সকলে কাঁদছে আর বলছে, তুমি যেয়ো না। ও সর্প বড়ই খল। অথচ কারও কথা শুনেন নাই কৃষ্ণ। কিন্তু যেই বলাই কেঁদে কেঁদে ডাকছে, ভাই কানু উঠে আয় যাস্ না, অমনি উঠে এলেন জল থেকে। বলরামের ভালবাসার শেষ আছে? সেই বলরাম এবার নিতাই। নিতাইকে দিয়ে ধর্ম সংস্থাপন করাবেন। তাই তাঁর অত মান। 'Upon this rock I shall build my church' (St. Matthew 16:18)— এই 'বিশ্বাস পর্বতের উপর ধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করবো', ক্রাইস্ট পিটারকে লক্ষ্য করে এই কথা বলেছিলেন। নিতাই ঐ প্রেমাচল।

বলরামের ভালবাসার তুলনা নেই। সরল লোক ছিলেন, তবে একটু গোঁয়ার ছিলেন। সুভদ্রা হরণ হল। বলরাম ক্ষেপে গেলেন। সাজ সাজ রব উঠেছে। যুদ্ধ করবেন। বলরাম বললেন, আচ্ছা একবার কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করা যাক্। ওঁকে বলতেই উত্তর করলেন, 'কেন দাদা, পাত্র তো উপযুক্ত!' কৃষ্ণের যুদ্ধে মত নাই জেনে শান্ত হলেন।

সেই নিতাই-বলাই যেখানে এসেছিলেন কাল এঁরা সেখানে (পানিহাটিতে) গিছলেন উৎসবে। চিঁড়া দিয়ে ভোগ হয় বলে চিঁড়ার মহোৎসব।

ঠাকুর এই গানটি গাইতেন। 'সুরধুনী তীরে হরি বলে কে যায় রে। বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে রে।' মত্ত হয়ে গাইতে গাইতে নৃত্য করতেন ঘরের এ-দিক থেকে ও-দিক।

শুক্ল পক্ষের রাকা চন্দ্রালোকে জগৎ উদ্ভাসিত। শ্রীম ঐ চন্দ্র দর্শন করিতেছেন। অনেকক্ষণ পর, অন্তেবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মঠে

প্রসাদ বিতরণের সময় আপনার উপর কি কাজের ভার পড়েছিল? অন্তেবাসী বলিলেন, লবণ পরিবেশনের ভার।

শ্রীম (সহাস্যে) — লবণের কথা শুনে একটা কথা মনে পড়লো। একবার রামবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ। ঠাকুরও এসেছেন। ঠাকুর, নরেন্দ্র ও আর সব ভক্তরা খেতে বসেছেন। খুব আনন্দ করছেন সকলে। ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রান্না কেমন হয়েছে রে?' নরেন্দ্র উত্তর দিল 'নুনটা বেশ রান্না হয়েছে।' আপনার 'লবণে'র কথায় ঐ সিনটা মনে উঠেছে, এইটিন এইটিথ্রি-ফোর হবে।

শ্রীম (দৃষ্টি অতীতের আনন্দ-স্মৃতিতে নিমগ্ন করিয়া) — 'Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them?' (St. Matthew 9:15) ক্রাইস্ট বলেছিলেন, এখন আনন্দ কর, যতদিন বরের অর্থাৎ আমার সঙ্গে রয়েছো। এরপর দুঃখ দুর্দিন আসবে। দেখ না, ঠাকুর থাকতে কত নিমন্ত্রণ, কত আনন্দ। ঠাকুর চলে গেলে তিন দিন উপোস, খেতে পায় নাই।

তাই তো স্বামীজী মঠ করেছেন যাতে পরে সাধুরা দু'টি খেতে পারে। কত দিক দেখে, কত ভেবে চিন্তে মঠ করলেন। এই মঠ হওয়ায় এ দেশে এখন ত্যাগী দেখা যাচ্ছে। কোথায় ছিল সাধু? এই মঠের আদর্শ ঠাকুর। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য মনের অতীত, তিনিই ইদানীং নর কলেবরে শ্রীরামকৃষ্ণ।

সভা ভঙ্গ। রাত্রি ১০টা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৬ই জুন ১৯২৪ খ্রীঃ, ২রা আষাঢ় ১৩৩১ সাল।
সোমবার; শুক্লা চতুদর্শী ২১।৪৪ পল।

দশম অধ্যায়

কাব্যরস ও ব্রহ্মানন্দ — কালিদাস ও শেক্সপীয়র

১

উল্টারথ। মর্টন স্কুল। অপরাহ্ন দুইটা। শ্রীম বিছানায় বসিয়া আছেন, চারতলার নিজ কক্ষে। দক্ষিণ দিকে বেঞ্চেতে বসা জগবন্ধু ও শচীনন্দন। শ্রীম শচীনন্দনকে কাব্য পড়াইতেছেন। মুখে মুখে ‘উত্তর রাম-চরিত’এর প্রথম দুই সর্গ বাংলায় বলিয়া যাইতেছেন। এবার তৃতীয় সর্গে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (পড়িতেছেন) — ত্বম্ জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ঃ — বাসন্তীর উক্তি। শ্রীম (শচীর প্রতি) — এটা মুখস্থ করবে। এর পরের শ্লোকগুলিরও অর্ধেক মুখস্থ করবে। ভাল ভাল passage (কাব্যাংশ) মুখস্থ না করলে ভাষা শিক্ষা করা যায় না। তাই মুখস্থ করতে বলছি। এতে ভাষা ও ভাব দুই-ই লাভ হয়। ভারতবর্ষের এই সব প্রাচীন কাব্যেও highest ideal-এর (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ আত্ম-দর্শনের) ছাপ পড়ে আছে।

আজ ১২ই জুলাই ১৯২৪ খ্রীঃ, ২৮শে আষাঢ়, ১৩৩১ সাল, শনিবার।

কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবকে ভারতের জাতীয় মহাকাব্য বলা চলে। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা, রক্তমাংসের মত ঢুকে আছে ভারতীয় প্রাচীন কাব্যে ও সাহিত্যে, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে, ভাস্কর্যে, চিত্রে ও সঙ্গীতে।

জমিকর্ষণের মত অনুপ্রবেশ করে আছে, ভারতীয় চিন্তা ও ভাবধারা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে স্তরে। ভারতীয় চিন্তার কাঞ্চনজঙ্ঘা হলো ঈশ্বরদর্শন, ব্রহ্মানন্দ। বেদে এই ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন,

'রসো বৈ সঃ' ব্রহ্মরসস্বরূপ, অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ। ভারতীয় কাব্যাদি নিম্ন রসের আস্বাদের ভিতর দিয়ে ঐ শ্রেষ্ঠ রস, ব্রহ্মানন্দে পৌঁছেছে। ব্রহ্ম-রসই জাতীয় বৈশিষ্ট্য — এরই ছাপ সর্বত্র।

কাব্যে নিম্ন রসই প্রধান — প্রেমিক-প্রেমিকার আনন্দ। From the animal man to the divine man (পশু-মানুষ থেকে দেব-মানুষ) সবটার প্রকাশ হয়েছে ভারতীয় কাব্যে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন শরীরের কথা আছে, তারপর মহাকারণ। এই সব নানা রসের ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষে ব্রহ্মরসে পৌঁছান, এইটাই আদর্শ। কেবল আদিরস নয়, আদি, মধ্য, অন্ত সকল রসের সমাবেশ ওখানে। অন্তরস মানে ব্রহ্মরস, ব্রহ্মানন্দ। তারও ছড়াছড়ি ও-তে। তাই এই সব প্রাচীন কাব্যাদি পড়ার প্রয়োজন আছে। এই সবেরই ভিতর দিয়ে এই দেশের শ্রেষ্ঠ আদর্শ — ব্রহ্মরস-সম্ভোগ প্রকাশিত।

এই দেশের ভাবধারাই এই — জীব নানারূপে নিম্নানন্দ উপভোগ করে ব্রহ্মানন্দে পৌঁছাবে। মুক্তি মানে, অফুরন্ত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ। শেষে জীব বুঝতে পারে, অনন্ত অফুরন্ত ব্রহ্মানন্দের এক কণিকামাত্র বিষয়ানন্দ। এই দেশের ব্যক্তির জীবনের আদর্শ এই, জাতীয় জীবনের আদর্শও এই।

কালিদাস, ভবভূতি এঁদের লেখা পড় আর শেক্সপীয়রের লেখাও পড়, দেখতে পাবে আদর্শের আকাশ পাতাল তফাৎ। শেক্সপীয়রে শুধু মানুষের ভিতরকার পশু ও মানুষ-ভাবের প্রকাশ হয়েছে। এ দেশের কালিদাসের ভিতর দিয়ে সে সবও প্রকাশিত হয়েছে, আবার তার উপরের ভাব দেবভাব, ব্রহ্মভাবও প্রকাশিত।

পড় পড়। পড়া ছেড়ো না। ভারতীয় চরিত্রের স্বরূপটি দেখতে পাবে ক্রমে ক্রমে।

কথা কহিতে কহিতে শ্রীম ছাদে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আবার কথা। শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — আপনি এক একটা পয়েন্ট ধরে মুখে মুখে বলে দিবেন। (শচীর প্রতি) — এঁর কাছে জেনারেল ফিলজফি পড়বে। আগে মুখ থেকে শুনে নেবে পয়েন্ট ধরে ধরে,

তারপর পড়বে। তা হলে মনে থাকবে আর সহজে বুঝতে পারবে। কোন্ কথার পর কোন্ কথা, কেনই বা সে কথা, পয়েন্ট ধরে পড়লে, এ সব আপনি এসে যাবে মনে।

আজকাল শিক্ষকরা খালি লেকচার দেয়। এতে সোজা জিনিস শক্ত হয়ে যায়। পয়েন্টগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া উচিত। তবে তো ছেলেরা ধরতে পারবে? তা না করে কেবল লেকচার দিলে সব জড়িয়ে যায়। তাতে, ছাত্রদের মনে বসে না, সংশয়াপন্ন হয় মন। Idea (ভাব) মোটেই ক্লিয়ার (বোধগম্য) হয় না।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — আপনি জেনারেল ফিলজফির contents (সূচী) দেখে এক একটা বিষয় নেবেন। তারপর সে সম্বন্ধে main points-গুলি (প্রধান পয়েন্টগুলি) সংখ্যা করে করে বলে দিবেন, মুখে মুখে — এক, দুই, তিন এইরূপে। আবার শচীর মুখ থেকে সেগুলি বলিয়ে নেবেন। যেখানে সে drop (উল্লেখ না) করবে সেটা ধরিয়ে দেবেন।

অপরাহ্ন চারিটা। শনিবারের ভক্তগণ আসিয়াছেন, ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ প্রভৃতি। একটু পর আসিল ললিতের পুত্র কয়েকজন সঙ্গী লইয়া। ইহারা সকলেই মেট্রিকে স্কলারশিপ পাইয়াছে। শ্রীম আনন্দে তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন! বলিতেছেন, পড়ার সঙ্গে সাধুসঙ্গ রাখবে। তবে পড়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

শ্রীম (একটি ছাত্রের প্রতি) — বল তো পড়ার উদ্দেশ্য কি?

একটি ছাত্র — জ্ঞান লাভ।

শ্রীম — ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান আর সব অজ্ঞান, ঠাকুর বলেছিলেন। হাঁ, এটা হলো highest point (সর্বোচ্চ লক্ষ্য)। নিম্নের step-গুলি (ধাপগুলি) জানার নামও জ্ঞান। স্কুল কলেজের পড়ায় এগুলি জানা যায়। মানুষের বুদ্ধি জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরকে জানবার জন্য নানা চেষ্টা করেছে। সে চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিষয় অনেক বের হয়েছে। আবার কেউ কেউ কোন কোন নূতন বিষয় জানতে গিয়ে জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছে। এটা কেমন? যেমন কাচ

কুড়োতে এসে কাঞ্চন লাভ করা।

এতে কি পরিশ্রম কম? এতে perseverance, attention, application (অধ্যবসায়, মনোযোগ, প্রযুক্তি) প্রভৃতি গুণগুলি পরিপুষ্ট হয়। ঠাকুর গল্প করেছিলেন, ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে বললো, বনে আরও এগিয়ে যাও, তাহলে চন্দনকাঠ, রূপা, সোনা, হীরে, মানিক, কত কি পাবে।

যে, মনে কর, এ সব পড়ায়ও ভালো, সে ইচ্ছা করলে ঈশ্বরের পথেও ভাল হতে পারে। এই মনই মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ করে।

কয়েক দিন বর্ষাবাদলের পর আজ রৌদ্র উঠিয়াছে। তাই ছাদ শুকাইয়াছে। শ্রীম ছাদে মাদুর পাতিয়া বসিলেন। তাঁহার চারিদিকে ভক্তগণ — বড় জিতেন, বলাই, ছোট রমেশ, ভৌমিক, ডাক্তার, বিনয়, শান্তি, গদাধর, সূর্য ব্রহ্মচারী, বিক্রমপুরের ভক্ত, ছোট নলিনী, জগবন্ধু প্রভৃতি।

আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া একটি ক্ষুদ্র রথ যাইতেছে। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি রথের উপরে রহিয়াছে। শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁসর, শিঙ্গা বাজিতেছে। শ্রীম ভক্তদের লইয়া ছাদে দাঁড়াইয়া রথ দর্শন করিতেছেন। আবার আসনে বসিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুর 'ইংলিশম্যানদের' বলতেন, এ-সব মানতে হয়। তারা বলে কিনা, ঈশ্বর বিরাট! এইটুকু রথে কি করে থাকবেন এই সংশয়! তাদের সহজে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তারা এটা ভাবে না — যিনি এই বিচিত্র বিশ্ব রচনা করেছেন, যিনি জীবের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন, তিনি কেন থাকতে পারবেন না এই রথে বা এই মূর্তিতে? ঋষিরা তাঁকে পরমাণুর চাইতে ক্ষুদ্র, আবার আকাশের চাইতে বড় বলেছেন। 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহিয়ান।'

এই সব রথ, মূর্তি মিথ্যা নয়। এ-সব উৎসব, পূজা প্রভৃতি করতে করতে ভক্তি লাভ হয়, বিশ্বাসের বৃদ্ধি হয়। তারপর তাঁর কৃপায় তিনি ভক্তদের স্বরূপ জ্ঞান প্রদান করেন।

শুধু বসে বসে সর্বদা এটা ঠিক, কি ওটা ঠিক, ভাবলে কাজ হয় না, ভক্তিলাভ হয় না। কাজে লেগে যাও। তখন তিনিই বুঝিয়ে দিবেন, কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা বেঠিক। হয়তো কোনও মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়ে দেন। তিনি দেখিয়ে দেন কোন পথে যেতে হবে।

মানুষের মন concerete (বাস্তব) ছাড়া চিন্তা করতে পারে না! তা থেকেই rituals (লোকাচার) পূজা পার্বণের সৃষ্টি হয়েছে। এই যে রথটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ভিতরে জগন্নাথ রয়েছেন, এটাই সকলের মনে থাকবে। কথা বেশীদিন মনে থাকে না, কাজ চাই।

২

শ্রীম (সূর্যের প্রতি) — কি বল সূর্যবাবু, কাজ করা ভাল। মঠে যারা থাকে তারা কত কাজ করে! বিশ্রাম নাই, অত কাজ, কিন্তু তারাই ধন্য! কেন তারা কাজ করছে? নিজের জন্য নয়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য নয়, নাম-যশের জন্য নয়, অর্থের জন্য নয়। পরমার্থের জন্য, ভগবানের জন্য, এ কাজ। এ কাজ কাজ নয়। এতে বন্ধন নাই। এর প্রাইজ কত বড়, গোল্ড মেডাল, হীরের মেডাল। আর সংসারের জন্য যারা কাজ করছে, তাদের কোন প্রাইজ নাই। উল্টো বন্ধন। কর্মফল ভোগ হয় বার বার জন্ম নিয়ে। কখনও মানুষ জন্ম, কখনও পশু জন্ম, কখনও অন্য জন্ম।

(ছাত্রদের প্রতি) — এদের প্রাইজের চাইতেও বড় কিনা বল, এই যারা ইউনিভারসিটিতে প্রাইজ পায়? ওদের প্রাইজের, নিষ্কাম কর্মীদের প্রাইজের দাম নাই — অমূল্য!

শ্রীম (সূর্যের প্রতি) — ধন্য তারা, মঠে যারা ঈশ্বরের জন্য কাজ করে। কি বল সূর্য মহারাজ? একটি গল্প শোন। উপমন্যু ছিলেন একজন শিষ্য। গুরুর আশ্রমে থাকে। গরু চরায়। ক্ষিদে পেলে দুধ দুইয়ে খায়। গুরু জানতে পেরে বললেন, পুজোর জন্য এ গরুর দুধ। এ খেতে নেই। তারপর পুজোর দুধ দুইয়ে নিয়ে গেলে, মাঠে গিয়ে আবার দুইয়ে খাচ্ছে। গুরু এ করতেও মানা করলেন। বললেন, এ

বৎসের দুধ। তৃতীয়বার, বাছুররা দুধ খাওয়ার সময় যে ফেনা পড়তো মুখ থেকে, তাই খেতে লাগলো। গুরু বললেন, এও কীটাদির প্রাপ্য। তারপর ক্ষিদের চোটে গাছের পাতা খেতে গিয়ে আকন্দপাতার আঠা চোখে লাগে আর অন্ধ হয়ে যায়। সে অবস্থায় চলতে চলতে, গিয়ে কূয়োর ভিতর পড়ে গেল। এদিকে রাত্রি হয়ে গেছে, গরু সব আশ্রমে ফিরেছে, কিন্তু উপমন্যু ফিরে নাই দেখে গুরু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মাঠে গিয়ে ডেকে ডেকে খোঁজ করে কূয়ো থেকে উঠিয়ে বাড়ি নিয়ে এলেন।

(ছাত্রদের প্রতি) — দেখ কেমন কাণ্ড — শিষ্য ব্যাকুল গুরুসেবার জন্য, ঈশ্বরের সেবার জন্য, আর গুরু ব্যাকুল শিষ্যের জন্য! এই সেবার জন্য কি প্রাইজ পাবে? ব্রহ্মজ্ঞান, অমৃতত্ব। যা পেলে আর কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেই বস্তুটি ব্রহ্ম। তাঁকে পেলে শাশ্বত শান্তিসুখ লাভ হয়। এটি পাওয়া যায় ঐ কাজে, মঠে যে কাজ করছে সাধুরা, উপমন্যু যে কাজ করেছিল। এমনও শোনা যায় দৃষ্টিশক্তিও লাভ করেছিল, গুরুকৃপায়। ঋষিদের যোগবিভূতি ছিল।

বল, সংসারের জন্য খাটলে কি এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়? হাঁ, সংসারের কাজও নিষ্কামভাবে করতে পারলে, ঈশ্বরের সেবাজ্ঞানে, তাতেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে। বড় কঠিন, দু'একজন পেরেছে। তাই ঠাকুর ভক্তদের দাসীর মত নিজের গৃহে থাকতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর কৃপায় তাঁরা সংসারে থেকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন।

সর্বদা সাধুসঙ্গের দরকার, আর সাধুসেবা। তবে ধাত্ ঠিক থাকে। নইলে মায়ামোহে ভুলিয়ে দেয়। আর প্রার্থনা, 'মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না'।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — এই দুটি ফজলী আম সকলকে দিতে হবে। ক'জন আছে?

অন্তেবাসী (গণনা করিয়া) — ষোল জন।

শ্রীম — তাহলে ষোলভাগ করতে হবে। সব সমান হবে, ছোট বড় না হয়।

প্রসাদ পাইয়া ভক্তরা অনেকে বিদায় লইলেন। এখন সন্ধ্যা। হ্যারিকেন আসিতেই শ্রীম ধ্যান করিতেছেন ভক্তসঙ্গে। কিছুক্ষণ পর অমৃত ঠাকুর বাড়ি হইতে প্রসাদ লইয়া আসিয়াছেন। এইবার ‘কথামৃত’ পাঠ করিতেছেন শান্তি। কাপ্তেনের দোষ ও গুণের কথা পড়া হইতেছে। পূর্ণকে তাঁহার পিতা শ্রীম-র স্কুল হইতে অন্য স্কুলে লইয়া ভর্তি করাইয়াছেন।

একজন ভক্ত — আচ্ছা, ঠাকুর তো সকলের ভিতর নারায়ণ দেখতেন, তবে কাপ্তেনের দোষের কথা কেন বললেন?

শ্রীম — দু’টি কারণ হতে পারে। একটি, মানুষের charitable view (উদার দৃষ্টি) হতে পারে, তা দেখে। দোষ থাকলেও তাঁকে কত ভালবাসতেন, তাঁর বাড়ি যেতেন। দোষেগুণে মানুষ। কম্বলের লোম বাছলে কম্বল থাকে না। আর দ্বিতীয়, এই কথা জানতে পারলে অন্য ভক্তরাও দোষমুক্ত হতে পারবে। ঠাকুরের দৃষ্টিতে যখন দোষ ধরা পড়েছে, এ দোষে আর বন্ধন হবে না। তৃতীয় কারণ আরও কিছু হতে পারে। আমরা তা জানি না। কতটুকু আর দৃষ্টি আমাদের? ঠাকুর — ঈশ্বর স্বয়ং। তাঁর কাজের অর্থ আমরা কি করে বুঝবো? তবে এইটি একটু বোঝা গেছে, তাঁর সব কাজ জগতের কল্যাণের জন্য। তিনি সর্বমঙ্গলময় ভগবান।

অন্তেবাসী — ‘কাপ্তেন’ কখন প্রথম দর্শন করেন ঠাকুরকে?

শ্রীম — সম্ভবতঃ যেদিন কেশব সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী আর ঠাকুরের মিলন হয়, সেইদিন। নৈনালের বাগানে তখন কেশব সেন থাকতেন। সেইখানেই মিলন হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের বাগান ওটা।

অন্তেবাসী — পূর্ণকে কেন স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন তার বাপ?

শ্রীম (সহাস্যে) — ভয়ে, পাছে ছেলে সাধু হয়ে যায়। সকলেই চায়, সাধুসঙ্গ আমার কল্যাণ করুক। কিন্তু কেউ নিজের ছেলে সাধু হউক, এটা চায় না। অপরের ছেলে সাধু হউক। আমরা তার সঙ্গ

করে ধন্য হই, এটা চায় সকলে (সকলের হাস্য)। কি ক'রে করে সাধু নিজের ছেলেকে? মহামায়া যে ভুলিয়ে রেখেছেন স্নেহ দিয়ে! স্নেহেতে জগৎ বাঁধা।

তবে দু একজন এমন পিতাও দেখা যায়, যে, নিজের ছেলে সাধু হতে চাইলে বাধা দেয় না। বরং মনে করে আমরা ধন্য হলাম, কুল পবিত্র হল। তাদের সংখ্যা খুব কম। তারা অতি উঁচু থাকের লোক। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন'। বংশে সাধু জন্মালে, এই হয়।

সকাল আটটা। দ্বিতলের বারান্দায় শ্রীম বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। কলিকাতা মাদ্রাসার পণ্ডিত আসিয়াছেন। ইনি প্রবীন লোক। ইনি প্রাইমার লিখিয়াছেন। উহার ইংরেজী অংশ শ্রীমকে দেখাইবার ইচ্ছা। শ্রীম ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তথাপি শ্রীম বলিলেন, যাদের মাতৃভাষা ইংরেজী, তাদের কারুকে দেখান। হাজার হউক, acquired (অর্জিত) ভাষা আর মাতৃভাষা, অনেক তফাৎ। আমার এটা অতি সুদৃঢ় বিশ্বাস। হাজার শিখলেও অনেক বিষয় অজ্ঞাত থেকে যায়। অনেক ভাব অপ্রকাশিত থেকে যায় মাতৃভাষা না হলে।

পণ্ডিত — ঠিক কথা। আচ্ছা, আপনার ফ্রেঞ্চ ভাষা দেখা ছিল?

শ্রীম — হাঁ, পড়েছিলাম। কিন্তু এখন কি আর সে শক্তি আছে? তখন গায়ে রক্ত ছিল। যা ইচ্ছা তাই করা যেতো। এখন আর তা হয় না।

আজ ১৩ই জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ; ২৯শে আষাঢ়, ১৩৩১ সাল, রবিবার। শুক্লা দ্বাদশী ৪৯।৫৩ পল।

এখন দশটা। পাশের বাড়ির ছেলেরা বন্দুক দিয়া একটি পাখী আহত করিয়াছে। পাখীটি উড়িয়া আসিয়া মর্টন স্কুলের দ্বিতলের বারান্দায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। শ্রীম-র আদেশে অন্তেবাসী উহাকে তুলিয়া আনিয়া একটি খাঁচাতে রাখিলেন চারতলার ঘরে। তারপর হলুদ ও চুণ গরম করিয়া তখনই আহত স্থানে। সেক দেওয়া হইল। কিন্তু

পাখীটি কিছুক্ষণ পর প্রাণত্যাগ করিল। পাখীর চক্ষু দুইটি নিমীলিত। শ্রীম এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, বেদনায় হৃদয় পূর্ণ, চক্ষু ছল্‌ছল্‌।

শ্রীম (মৃত পাখীর প্রতি) — তোমার যা দশা আমারও সেই দশা। তুমি চলে গেলে, আমিও যাব, হয়তো কয়েকদিন পর। আগে আর পরে এই দশাই সকলের প্রাপ্য ও প্রাপ্তব্য — সকল শরীরধারীর।

(অন্তেবাসীর প্রতি) — কার দোষ? কারো দোষ নয়। ছেলেরা মেরেছে, ও মরেছে। বস্তুতঃ ছেলেও নাই পাখীও নাই। আছেন কেবল তিনি — ঈশ্বর, সেই আদ্যাশক্তি। ঠাকুর বলেছিলেন, 'মা-ই সব হয়ে রয়েছেন।'

আমরা মানুষ কি না! স্নেহমমতা নিয়ে রয়েছি। তাই এর দুর্দশা দেখে দুঃখ হচ্ছে। এর আজ হয়েছে, কাল আমার হবে। কেহই রেহাই পাবে না। তবে যদি কেউ বুঝতে পারে ঐ মহাবাক্য — 'মা-ই সব হয়ে রয়েছেন', তবে আর ভয় নাই। তখন মৃত্যুঞ্জয়। তখনই বোধ হয়, 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'। মরা মারা তখন এক।

মৃত্যু এক মুহূর্তে সব শেষ করে দেয়। মানুষ কত রকম চেষ্টা করছে একে জয় করতে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পারে নাই। পঞ্চভূতের তৈরি এ শরীর কিছুতেই রাখতে পারছে না।

ঋষিরা কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় হয়েছিলেন অন্য উপায়ে। যে 'মা-ই সব হয়ে রয়েছেন', সেই মায়ের সঙ্গে এক হয়ে। স্থূল সূক্ষ্মাদি শরীর ছেড়ে জীবের 'আমি'টা ঐ বৃহৎ 'আমি' অর্থাৎ মহাকারণের সঙ্গে যোগ করিয়ে দিয়ে। সেই অবস্থার পরই তাঁরা বলেছিলেন, 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং'। আর সকল জীবকে সম্বোধন করেছিলেন, 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে। অমৃত হওয়ার এই একটি পথ, অমৃতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

৩

অপরাহ্ন চারিটা। বৃষ্টি হইতেছে। শ্রীম নিজ কক্ষে বিছানায় বসিয়া শচীকে মনুসংহিতা পড়াইতেছেন, ৪র্থ অধ্যায়। পাশে বসা জগবন্ধু। সদাচারের কথা হইতেছে। ১৩৮, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৮ ও ১৬২ —

এইসব শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — এই শ্লোকগুলি সব মুখস্থ করবে। আর একা একা বসে আবৃত্তি করবে। তাতেই ধ্যানের কাজ হয়। একে মনন বলা হয়। এ সব means (উপায়)। এ সব কথা মনে হলে, end-এর (উদ্দেশ্যের) কথা মনে হবে। কেন এ সব পালন করা? না, ভগবান লাভের জন্য। ভগবান লাভ end, উদ্দেশ্য। উপায় ছাড়া উদ্দেশ্য লাভ হয় না। খুব যত্ন করে এ সব উপায় অবলম্বন না করলে উদ্দেশ্য লাভ হয় না কখনও। তুমি কালীঘাটে যাবে। তার জন্য কয়েকটা রাস্তা আছে। এগুলি উপায় মাত্র। এর একটা তোমায় বেছে নিতে হবে; তবে কালীঘাট পৌঁছাতে পারবে। তেমনি ঈশ্বরলাভের নানা পথ। একটাকে নিতে হবে। বেদে আছে 'অপ্রমত্ত' হয়ে, 'শর-বৎ তন্ময়' হতে পারলে তবে উদ্দেশ্য লাভ হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়। আহার নিদ্রা ছেড়ে ঐ এক চিন্তায় মগ্ন হওয়া চাই।

সদাচার অসদাচার দুটো আছে। সদাচার গ্রহণ করতে হবে। সদাচার মানে ঋষিদের আচার, শুদ্ধ পথ, শুদ্ধ উপায়। 'পায়খানার পথ দিয়েও বাড়ি ঢোকা যায়', ঠাকুর বলতেন। কিন্তু সেটি শুদ্ধ পথ নয়। সদাচার recommend (উপদেশ) করেছিলেন ঠাকুর।

এ সব পড়ার খুব প্রয়োজন। এ সব জানা না থাকলে, মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ তৈরী করতে পারে না — In the light of this wisdom build your future. এটা সহজ পথ, আর tested (পরীক্ষিত)।

আর এক রাস্তা আছে ঘুরে ঘুরে গিয়ে পৌঁছান। সেটা অনিশ্চিত, না-ও পৌঁছাতে পারে। এ সব নিশ্চিত রাস্তা, বাঁধা পথ। বহু লোক গিয়েছে এ সব পথে।

(সহাস্যে) — 'মুড়ি মিছরীর এক দর করলে শূলে যেতে হবে', ঠাকুর বলেছিলেন।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — ওদের এসব মুখস্থ করতে বললুম। তা হলে taste (আস্বাদ) পাবে। তখন আরো পড়তে ইচ্ছা হবে।

এই দেখুন, শ্রাদ্ধের অন্ন খেতে মনুও বারণ করেছেন। ঠাকুর ভক্তদের মানা করেছিলেন। আমার কিন্তু আপনা থেকে বরাবর এটি ছিল। সারা জীবনে কখনও শ্রাদ্ধের অন্ন খাই নাই। ছেলে বেলা থেকে এই বিচার করতুম — আহা লোকটি মরে গেছে, কোথায় শোক করবে, তা না করে খাওয়া! এর প্রায় চৌদ্দ বছর পর ঠাকুরের দর্শন হয়। তখন তাঁর মুখে শুনলুম আবার ঐ কথা — শ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়া উচিত নয়।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসা। সামনে ও বাঁ পাশে বেঞ্চেতে বসা ভক্তগণ, বড় জিতেন, শচী, শান্তি, ডাক্তার, বিনয়, দুর্গাপদ, ছোট নলিনী, গদাধর, বলাই, বড় অমূল্য, মনোরঞ্জন, জগবন্ধু, বিক্রমপুরের ভক্ত প্রভৃতি। আলো আসিতেই শ্রীম-র সঙ্গে সকলে ধ্যান করিতেছেন। ইতিমধ্যে স্বামী অরূপানন্দ আসিয়া বসিয়া আছেন। ইনি মায়ের সেবক। ধ্যানান্তে শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। জয়রামবাটী, কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, মঠ ও উদ্বোধনের নানা সংবাদ লইতেছেন।

স্বামী অরূপানন্দ — আচ্ছা, আপনি ঠাকুরের মুখে কিছু শুনেছিলেন কি, ঠাকুর ও মায়ের বাল্য লীলার কথা?

শ্রীম — না, তেমন কৈ মনে পড়ছে না। হাঁ, ঐ একটি মনে পড়ছে। মাকে কোলে করে বাড়ির লোক গান কি কি হচ্ছিল তা দেখতে গিছলেন। তখন, যেমন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বড়রা আমোদ আহ্লাদ করে, তখন কে একজন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল — তুই কাকে বিয়ে করবি। মা ঠাকুরকে দেখিয়ে বলেছিলেন, একে। এই একটির কথা শুনেছিলাম।

হাঁ, আর একটি আছে। মায়ের বয়স তখন ছ' বছর। ঠাকুর বলেছিলেন, 'যা যা। ধামা নিয়ে গিয়ে আম কুড়োগে যা' (হাস্য)। মায়ের চলন ছিল জগদ্ধাত্রীর মত ধীর গম্ভীর।

ঠাকুর ও মায়ের সম্বন্ধে স্ত্রীভক্তগণ কে কি বলিয়াছেন, স্বামী অরূপানন্দ সেই সব কথা বলিতেছেন।

শ্রীম — আমি ওদের কথা বিশ্বাস করি না। শরৎ মহারাজ যদি বলেন তা হলে হয়। ওরা কি তখন অত care (গ্রাহ্য) করতো, না attention (মনোযোগ) দিতো? তা হলে, কি করে এ সব তারা বলতে পারবে?

আমরা যেখানে যেখানে personally (স্বয়ং) ছিলাম, সেখানে যা দেখেছি ও শুনেছি তাই বলি। অন্যের মুখে শুনে নয় — নিজ চোখে দেখে আর নিজ কানে শুনে।

লোক ঠিক ঠিক কথা না পেলে, দুই এক স্থানে না মিললেও ধরে নেয়, সবই হয়তো inconsistent (অসংগত)। অতএব এ সব unreliable reports (অবিশ্বাস্য সংবাদ)। যেমন কোর্টে উকিলরা ক্রস্ (প্রশ্ন) করে। এক স্থানে inconsistent (অসম্বন্ধ) দেখাতে পারলেই জজ prejudiced (সন্দিগ্ধ) হয়ে যায়।

স্বামী অরূপানন্দ পুনরায় ঐ ধরণের কথা বলিতেছেন। শ্রীম খানিকটা শুনিয়াই পুনরায় প্রতিবাদ করিলেন।

শ্রীম — অন্যের কথা বিশ্বাস হয় না। শরৎ মহারাজ বললে হয়। রেকর্ডস্ নাই ওদের। Corroboration (সমর্থন) চাই। Exaggeration natural (অতিরঞ্জন স্বাভাবিক)। আর তারা কি তখন অত care (গ্রাহ্য) করতো, ঠাকুর কখন কি করতেন, তা? না অত attention (মনোযোগ) দিত তাঁর সব movements (গতিবিধিতে)?

(সহাস্যে) — ঠাকুর বলেছিলেন, 'ওদের দেখে আমারও সাধ হলো পরিবারের কাছে যাই ওদের মত। একদিন গিছলামও — মাথায় গামছা, বাঁ হাতে ছাতা, ডান হাতে প্রসাদ।'

শম্ভু মল্লিক একটি বাড়ি তৈরি করিয়ে দিছলেন দক্ষিণেশ্বর গ্রামে। মা ওখানে তখন থাকতেন। কালীবাড়ির কর্মচারীরা ঐরূপে দুপুরে বাড়িতে যেতো কিনা? তাই দেখে ঠাকুরেরও সাধ হয়েছিল (হাস্য)।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা, ১৩ জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ, রবিবার।

একাদশ অধ্যায়

স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মরণে

১

অপরাহ্ন চারিটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে, উত্তরাস্য। তাঁহার বাম হাতে বেঞ্চেতে বসা কেদারনাথ ব্যানার্জ্জী। ইনি বৃদ্ধ, বারুইপুর বাড়ি। ওকালতি করিতেন। ঠাকুরের ভক্ত, স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। মাঝে মাঝে শ্রীম-র কাছে আসেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের শরীর ত্যাগের পর খুবই বিরহকাতর হইয়াছেন। তাই শ্রীম-র কাছে জুড়াইতে আসেন। কুশল প্রশ্নের উত্তরে আজও শিশুর ন্যায় কাতর হইয়া বলিতেছেন, শরীর ঠাকুরের কৃপায় ভালই যাচ্ছে। কিন্তু মন ভাল না। 'মহারাজের' স্নেহের অভাব হওয়ায় হৃদয় শূন্য বোধ হচ্ছে।

শ্রীম (সস্নেহে) — আহা, ঐ স্নেহ আর কার আছে? উহা ঠাকুরেরই স্নেহ। ঠাকুর স্নেহেতে সকলকে ডুবিয়ে এক করে রেখেছিলেন। ঐ স্নেহই নানারূপে নানা জনের ভিতর দিয়ে percolated (সঞ্চারিত) হচ্ছে। এটি দৈবী জিনিস। মানুষের স্নেহে বদ্ধ হয়, ঠাকুরের স্নেহে মুক্ত হয়।

শ্রীম — এর মধ্যে মঠে গিছলেন? যাবেন মাঝে মাঝে। তারক মহারাজ রয়েছেন।

কেদার— আজ্ঞা না, যাওয়া হয় নাই অনেকদিন। বাবুরাম মহারাজ থাকতে খুব একটা টান হতো যাওয়ার। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মঠে না থাকলেও কে যেন টেনে নিয়ে যেতো। মঠে গেলে মনে হত যেন মায়ের কাছে ছেলে এসেছে।

শ্রীম (জিভে সমর্থনসূচক তিন বার মৃদু ধ্বনির সহিত) — তা

আর বলতে? বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের আর একটি অদ্ভুত জিনিস। যে একবার মিশেছে সে ভুলতে পারে না। সকলেই বলে, আমাকে খুব ভালবাসতেন। ঠাকুরের প্রেমের ঘনমূর্তি। প্রেমানন্দ, আহা, কি নামই যে দিয়েছেন স্বামীজী!

হবে না কেন? কত প্রেম পেয়েছে ঠাকুরের কাছে — যাকে বলে 'কলসে কলসে প্রেম'। তাই তো বাবুরাম নিজের গর্ভধারিণীকে বলেছিলেন, ছেলেবেলায় — 'মা, ঠাকুরের ভালবাসার কাছে তোমার ভালবাসা টেঁকে না'।

কেদার স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি কীর্তন করিতেছেন।

কেদার — একবার মহারাজ মঠে রয়েছেন। একদিন গিয়ে বললাম, আমার মাঝে মাঝে পুরশ্চরণ করতে ইচ্ছা হয়। উনি বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। শুনে যেন তাঁর ভাবনা হল। একটু পর বললেন, ঠাকুরের উপর মন থাকলেই হল। ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোদের বেশী কিছু করতে হবে না। আমার ধ্যান করলেই হবে।'

শ্রীম — তা আর বলবেন না? ঠাকুর বলেছিলেন, 'মা আমাকে ষোল টান্ করিয়েছে। তোদের অত করতে হবে না'।

করা, না করা তো আসল কথা নয়; আসল কথা হচ্ছে 'সচ্চিদানন্দে প্রেম'। এটি তাঁর কৃপাসাপেক্ষ। বেদে আছে, পুরুষকার টুরুষকার দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। তবে, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। ও সবে যদি ঈশ্বরলাভ হতো তা হলে আর রক্ষে ছিল না — এই পূর্ণাহুতি, পুরশ্চরণ প্রভৃতিতে।

কত পথ আছে। কিন্তু ঠাকুর recommend (নির্দেশ) করেছিলেন কালোপযোগী সোজা পথটি। বলেছিলেন, 'নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক — দেখা দাও, দেখা দাও বলে।'

কেদার — হরিপ্রসন্ন মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) একা একা থাকতেন। 'মহারাজ' তাঁকে তাই খুব ভালবাসতেন।

শ্রীম — বস্তুলাভ হলেই একা একা থাকে। একা একা থাকতে চাইলে বুঝতে হবে বস্তুলাভ হয়েছে। আর তা না হলেই, ঐ —

হৈ চৈ।

কেদার — একদিন বসে আছি, হঠাৎ ‘মহারাজ’ বললেন, ভক্তেরও জ্ঞান হয়। ব্যস্, কথাটি বলেই একেবারে চুপ। তামাক খাচ্ছেন বসে। খানিক বাদে আবার বললেন, ভক্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করেও ‘ভক্তের আমি’ নিয়ে থাকে লীলা আস্বাদনের জন্য।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, ‘গোপীদেরও অদ্বৈত জ্ঞান ছিল’। বলেছিলেন, ‘চৈতন্যদেবের ভিতরে এই জ্ঞান ছিল। বাইরে ভক্তি নিয়ে ছিলেন।’ ঠাকুরেরও তাই। বলেছিলেন, ‘অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে কর’। আবার বলেছেন, ‘শুদ্ধা ভক্তি আর শুদ্ধ জ্ঞান এক’। ভাগবতে আছে মুনিরা আত্মারাম হয়েও অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করে অহৈতুকী ভক্তি নিয়ে থাকেন — ‘কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং’।

কেদার — একদিন বললেন, দেহটা যতদিন আছে তাঁরই নাম করা যাক্। এটা তো আর বরাবর থাকবে না!

শ্রীম — আহা, কি কথা — একেবারে চৈতন্য করিয়ে দেয়।

কেদার — মহারাজ কিছু করতে বলতেন।

শ্রীম — হাঁ। তা হলে খেদ মিটে। ঠাকুর তাই বললেন, ‘আমাকে ধ্যান করলেই হবে’। মায়ের অধীন হয়ে, মাকে বলে করলে আর তাঁকে ভুলে না। নইলে বড় মুস্কিল। তাঁর মহামায়া সব ভুলিয়ে দেয়। কেন ধ্যান করছি সেই উদ্দেশ্য ভুল হয়ে যায়। শুধু করতেই থাকে। কিছু করা তো উদ্দেশ্য নয় — উদ্দেশ্য তাঁকে লাভ করা। এটি জানিয়ে রেখে সব করা।

সকলের কি এক পথ? যে মনে করুন যুবক, কর্মের ইচ্ছা প্রবল, তাকে করতে হবে। না করলে এর মনের খেদ মিটবে না। এতে আবার লোকশিক্ষাও হয়ে যায়। ‘ভগবান মাছের তেলে মাছ ভাজেন’, ঠাকুর বলতেন। মা’র হাত ধরে গেলে ভয় কম। কিন্তু মা হাত ধরলে একেবারেই ভয় নাই।

কেদার — মহারাজ বলতেন, অমুক একটু নাম চায়। আচ্ছা, ওকেই করা যাক্ ভাইস্ প্রেসিডেন্ট।

শ্রীম — এ উদার দৃষ্টি আর কার আছে? যে যা চায় তাকে তাই দেন। মানে, এ সবে তো কিছু নাই কি না!

কেদার — কি ভালবাসাটাই ছিল ওঁদের পরস্পরের! অমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। মঠে গেলে বাবুরাম মহারাজ বলতেন, যান ও পাড়াতে বর রয়েছেন, দর্শন করে আসুন। মহারাজকে লক্ষ্য করে বলতেন। কি গভীর প্রেম!

শ্রীম — এটিও ঠাকুরের কাছে পাওয়া। ভক্তরা দেখতেন কিনা, ঠাকুর তাঁদের কত ভালবাসতেন! তাঁদের ভালবাসলে তাঁকেই (ঠাকুরকেই) ভালবাসা হলো। শরীর যাবার পূর্বে ক্রাইস্ট নিজ হাতে জল দিয়ে ভক্তদের পা ধুয়ে মুছিয়ে দিছলেন। তবেই তো ভক্তদের পরস্পরের জন্য অত টান ছিল!

কেদার — মহারাজ হেসে বলতেন, লোক নানা জিনিসের ব্যবসা করে। আচ্ছা, তারা ঠাকুরকে নিয়ে ব্যবসা করে না কেন, বলুন তো?

শ্রীম — কত লোক তো তাঁর কাছে গিয়েছে। কিন্তু তারা চিনতে পারলো কৈ? চিনবার কি যো আছে? তিনি চিনালে চিনতে পারে। তিনি যাঁদের ইচ্ছা করেছিলেন তাঁরা তাঁকে নিয়ে ব্যবসা করেছিলেন। 'সে হাটে বিকায় না সুতো, বিকোয় কেবল নন্দরাণীর সুত', গানে আছে।

কেদার — সত্য কথা বলতে বলতেন মহারাজ।

শ্রীম — ঠাকুরের মুখে শুনেছিলেন কিনা — 'সত্য কথা কলির তপস্যা'। ঠাকুর বলেছিলেন, 'মাকে সব দিয়ে দিলুম, কিন্তু সত্য দিতে পারি নাই। কি নিয়ে থাকবো তা হলে'? শাস্ত্রে আছে, 'সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।'* কিন্তু ঠাকুরকে এক একবার দেখেছি অপ্রিয় সত্যও বলেছেন। 'তারও দরকার কখনো' কেশববাবুকে বলেছিলেন। তিনি ভালর জন্য বলেছেন। তাঁতে প্রিয়-অপ্রিয় ছিল না।

---

* সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ংচ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।। মনুসংহিতা

সকলেই তাঁর প্রিয়। সকলের কল্যাণের জন্যই তাঁর ভাবনা। জনসাধারণের মান্য করা উচিত এই নীতিটি — 'মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।' নইলে কর্কশ নিষ্ঠুর হয়ে যায় প্রকৃতি। অসংযম এসে যায়। মুখ হল্‌সা ভাল নয়। কিন্তু প্রয়োজন হলে অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলা উচিত।

কেদার — ঈশ্বরে ভালবাসা হয় কি করে?

শ্রীম — এই যা করছেন তাতেই হবে। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা করলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়! তা হলেই নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকবার ইচ্ছা হবে — দেখা দাও দেখা দাও বলে। ঠাকুরের প্রেস্‌ক্রিপসান্ (ব্যবস্থা) এই। আর নামগুণ কীর্তন করতে বলেছেন, অর্থাৎ অভ্যাস করা।

কেদার — এই বিষয়বিদ্ধ মনে, কি করে হয় এ সব? এই মনে কি করে তাঁকে লাভ হবে?

শ্রীম — না, এ মনে তাঁকে লাভ হয় না। তিনি বলেছিলেন, সাধু-সঙ্গ করলে আর নির্জনে প্রার্থনা করলে মন শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনের তিনি গোচর। তাঁর কৃপাতেই সব হয়। তাঁর কৃপা হলেই সাধুসঙ্গ ও নির্জনবাস করার ইচ্ছা হয়।

মনে করুন, ছেলের অসুখ। মা কত পূজা পাঠ শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেছে। তারকেশ্বরে হত্যা পর্যন্ত দিয়েছে, বিশেষ কিছু হচ্ছে না। ছেলে এক একবার চিৎকার করছে যন্ত্রণায় — মা বড্ড লাগছে। মা কি আর করে তখন? আর কিছু করবার নাই যে। মা বলে তখন নিরুপায় হয়ে — বাবা ভগবানকে বল। তিনি ভাল করবেন।

শেষ আর্জি ভগবানের কাছে। মনের খেদ মেটাতে মা সব করেছে। করলেই হবে? তা নয়। তাঁর কৃপা সার। আর পথ নাই।

কেদার — 'মহারাজ' একদিন বললেন, 'চৈতন্যের একটা আলাদা ঘর আছে'। কখনও বলতেন, 'চৈতন্য না হারায়'।

শ্রীম — ঠাকুর দেখেছিলেন সেটি। বলেছিলেন, 'মা দেখালেন তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। গাছপালা, বাগান, ফলফুল, মালী, সব মোমের, মানে চৈতন্যময়, সচ্চিদানন্দে তৈরী। নামরূপ মাত্র একটু

আছে — যেন টাকায় এক পয়সা। বাকী সব চৈতন্যময়।'

আবার এক অবস্থায় চৈতন্যসাগরে একেবারে মিশে যেতেন। পরে ফিরে এসে বলতেন, 'নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে মিশে গেল'। নিরাকারের ঘর, আবার সাকারের ঘর, দুই-ই চৈতন্য — চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্যময় সব।

ঠাকুরকে স্মরণ রাখলেই চৈতন্য থাকে। চৈতন্য মানে, ঈশ্বর আমার আমি তাঁর, এ জ্ঞান। আমি সংসারে আছি বটে। কিন্তু সংসারের নই, ঈশ্বরের।

কেদার — মনটা মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে যায়। এই বেশ আছে, আবার চঞ্চল হয়।

শ্রীম — আপনাদের অমন গুরু লাভ হয়েছে, ভয় কি? যার গুরু লাভ হয়েছে তার ঠেসান দেবার তাকিয়া লাভ হয়েছে। এখন মোচে তা দিয়ে গড়গড়াতে আরামে তামাক খাও। মাঝে মাঝে অমন হয়। আপনাদের ভয় নাই। ঠাকুর রয়েছেন, গুরু রয়েছেন পিছনে সর্বদা।

এখন অপরাহ্ন ছয়টা। কেদার আম প্রসাদ পাইয়া শ্রীমকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাত্রি ন'টা। শ্রীম ছাদে বসিয়াছেন। ভক্তগণ, বড় জিতেন, শুকলাল, ডাক্তার, বিনয়, বলাই, অক্ষয়, জগবন্ধু, গদাধর প্রভৃতি সামনে বসা। আকাশে চাঁদ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আজ হীরানন্দের তিরোধান সভায় গিছলাম বুদ্ধ বিহারে। সমস্ত সিন্ধু আজ তাঁর জন্য mourn (শোক) করছে। ১৮৮৪ সালে পূর্ণিমা রাতে হীরানন্দ যাচ্ছেন দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে আসছেন কলকাতায়, গ্রে স্ট্রীটের দিকে। ঠাকুর তাঁকে দেখে বললেন, 'ওগো থাম থাম। যাচ্ছ কোথায়?' হীরানন্দ বিস্ময়াহ্লাদে বললেন, এই চাঁদ দেখতে। কি কথা! চাঁদ দেখতে মানে ঠাকুরকে দর্শন করতে। আর চাঁদ মানে আকাশের চাঁদ। দ্ব্যর্থ। কত ভালবাসতেন ঠাকুর তাঁকে! একদিন চুমু খেয়েছিলেন —

অত ভালবাসা।

আজ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য প্রমথ সেন বক্তৃতা দিলেন, হীরানন্দ এখানে পড়াশোনা করতেন। বিপিন পালও বক্তৃতা দিলেন। তিনি এসে আলাপ করলেন। বললেন, বয়স এখন সাতষট্টি।

সভার শেষে শ্রীম কলেজ স্কোয়ারের ভিতর দিয়া গিয়া হ্যারিসন রোডের মোড়ে রিক্সা চড়িয়া ফিরিয়াছেন। জগবন্ধু প্রভৃতিকে মিটিং-এ পূর্বেই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

১৪ই জুলাই ১৯২৪ খ্রীঃ।
৩০ আষাঢ় ১৩৩১ সাল।
সোমবার, শুক্লা ত্রয়োদশী ৪৩।৪২ পল।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিস্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদের দরজায় শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। সকাল আটটা। ডান দিকের ঘরে থাকেন জগবন্ধু। টিনের ঘর। উপর থেকে জল পড়ে। জগবন্ধু ও বিনয় উহা পুটিং দিয়া সারিতেছেন। শ্রীম দেখিতেছেন আর মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — নিজের কাজ নিজে করা ভাল। গীতায় আছে 'অনপেক্ষ'। ভক্ত অপরের অপেক্ষা রাখে না। নিজে করে। এটি সাত্ত্বিক কর্মীর একটি লক্ষণ।

'ঈশপ'স্ ফেবল'-এ পাখীদের কথা আছে। মা বাচ্চাদের বলেছিল, ভয় পেয়ো না। যেদিন মালিক নিজে এসে ফসল কাটবে সেদিন আমরা অন্যত্র যাব। এর আগে যাবার দরকার নাই, ভয়েরও কারণ নাই। মালিক কর্মচারীদের সঙ্গে বলাবলি করছিল, ফসল কাটতে হবে, পেকে গেছে সব। বাচ্চাগুলো এই কথা শুনে ভয়ে চেঁচামেচি করছিল। ওদের বাসা ঐ ক্ষেতে ছিল কিনা। মা ফিরে এসে ঐ কথা শুনে ঐরূপ বলেছিল, যেদিন মালিক নিজে এসে কাটতে শুরু করবে ফসল, তখন আমরা অন্যত্র যাব।

নিজে করলেই সুসম্পন্ন হয় কাজ, আর শীঘ্র হয়।

আজ ১৫ই জুলাই ১৯২৪ খ্রীঃ, ৩১শে আষাঢ় ১৩৩১ সাল, মঙ্গলবার। অপরাহ্ন চারটা। শ্রীম দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া আছেন। অক্ষয় ডাক্তার ঠাকুরদের জন্য ফল মিষ্টি লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম চারতলা থেকে অন্তেবাসীকে ডাকাইয়া আনাইলেন। তাঁহার হাতে অক্ষয় ফল মিষ্টি দিলেন। দিবার সময় ঠোঙ্গা হইতে একটি সন্দেশ

পড়িয়া গেল। এর পূর্বেও তাঁহার হাত হইতে একটি সন্দেশ পড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীম রহস্য করিয়া বলিতেছেন, কপাল দেখছি বড়ই মন্দ, খালি পড়েই যাচ্ছে (হাস্য)।

সন্ধ্যা। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ছাদে ধ্যান করিতেছেন অন্তেবাসীর টিনের ঘরের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া, দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ শ্রীম-র সামনে ডানে ও বামে বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পর ভৌমিক উঠিয়া গিয়া উত্তর দিকে বসিয়া ছাতা খুলিয়া ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার শরীর বেঁকিয়া গিয়াছে, মাথা নিচু। শ্রীম উঠিয়া গিয়া ঐ দিকে পায়চারী করিতেছেন দীর্ঘ পদক্ষেপে। নিজের তালুর উপর দক্ষিণ বাহু দিয়া মাঝে মাঝে চাপিতেছেন। মাঝে মাঝে এরূপ করিতে দেখা যায়, প্রবল ভাবাবেগে কি এরূপ করেন?

কিছুকাল পরে শ্রীম পুনরায় আসিয়া বসিলেন। এবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভৌমিককে লক্ষ্য করিয়া ভক্তদের প্রতি) — ধ্যান করতে হয় সোজা হয়ে বসে। ধ্যানের সময় মাথা, ঘাড় ও spinal chord (মেরুদণ্ড) এক straight line-এ (সরল রেখায়) থাকবে। বেদে আছে, 'ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং' (শ্বেতা ২/৮)। গীতায় বলেছেন, 'সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ' (৬/১৩)। শাস্ত্রানুকূল আচরণ করা উচিত। অন্ততঃ চেষ্টা করা উচিত।

আবার এও আছে, ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হলে আপনা থেকেই ঐ সব সোজা হয়ে যায়। Converse proposition is sometimes true — বিপরীত বচন কখনও কখনও সত্য।

অজ্ঞাতে অন্তেবাসীর ডান পা-টি মৃদু আন্দোলিত হইতেছে দেখিয়া শ্রীম সাবধান করিতেছেন।

শ্রীম — জগবন্ধুবাবু, পা নাচাবেন না। ঠাকুর প্রতাপ মজুমদারকে বলেছিলেন, এতে লক্ষ্মীছাড়া হয়। কি আশ্চর্য! ঠাকুরের সব দিকে নজর! অঙ্গভঙ্গীর ভিতর দিয়েও অন্তরের ভাব দেখতে পেতেন। অমনটি আর হয় না।

(সহাস্যে) — ছেলেবেলায় আমি প্রতাপ মজুমদারকে বলতুম সিসারো (Cicero)। খুব বড় Orator (বক্তা) ছিলেন। কি সব High sounding words (শব্দঝড়ি)! অনর্গল বেরুচ্ছে। আর কেশববাবুকে বলতুম, দিমস্থেনিস্ (Demosthenes)। আমরা তখন পড়াশোনা করছি।

কেশববাবুর লেকচার শুনবার জন্য দু তিন ঘন্টা আগে গিয়ে বসে থাকতুম, খুব ভালো লাগতো। টাউন হলে লেকচার হবে, লোকে লোকারণ্য। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার পর বুঝলাম, কেন কেশব বাবুর কথা অত ভাল লাগতো। ঠাকুরের ভাব নিয়ে তিনি লেকচার দিতেন। ঠাকুরের কথাই এই channel (মনোপথ) দিয়ে percolated (প্রবাহিত) হতো।

কেশববাবুর কথা শুনে মনে হতো, ঈশ্বর উচ্চে, অতি দূরে। ঠাকুরের কাছে গিয়ে শুনছি, ঈশ্বর অতি নিকটে! শুধু কি তাই? এক ঘর লোক বসা। ঠাকুর বলছেন, 'মাইরি বলছি, মা এসেছেন'। ভক্তরাও এই আবির্ভাব বুঝতে পারতেন হৃদয়ে, ঈশ্বর অতি নিকটে, যেন হাতের কাছে।

বড় জিতেনের প্রবেশ। ইনি স্থূলকায়, চারতলায় উঠিতে হাঁপাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীম (রহস্যচ্ছলে পূর্ববঙ্গের ভাষায়) — আরে চেয়ার আন্, চেয়ার আন্। চেয়ারে বসুন চেয়ারে বসুন। আহা, বড্ড tired (পরিশ্রান্ত); তবুও spinal chord-টা (মেরুদণ্ডটা) একটু সোজা হবে!

(সহাস্যে) — আমি তখন নড়াল স্কুলের হেড মাস্টার। একটা গল্প শুনেছিলাম তখন। রতন রায় ওখানকার জমিদার। একদিন তিনি বৈঠকখানায় ফরাসের উপর বসে আছেন তাকিয়া ঠেসান দিয়ে, আর গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছেন। হাঁটুর উপর কাপড়। ভূদেববাবু স্কুল ইন্স্পেক্সান করতে গেছেন নড়ালে। উনি গিয়ে উপস্থিত হলেন বাবুদের বৈঠকখানায়। দেখতে সামান্য লোক, সাদাসিধে পোষাক।

রতন রায় জিজ্ঞেস করলেন (পূর্ববঙ্গের ভাষায়) তুমি চাও কি? ভূদেববাবু উত্তর করলেন, কিছু না। আপনাকে দেখতে এসেছি।

রতন রায় — তোমার নাম?

ভূদেববাবু — ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

রতন রায় — তুমি কর কি?

ভূদেববাবু — এই ইস্কুল-টিস্কুল দেখাশোনা করি।

রতন রায় — ও-ও, বুঝেছি, ছাত্র পড়িয়ে খাও বুঝি? কত টাকা মায়না পাও?

ভূদেববাবু — বারশ’।

এই কথা শুনে গুড়গুড়ির নল মুখ থেকে গেল পড়ে। কাপড় টেনে দিলেন আর সোজা হয়ে বসে — চেয়ার আন্, চেয়ার আন্ বলে রায় মশায় চীৎকার আরম্ভ করলেন (সকলের উচ্চহাস্য)।

(রঙ্গ করিয়া) তাই বেশী মা—ই—নে চাই! মাইনে দেখে চেয়ার!

২

শ্রীম (গম্ভীর ভাবে) — কিন্তু ঠাকুরের এরূপ ছিল না। সর্বদাই ঈশ্বরকে দেখছেন সকলের ভিতর, আর ‘মা মা’ করতেন। ভক্তদের বলেছিলেন, ‘যেদিন তোদের মানুষ-বুদ্ধিতে দেখবো, সেদিন থেকে তোদের মুখ দর্শন করবো না’। তিনি দেখতেন, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন — অন্তরে বাইরে, মা! তাই, শপথ করে বলেছিলেন, ‘মাইরি আমি মাকে দেখ্‌ছি সর্বভূতে, এই চোখে। বিচার আর কি করবো তা হলে?’

যতীনঠাকুরকে বলেছিলেন, ‘তোমায় রাজাটাজা বলতে পারবো না’। তিনি কি তাঁকে অপমান করবার জন্য বলছেন এই কথা? তা নয়। দেখছেন, মা’র শক্তিতে সব কিছু হচ্ছে আর মা-ই সব হয়েছেন। রাজা-টাজা এগুলি মানুষের বানানো কি না? ঈশ্বরের ভক্ত — এটি ভাল।

কি অবস্থা গেছে তাঁর! বলতেন, ‘ঈশ্বরের কথা ছাড়া থাকতে

পারতুম না। প্রথম যখন ঈশ্বরের দর্শন হল, তখন একেবারে উন্মাদ। কোথায় ভাগবত হচ্ছে, কোথায় তাঁর কথা হচ্ছে, খুঁজে বেড়াতাম্।'

বিষয়ী লোক দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন। বলেছিলেন, 'একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে বেড়াতাম। পাছে বিষয়ীদের গায়ের হাওয়া লাগে।' বলতেন, 'অন্ততঃ তিন হাত তফাৎ থাকতে হয় বিষয়ীদের থেকে। বিষয়ীদের সঙ্গে জ্ঞানের কবাট বন্ধ হয়ে যায়।'

চৈতন্যদেব আলালনাথে চলে যাচ্ছিলেন, রাজা প্রতাপ রুদ্র আসবে শুনে। রাজা বিষয়ীর শ্রেষ্ঠ কিনা তাই।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমায় যোল টান্ টানতে হয়েছিল, তোদের অত নয়। তোরা সা, রে গা-তে থাকবি, রসে বসে থাকবি। আমায় যে মা এ অবস্থায় রেখেছেন, সে নজীরের জন্য।'

বলেছিলেন, সকলেই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে. কিন্তু কারো ঘড়ি ঠিক নয়। একমাত্র সূর্যই ঠিক চলছে। তার সঙ্গে মিলাতে হয়। অবতার হলেন সেই সূর্য।

শাস্ত্র শাস্ত্র করে লোক, শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশান আছে। কে এখন চিনিটুকু আলগা করে দিবে অবতার ছাড়া? তাই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, জীবন্ত ভাষ্য হলো ঠাকুরের অদ্ভুত জীবন। মা হাতে ধরে ব্যাখ্যা করাচ্ছেন জীবন দিয়ে, কথায় নয়।

কত ভালবাসা হলে এটি হয়, 'মা-মা' করে বেহুঁশ, সমাধিস্থ! অপর লোক টাকা, মান, মেয়েমানুষের কথায় বেহুঁশ। আর ঠাকুর ঈশ্বরের জন্য, মা'র জন্য বেহুঁশ।

অবতার এসে বুঝিয়ে দেন কোন্টা সৎ কোন্টা অসৎ, কি ভাল কি মন্দ, কোন্টা ন্যায় কোন্টা অন্যায়; কোন্টা কর্তব্য কোন্টা অকর্তব্য, কোন্টা ত্যাজ্য কোন্টা গ্রাহ্য, কি প্রেয় কি শ্রেয়।

অবতারের জীবন এই সব নজীরের জন্য। কোর্টে নজীর না হলে কেস্ জিতা যায় না। জজ বলে, নজীর দেখাও। কেবল 'ল' interpret (ব্যাখ্যা) করলে হবে না; নজীর দেখাতে হবে সঙ্গে সঙ্গে, কোন্ হাইকোর্টে কি রুলিং হয়েছে।

ঠাকুরের জীবনের প্রতি কথা, প্রত্যেকটি ঘটনা নজীরের জন্য। এমনটি আর হয় না।

নিজেকে নিজে দেখে এক একবার অবাক্ হয়ে যেতেন। একদিকে দেখতেন, মহামায়ার অবিদ্যার খেলা, আর এক দিকে তাঁকে নিয়ে মায়ের বিদ্যা-মায়ার খেলা। অবিদ্যা-মায়ার তাজ্জব কাণ্ড দেখে মাকে প্রার্থনা-মুদ্রায় প্রসন্ন করতেন — 'মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না'। এই প্রার্থনাটি লোকশিক্ষার জন্য। জীব মায়ের শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করলে, তবেই মায়ের কৃপায় শান্তি-সুখ লাভ করবে, সংসারের এই গোলকধাঁধার ভিতর থেকে। মায়ের তাজ্জব কাণ্ড দেখে বিস্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ।

ডাক্তার ও বিনয়ের প্রবেশ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন চেয়ে একবার উপরের দিকে, কি কাণ্ডটা চলছে! কি অদ্ভুত সৃষ্টি! চন্দ্র-সূর্য গ্রহনক্ষত্র, এই আকাশ, কি আশ্চর্য ব্যাপার! সূর্যকে রোজ পাঠিয়ে দিচ্ছেন জীবের রক্ষার জন্য। কিন্তু লোক মনে করে এতে আর আশ্চর্য কি? রোজ উঠে, আজও উঠেছে। সমস্ত বিশ্বটা একটা শক্তি দিয়ে একসঙ্গে গ্রথিত। তিনি ধরে রেখেছেন। আমরা মনে করি, আপনিই চলছে। কি tremendous (প্রচণ্ড) শক্তির খেলা! এই gigantic miracle (এই বিরাট অলৌকিক ব্যাপার) দেখেও আবার লোক বলে, miracle (অলৌকিক কার্য) দেখাও। জীব-বুদ্ধির কাজই এই — বিশ্বাস হয় না, সংশয় আসে।

আবার মানুষের ভিতর দেখ না? তিনি বুদ্ধি দিয়েছেন। এই বুদ্ধি দিয়ে আকাশের এই সব জ্যোতিষ্কমণ্ডলের চিন্তা করতে পারে। শুধু কি তাই? আবার এই বুদ্ধি দিয়েই ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারে মানুষ, তাঁকে দর্শনের চেষ্টা করে। ঠাকুর তাই সর্বদা ভরসা দিয়ে বলতেন, 'এই পাঁকের ভিতর দিয়ে পদ্মফুল ফুটে। ঈশ্বরের চিন্তা করলে এই বুদ্ধিই শুদ্ধ হয়। সেই বুদ্ধিতে তাঁর দর্শন হয়।'

শ্রীম অবাক্ হইয়া গাহিতেছেন।

গান ঃ শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে,
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতরি, কত রঙ্গ দেখাতেছে।
আপনি থাকি কলের ভিতরি কল ঘুরায় ধরে কলডুরি,
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে।।
যে কলে জেনেছে তাঁরে, কল হ'তে হবে না তারে,
কোনো কলের ভক্তি ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।

(কথামৃত ৪/১৬-১)

গান। চমৎকার অপার রচনা তোমার।
শোভার আগার এ বিশ্ব সংসার॥ ইত্যাদি।

(বিস্মিত হইয়া) — কি mechanism (রচনা কৌশল) এই শরীরটা! গরমে শরীর যায় যায়। যেই এক টুকরা মিছরী মুখে দিলাম, ওমা, কোত্থেকে সব শক্তি ফিরে এল দেখছি! তখন মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় কাজ করতে লাগলো।

সাধুরা এ সব চিন্তা করার অবসর পায়, অন্যদের অবসর নাই। পেটটা নিয়ে কেবল ভুলে আছে। দেবতারাও ভোগে ভুলে আছে, অপ্সরা-ফপ্সরা নিয়ে। দেবতারা নাকি মানুষের মুক্তির পথে বাধা দেয়। লোক মুক্ত হয়ে পরমানন্দ উপভোগ করুক, এটা তারা চায় না। ওরা চায় মানুষ আমাদের সেবা করুক।

যদি বল, কেন সকলেই তাঁকে দেখতে পায় না? তার উত্তর, সংস্কার। পূর্বজন্মের কর্ম ও বাসনাতে ঢেকে আছে মন। ঠাকুর ভক্তদের সব জানতেন, কে কি ছিল পূর্বজন্মে। বেশি বলতেন না, পাছে বিগড়ে যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন অর্জুনকে, 'তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।'

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — কি শ্লোকটা?

ডাক্তার — বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

(গীতা ৪/৫)

শ্রীম-ও সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতেছেন।

শ্রীম (ক্ষণকাল পর) — ঠাকুর কি কারো অপেক্ষা করতেন, তা নয়। অমুক আমায় বড় বলবে, কি অমুক আমার সেবা করবে, কি কাজ করে দিবে, এ সব ভাবনা তাঁর ছিল না। অবতার যে তিনি! তাই 'অনপেক্ষঃ'। মা রয়েছেন সর্ব্বদা সঙ্গে, দেখছেন। তা হলে আর কার অপেক্ষা?

ঠাকুরের সদা ভরসা মা, আর প্রার্থনা, 'মা তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। অহৈতুকী ভক্তি।'

চৈতন্যদেবেরও প্রার্থনা এই অহৈতুকী ভক্তি।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরে ভবতাং ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

সুখ শান্তি লাভের এটি হলো সনাতন আদর্শ।

কলিকাতা।
১৫ই জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ।
মঙ্গলবার।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেদ যেন বোবার গোঙানি

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। রাত্রি আটটা। শ্রীম টিনের ঘরের সামনে চেয়ারে বসিয়া আছেন, শ্রীম-র সম্মুখে ভক্তগণ তিনদিকে বসা বেঞ্চেতে। নিত্যকার ভক্তগণ প্রায় সকলেই রহিয়াছেন। গতকাল হীরানন্দের স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। তারই কথা আজও হইতেছে।

শ্রীম — হাঁ, কাল হীরানন্দের মিটিং-এ তোমরা গিয়ে কি শুনলে?

ছোট রমেশ — হীরানন্দ ঠাকুরকে খুব ভালবাসতেন। ঠাকুরের অসুখের সময় তাঁকে দেখতে এসেছিলেন বার শ' মাইল দূর সিন্ধুদেশ থেকে। ইনিই নূতন সিন্ধুদেশের একজন জনক, সর্বদা দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। দেশকে অত ভালবাসতেন। সেই দেশসেবা থেকেও বেশী ভালবাসতেন ঠাকুরকে। ঐ সব কাজ ছেড়ে এলেন দেখতে। ছেলেবেলায় ঠাকুরের প্রগাঢ় ভালবাসা পেয়েছিলেন। তখন কেশববাবুর কাছে থেকে কলেজে পড়তেন।

জগবন্ধু — বেণী দাস বললেন, ঠাকুরের সঙ্গে হীরানন্দের পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ছিল।

শ্রীম (জিহ্বা দ্বারা তিনবার আনন্দ-ধ্বনি প্রকাশে) — আহা, কি কথা! ঠিক্ ঠিক্।

এটর্ণি বীরেন, নূতন বিনয় ও প্রভাসের পিতার প্রবেশ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শুদ্ধ ভক্ত ছাড়া ঠাকুর থাকতে পারতেন না। অনেক লোক বসা ঘরে, কিন্তু কথা কইতেন শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে। কখনও কখনও অন্যদের দিকে পেছন দিয়ে কথা কইতেন। ঠাকুর বাইশ বছর ধরে ব্যাকুল হয়ে তাঁদের ডাকতেন। অনেককে মা বহু

পূর্বে দেখিয়ে দিছলেন। তাই তাঁদের জন্য অত ভালবাসা। কাঁদতেন আরতির সময় কুঠির ছাদে উঠে আর বলতেন, মা এদের এনে দাও। কয়েক বছর পর বললেন, কই মা, ওরা তো এলো না? তুমি যে বলেছিলে আসবে? মা প্রবোধ দিয়ে বলতেন, বাবা আর একটু অপেক্ষা কর। কাঁদতেন আর বলতেন, 'মা এই কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। শুদ্ধ ভক্তদের শীঘ্র এনে দাও।' শুদ্ধ ভক্ত সব মায়ের চিহ্নিত লোক।

শ্রীম মত্ত হইয়া গান ধরিলেন।

গান। এ হাটে বিকোয় না সুতো।
বিকোয় কেবল নন্দরাণীর সুত॥
এ হাটের প্রধান তাঁতি, প্রজাপতি পশুপতি।
আর যত অন্য তাঁতি তাদের কেবল যাতায়াতি॥

গান। একি বিকার শঙ্করী
কৃপা-চরণতরী পেলে ধন্বন্তরী। ইত্যাদি

গান। জীব সাজ সমরে,
রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে। ইত্যাদি

গান। এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই (মা),
সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥

গান। শ্যামা মা কি আমার কালো রে।
কালো রূপে দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো রে॥
কখন শ্বেত কখন পীত, কখন নীল লোহিত রে।
আগে নাহি জানি কি ভাব জননী, ভাবিয়ে জনম
গেল রে॥ ইত্যাদি

শ্রীম (দীর্ঘ নীরবতার পর) — আগেরগুলিতে জগৎলীলার চিত্র। আর শেষেরটিতে তাঁর স্বরূপ চিত্র। ভয় তারপর ভরসা। উপায়, সাবধান হওয়া। মানুষ কি নিয়ে আছে সারাদিন? আবোল তাবোল বকছে, আর অকাজ-কুকাজ করছে।

বড় অমূল্য — চব্বিশ ঘন্টাই এই নিয়ে আছি আমরা।

শ্রীম — তাই তো ঠাকুরের আগমন, সত্য পথ দেখাতে। আর আচরণ, চব্বিশ ঘন্টা তিনি মাকে নিয়ে আছেন। সংসারী জীবের ঠিক উল্টো পথ তাঁর।

বড় জিতেন — চোখ মেললেই যত গোল।

শ্রীম — না, আমাদের পাখীর মত হতে পারলে হয় — চোখ পলকহীন, কোথায় তার দৃষ্টি। যে পাখীকে অন্য সময় (তুড়ি দিয়ে) এমন করলে উড়ে যায়, এখন লেজ টেনে দিলেও নড়ে না। সমস্ত মনটা তার ডিমেতে।

বড় জিতেন — Somewhere (কোথাও) মন আছে তো! তা হলে তো হতো। আচ্ছা, মন somewhere or nowhere (কোথাও কিংবা কোথাও না)?

শ্রীম — এ বলবার যো নাই। এ কি ইউনিভারসিটির পড়া যে গড় গড় করে মুখস্থ বললেই হলো? এতে মুখস্থ চলে না। কতকগুলি মুখস্থ করে ছাড়া নয়। বেদে আছে, 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। (মুন্ডক ৩/২/৩)। ঠাকুর বলেছিলেন, 'যেমন বোবা স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু বলতে পারলো না। তেমনি এ বিষয় বলবার উপায় নাই। বলা যায় না।'

ঋষিরা ঈশ্বরদর্শন ক'রে আভাস মাত্র দিয়েছেন। বেদ যেন বোবার গোঙানি। ঐ সময় তাঁরা মন বুদ্ধি আদির location (স্থান) দেখেছিলেন। এই সবটাই মনের zone (এলাকা) — self-preservation instinct (দেহরক্ষার বৃত্তি) থেকে ব্রহ্মদর্শন পর্যন্ত। যোগ শাস্ত্রে আত্মদ্রষ্টাগণ মন বুদ্ধির কতক পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান মনোবিজ্ঞানীদের কাজ নয় এ সব তত্ত্ব নির্ণয় করা। তারা কেবল

মনের নিচের অংশটা দেখতেপায়। ঠাকুর বলেছিলেন, 'শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা এক'। এখানে মন মানে মনবুদ্ধি। শুধু মনকে ঋষিরা নির্দেশ করেছেন সংকল্প-বিকল্পাত্মক। মনের স্বভাব ঘোড়ার মত চঞ্চল বলেছেন। এটা করবো, না, এটা করবো না, ইহাই হলো মনের স্বভাব। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধি নিশ্চয় করে দেয়। হয়তো বললো, না, করবো না। বুদ্ধিও মনেরই উপরের অবস্থা।

এই মন বুদ্ধিকে ধরে ধরেই ব্রহ্মে পোঁছুতে হয়। অশুদ্ধ-মন, বিষয়াচ্ছন্ন মন প্রক্রিয়াতে শুদ্ধ হয়। তখন ঈশ্বর-কৃপায় আত্মদর্শন হয়।

মন somewhere or nowhere (কোথাও কি কোথাও নয়), এ বলবার আগে, এই বিশ্ব সৃষ্টি somewhere or nowhere (কোথাও কি কোথাও না) এর পরিচয় দরকার। (বড় জিতেনের প্রতি) বুঝতে পারলেন ব্যাপারটি কি গুরুতর? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আত্মদ্রষ্টা আচার্যরা নানা মতবাদের সৃষ্টি করেছেন। এমনতর কাণ্ড! ঈশ্বরকৃপায় ঈশ্বরকে যখন বুঝবেন মনকেও তখন বুঝবেন।

বড় জিতেন (স্বগতঃ) — ডুব দিয়ে না থাকলে আর উপায় নাই।

শ্রীম — কেশব সেন একটি 'সারমনে' বলেছিলেন, সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবে যাও। মনকে ডুবিয়ে রাখ ওখানে। ঠাকুর শুনে পরে বলেছিলেন, রহস্য করে, 'না গো না। অত না। ডুব মারলে ওদের (পরিবারদের) কি উপায় হবে; ওদের দেখবে কে?' (হাস্য)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যেখানে highest ideal-এর worship (ব্রহ্মবিলীনতা) সেখানে গুরুশিষ্য দেখা নাই। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্য দেখা নাই'। সব ভেদের বিলোপ। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেলে যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থা।

জার্মান ফিলজফার-কবি গ্যেটে (Goethe) বলেছিলেন, সেই blazing light-এর (জ্বলন্ত জ্যোতির) সামনে বেশীক্ষণ চাওয়া যায় না, মাথা নিচু হয়ে যায়, ইন্দ্রিয়শক্তির অন্তর্ধান হয়ে যায়।

Highest ideal worship (সমাধি লাভ) করলে ঐরূপ। এর

চাইতে নিচে থাকলে, একটু lower ideal worship করলে, সগুণ সাকার ভাবের উপাসনায় থাকলে, অন্য রকম হয়। ওতে চোখ ঝলসায় না। সূর্যের ও চন্দ্রের আলো যেমন।

বড় জিতেন — আচ্ছা, শিষ্য বলতে আপত্তি করছেন কেন? গুরুর কাজ তো সবই করছেন?

শ্রীম — গুরু-শিষ্য নেই সেখানে।

বড় জিতেন — তাই যদি হলো, তবে ঠাকুর ঐরূপ ঢলাঢলি করতেন কেন?

শ্রীম (বুঝিতে না পারিয়া) — কি বলছেন?

বড় জিতেন — না, ভক্তদের কারো মাথায় হাত, কারো মুখে হাত, কারো বুকে হাত, আবার কারো জিভে লিখে দেওয়া — এসব কেন করলেন ঠাকুর?

শ্রীম — তিনি কি মানুষ ভেবে ঐ করতেন? বলেছিলেন, 'যে দিন তোদের মানুষ বলে বুঝবো, সেই দিন থেকে তোদের মুখ দেখবো না।' বলতেন, 'আমি দেখছি, ঈশ্বরই এই সব হয়ে বিচরণ করছেন।'

শ্রীম উঠিয়া গিয়া ছাদের উত্তর দিকে পায়চারী করিতেছেন। যাইবার সময় নবাগত তিনজন ভক্তকে ডাকিয়া লইলেন — বীরেন, নূতন বিনয় ও প্রভাসের পিতাকে। শ্রীম চলিতে চলিতে তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। এ দিকে ভক্তদের বৈঠকে বড় জিতেনের মুখ খুলিয়াছে।

বড় জিতেন (অন্তেবাসীর প্রতি) — কি গো বাড়ীওয়ালী, কি করছো?

অন্তেবাসী (বিরক্ত হইয়া) — দিনরাত যা ভাবা যাচ্ছে তারই ঢেকুর উঠছে মুখে। অত ধর্ম কথা শুনলে কি হবে, গায়ের বটকা গন্ধ যে ছাড়ছে না।

ডাক্তার — এ সব অবিদ্যার কথা কেন বলা? তিনি তো বারণ করেছেন এ সব কথা বলতে, এ সব ভাষা প্রয়োগ করতে?

ছোট রমেশ — বলতে বলতে আবার ঐ ভাবনা হয়। না বলাই ভাল।

নবাগত ভক্ত তিনজন বিদায় লইলেন। যাইবার সময় তাঁহারা শ্রীমকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — জোড়হাতে নমস্কার করতে হয়। (পায়ে হাত দিয়া) কেন অত কষ্ট করেন? এতে আমাদের কষ্ট হয়।

শ্রীম স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আহারান্তে পুনরায় ছাদে আসিয়া নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

বড় জিতেন (অনুতপ্ত স্বরে) — আজ একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি। জগবন্ধুকে 'বাড়িওয়ালী' বলেছি। ইনি এখানকার আসর আগলে থাকেন বলেই এই কথা বলেছি। আমাদের সব খবর নেন এলে। এতে কি দোষ হ'ল?

শ্রীম — না-আ। তেমন আর কি? একটা কথা বৈ তো নয়! কত কথাই তো বলা হচ্ছে!

ঠাকুর কেশব সেনকে বলেছিলেন, 'ইষ্টিমার করে গিছলেন কিনা ঠাকুরকে দর্শন করতে, বিজয় গোস্বামীও আছেন। তখন দুই দলে খুব ঝগড়া — নববিধানে আর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে। বিজয় গোস্বামী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা। আর কেশববাবু নববিধানের লিডার। বলেছিলেন, 'দেখ, তোমাদের মধ্যে নাকি ঝগড়া? তা কেমন জান? মা-ও মঙ্গলবার করছে, মেয়েও মঙ্গলবার করছে। দুজনেই করছে, কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। কিনা, মেয়ের মঙ্গল। এক জনের মঙ্গলের জন্যই দুই জন মঙ্গলবার করছে — কিন্তু ঝগড়া ক'রে। তেমনি তোমাদের ঝগড়া। এ ঝগড়া যা, তা কেবল মঙ্গলের জন্য। বস্তুতঃ ঝগড়া নেই!'

আহা, কি charitable view (উদার দৃষ্টি) দিয়ে গেছেন, অন্য লোক কি তা দিতে পারে?

কাল একটি ভক্ত এসেছিলেন, বৃদ্ধ ভক্ত। খুব ভাল লোক। রাখাল মহারাজের ভালবাসা পেয়েছেন। রাখাল মহারাজের কথায়

বললেন, তিনি বলেছিলেন, 'শরীরটা যতদিন রয়েছে ততদিন তাঁর নাম করে নেওয়া যাক'। আহা কি কথা! শরীর তো থাকবে না, তাই যতদিন আছে নাম করা উচিত।

আর বলেছিলেন, ও একটু নাম ভালবাসে, তাই তাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করে দেওয়া যাক্। দেখ, সাধুর কি উদার দৃষ্টি! অন্য লোক ঘৃণা করে আর উনি — যে যা চায় তাকে তা দিয়ে তুষ্ট। এ উদার দৃষ্টি ঠাকুরের অবদান।

আপনারা এটি ভাবতে ভাবতে বাড়ি যান।

সভা ভঙ্গ হইল রাত্রি দশটায়।

২

আজ পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি। অপরাহ্নে একজন সাধু আসিয়াছেন জয়রামবাটি হইতে। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন। জয়রামবাটি ও কামারপুকুরের অধিবাসীগণের সকল সংবাদ লইতেছেন — চিনে শাঁখারীর বাড়িটার কি হলো? ধনী মায়ের ভিটাতে কোন মন্দির হল কি? কামারপুকুরের পঙ্কোদ্ধারের কাজ কিছু অগ্রসর হল কি? মামাদের বাড়ির লোকজন কেমন আছেন, ঠাকুরের স্বহস্তে রোপিত আম গাছটি কেমন — ইত্যাদি সংবাদ খুঁটিয়া খুঁটিয়া লইতেছেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। শ্রীম ছাদে আসিয়া বসিয়াছেন। ধ্যান করিতেছেন। ভক্তগণ কেহ কেহ কাছে রহিয়াছেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। মাঝে মাঝে শুভ্র মেঘ আসিয়া ঢাকিয়া ফেলিতেছে — যেন লুকোচুরি খেলিতেছে। কয়দিন পর আজ আকাশ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল।

অভয়বাবু আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বয়স সাতষট্টি। ইনি বৃন্দাবনের কাঠিয়া বাবার শিষ্য। ইনি সাধুসন্তের বিভূতির কথা কহিতে ভালবাসেন। প্রায়ই ঐ কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু আজ আসিয়া বলিলেন, দ্বারকাদাস বাবাজী দেহ রেখেছেন। আপনাকে এই সংবাদ দিতে এলাম। দ্বারকাদাস বাবাজী শ্রীম-র

স্কুলের একজন শিক্ষক। ইদানীং অসুস্থ হইয়া মানিকতলার একটা বাগানে থাকিতেন। শ্রীম ভক্তপ্রবর কার্ত্তিক ডাক্তারকে তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত করেন। আর ঔষধ, পথ্য ও সেবার ব্যবস্থা করেন। শ্রীম ইতিপূর্বেই দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়াছেন, তাই দুঃখিত হইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — সাধুর শরীর গেলে কে কাঁদবে? অপর লোকের হলে কত শোক, কত কান্নাকাটা! কিন্তু সাধুরাই ঠিক পথ ধরেছেন। তাঁরাই আমাদের আদর্শ। তাঁদের সব right (ঠিক) ঘড়ি। সংসারে যারা আছে তাদের ঘড়ি wrong (ভুল)। সাধুরা ভগবানকে চায়, আর কিছু চায় না — no compromise. সংসারে যারা রয়েছে তাদের compromise ক'রে (মিলেমিশে) থাকতে হয়। তবে দু'একজন তিনি আদর্শ সংসারী করেন। তারা কিছুই নেবে না। সব করে যায় সংসারের, কিন্তু benefit (লাভ) নেবে না। যেমন দাসী বড় ঘরের।

অভয়বাবু — আচ্ছা, স্বামীজীরা অত তপস্যা করলেন কেন? নিরবলম্বন হয়ে অনাহারে অনিদ্রায় কত কষ্ট পেয়েছেন। ঠাকুর তো তাঁদের সব পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তবুও কেন অত তপস্যা?

শ্রীম — তপস্যা করলে খেদ মিটে। তাই তপস্যা করতে হয়। তখন মনে হয় — আমি তাঁর জন্য কিছু করেছি। তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়। তবুও একটু চেষ্টা করার দরকার। তখন মনে হয় — আমি কিছু করলাম ভগবানের জন্য। তিনি যে অত করে রেখেছেন আমাদের জন্য — জন্মাবার পূর্বে মার স্তনে দুধ পর্যন্ত করে রেখেছেন, তাঁর জন্য আমরা করলাম কি?

তিনি এর জন্য লালায়িত নন। আমাদের করা না করার প্রত্যাশা নাই তাঁর। কিন্তু যে কিছু তপস্যা করে তাঁর জন্য, তার নিজের মনের খেদ মিটে। মানুষের মন 'give and take' (লেনদেন) নীতিতে বদ্ধ। এই বন্ধন থেকে মুক্তি হয় কিছু করলে। তখন মন শান্ত হয়। তখন মনে নির্ভরতা আসে। মনে হয়, যতটা শক্তি আমায় দিয়েছেন,

তার ব্যবহার করেছি। তবুও তাঁকে পাচ্ছি না। এখন তাঁর ইচ্ছা। এই বলে শরণাগত হয়ে পড়ে থাকে। মাস্তুলে বসা পাখীর অবস্থা তখন।

স্বামীজীদের তপস্যা লোকশিক্ষার জন্যও। ওঁরা করেছিলেন বলে এখনও অপর লোক করছে। তিনি ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাঙ্গেন, মাছের তেলে মাছ ভাজেন।

আবার আছে, ঈশ্বরদর্শনের পর মুচুকন্দ রাজা তপস্যা করেছিলেন, মনস্থির করার জন্য। ঈশ্বরদর্শন হলেও মন চঞ্চল ছিল। তাই আদেশ হ'ল তপস্যা কর। মনের স্বভাবই ঐ চঞ্চলতা। এ দূর হয় তপস্যা করলে।

তোতাপুরী রোজ ধ্যান করেন অনেকক্ষণ। ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ধ্যান কেন করছ'? তিনি উত্তর করলেন, 'লোটা না মাজলে ময়লা পড়ে, তাই রোজ মাজতে হয়'। ঠাকুর বললেন, 'সোনার লোটা মাজতে হয় না'। কিন্তু ক'জনের লোটা সোনার হয়? ঠাকুরের সব সোনার, তিনি পরমপুরুষ, অবতার।

মা ঠাকরুণ একজন সাধুকে বলেছিলেন, শেষ সময় ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন — ঘরের ছেলে ঘরে যাবে। কিন্তু যদি জীবিতাবস্থায় শান্তি চাও তবে সর্বদা তপস্যা কর, তাঁর চিন্তা কর!

আর এক কথা। তপস্যা করলে তাঁর কৃপা হয়। তাঁর কৃপা অবশ্য কোনও condition-এর (নিয়মের) অধীন নয়। কিন্তু যাঁরা তাঁকে দর্শন করেছেন, তাঁদের অধিকাংশ লোকই তপস্যা করতে করতে চিত্তশুদ্ধ হওয়ার পর তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন করেছেন। তাই তপস্যা করা এই জেনে যে, তিনি তপস্যার বশীভূত নন। তিনি স্বতন্ত্র, তিনি মহান, তিনি ইচ্ছাময়।

আর যে পথ নেই! কি করা যায় — বসে বসে তাঁর নাম নাও, প্রার্থনা কর, কাঁদ। এরই নাম তপস্যা! তা কি আবার সারা জীবন করতে হবে তপস্যা? তা নয়। মাঝি কি সর্বদা নাও বায়? না, তা নয়। যখন তরঙ্গ থাকে, হাওয়ার খুব জোর, তুফান চলে, তখন উঠে পড়ে নৌকা চালায়। আবার খানিক পর সব ঠাণ্ডা। তখন তামাক

খায় আর গান গায়। বৈঠা তখন বগল তলায়। অনুকূল স্রোতে নৌকো আপনি চলছে। আবার পাল তুলে দেয়। এখন পরিশ্রম নাই, আরাম খালি। এখন কেবল আনন্দ, আনন্দ, শুদ্ধ-আনন্দ। তেমনি তপস্যা বরাবর করতে হয় না। তুফানটা কাটিয়ে দেওয়া, এই আর কি!

অভয়বাবু — আহা কি কথা! একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আর কি। (শ্রীম-র দিকে অগ্রসর হইয়া) দিন পায়ের ধুলো দিন। কবে ফস্ করে চলে যান্, কিংবা আমি চলে যাই!

আপনার ঐ কথাটি যেন প্রাণে গেঁথে রয়েছে! সিটি কলেজের কোণে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন। এই ইনিও (অন্তেবাসী) সঙ্গে ছিলেন। বলেছিলেন, 'জল ঘোলা করো না, ছাপ পড়বে না — সাধুকে ঘেঁটো না উপর উপর দেখবে।

শ্রীম — ঠাকুর তাই বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন, 'কুল খেতে এসেছ কুল খাও। তোমার অত শত খবরে কাজ কি? মুখ বাড়িয়ে কুলটি তুলে খেয়ে ফেল। বেশী করতে গেলে কাঁটার ঘা লাগবে, রক্ত বেরবে, বেদনা হবে।'

ঠগ বাছলে গাঁ উজাড়। দোষে গুণে মানুষ। গুণটি নিতে বলেছিলেন। ড্যাঙ্গা থেকে হাতে জল তুলে মুখ বাড়িয়ে জল খাও। নামলেই কাদা বেরবে। এই ভাবটা নিয়ে সাধুসঙ্গ করতে হয়। তাহলে আর ভয় থাকে না। তা না হলে অনেক সময় উল্টা উৎপত্তি হয়।

শুধু কি বলেছেন সাধুসঙ্গের কথা, সাধু আবার তৈরী করে গেছেন! তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের তিনি পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তবুও তাঁরা কত সাধনভজন করেছেন সারাজীবন। কেন এঁদের এ দিয়ে সব তপস্যা করালেন? লোকশিক্ষার জন্য। অপর লোকও করবে তাঁদের তপস্যা দেখে।

আহা, মঠের সাধুদের কি বৈরাগ্য! বরানগর মঠে দেখতুম, শুধু কৌপীন পরে রয়েছে। আর সারাদিন কেবল ধ্যান জপ চলছে। শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, আহারে মন নাই। আহার সব দিন জুটতো

না। সকলের জন্য একখানা বর্হিবাস ও একখণ্ড উত্তরীয় বস্ত্র ছিল। সত্যিকার 'কমনওয়েলথ' ছিল ঐ মঠটি।

পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন ঠাকুর — সাকার নিরাকার সব দর্শন করিয়ে দিয়েছিলেন। তবুও কেন এই কঠোর তপস্যা? লোকশিক্ষা ছাড়াও তার আর একটা মানে আছে। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে, বাহ্য ব্যবহারেও ঐ পূর্ণতাকে হাতে আনার অভ্যাসের জন্য, ঐ তপস্যা। একদিন ঈশ্বরদর্শন করলেই হলো না। এঁরা অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। এঁদের আগমনই হচ্ছে লোকশিক্ষার জন্য। এঁরা জগতের লোকের সংস্পর্শে এসে তাদের শিক্ষা দিবে। এই লোক ব্যবহারের সময়ও ঐ পরিপূর্ণতা, বা ব্রহ্মদর্শন কাজে আনতে হবে। বসে বসে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' চিন্তা করলে হবে না। ব্রহ্মরূপী 'সর্বং'কে, সর্ব জীবকে ব্রহ্মবৎ পুজো অর্চ্চনা করতে হবে। এরই জন্য তাঁদের ঐ কঠোর তপস্যা, নইলে কি দরকার তপস্যার তাঁদের! তপস্যার যা মুখ্য উদ্দেশ্য, তা তো বিনা চেষ্টায়ই ঠাকুরের কৃপায় লাভ হয়ে আছে।

তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে, তপস্যা চাই প্রথম প্রথম। তারপর আনন্দ উপভোগ করা। আর সেই আনন্দের ভাগী করা লোকদের। সাধুর এই কাজ। নিজে আনন্দলাভ করে সকলকে সেই আনন্দ বেটে দেওয়া, এই দ্বিবিধ কাজ সাধুরা করেন। এই দিক দিয়ে সাধু ভারতীয় সমাজের অবিচ্ছেদ্য শ্রেষ্ঠ অংশ।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১৬ই জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ ৩২শে আষাঢ়, ১৩৩১ সাল।
বুধবার পূর্ণিমা ৬২।৪ পল।

চতুর্দশ অধ্যায়

সুখও আমার নয় দুঃখও আমার নয়

১

অপরাহ্ন পাঁচটা। মর্টন স্কুলের ছাদ। দক্ষিণ প্রান্তে টিনের ঘর। তার সামনে ছাদে মাদুর পাতা আছে। অন্তেবাসী বসিয়া বালিশ সেলাই করিতেছেন। পাশে বসিয়া আছেন শান্তি। অন্তেবাসী থাকেন ঐ টিনের ঘরে। ছাদের উত্তর দিকে শ্রীম-র তৃতীয় পৌত্র তোতা ঘুড়ি উড়াইতেছে। তাহার বয়স বছর দশেক।

আজ ১৭ই জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ। ১লা শ্রাবণ ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ, ২৭ দণ্ড।

শ্রীম পার্শ্ববর্তী চারতলার নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া টিনের ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্তদের বালিশ সেলাই দেখিয়া শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — হাঁ, হাঁ, সেলাই করুন, সেলাই করুন। আরও কি একটা আছে? হাঁ, A stitch in time saves nine.

এই ভাবেই নিজের মনটিও repair (সংস্কার) করা। ধৈর্য ধরে করে যাওয়া। এই নিয়ম। একটু খারাপ হলো, অমনি mend (পুনঃ সংস্কার) করা — অনলস হয়ে অর্থাৎ অতন্দ্রিত হয়ে অর্থাৎ নিদ্রা বিশ্রাম ছেড়ে দিয়ে।

উঠে পড়ে লাগতে হয়। তা'তে হয়। এই যে proverb-টি উপদিষ্ট, এর significance (অর্থ) হলো এই — যখনকার যে কাজটি তখনই সেটি করা। এক নিমেষও ফেলে না রাখা। এ করলে পরিশ্রম কমে যায়। তার ফলে অবসর মিলে। তখন ঈশ্বরের চিন্তা

করা যায়। তা হলে আনন্দ ও শান্তিলাভ হয়। নইলে খাটুনি বেড়ে যায় পরে। তখন খেটে খেটে হয়রান হয় লোক। অবসর নাই তখন।

‘ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত’ (গীতা ১৮/২৬) হওয়া চাই। এটি গীতার কথা, সত্ত্বগুণীর লক্ষণ। সত্ত্বগুণী মানে ভগবানে নিমগ্ন। মন অনেকটা ফর্সা হয়ে এসেছে। এবার সূর্য উঠবে। Like a soldier in the battle-field always ready with bayonet fixed on a gun, সত্ত্বগুণী যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক — সঙ্গীন্ চড়িয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীম কথা কহিতেছেন আর এক একবার তোতার ঘুড়ি উড়ান দেখিতেছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এর আর অন্য কোনও দিকে মন নেই। ঐ এক দিক। যার এ-দিকে (মনোযোগ) হয় তার ও-দিকেও হয়। মোড় ফিরিয়ে দিলেই হলো। তবে আনন্দ চাই। আনন্দ না হলে যোগ হয় না! বিষয়ীর কত মনোযোগ বিষয়ে! কত অসুবিধা, কত অনাহার, অনিদ্রা, ঝামেলা আসছে যাচ্ছে, তবুও বিষয়ে লগ্ন তার মন। কি করে এ সব কাটাচ্ছে? মনে আনন্দ আছে তাই কাটাতে পারছে। কি আনন্দ? না, এ বিষয় দিয়ে ভাল খাওয়া পরা চলবে, নামযশ হবে, ছেলেপুলেদের খাওয়াবে। এই সব আনন্দ। এ সব বিষয়ানন্দ। সাধু ভগবানকে ডাকছে, ধ্যান করছে, তাতে তার আনন্দ। যত গভীর ধ্যান হবে ততই ব্রহ্মানন্দের অধিক স্পর্শ লাভ করবে। তাতে ভরসা হয় আর আনন্দ দিন দিন বাড়তে থাকে। সেই আনন্দের টানে নিচেকার আনন্দ আপনি ছেড়ে যায়। তা নইলে কি জোর করে ছাড়বার উপায় আছে বিষয়ানন্দ? এক-টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া কেউ ছাড়তে চায় না। আর বাপ মা ভাই বোন, ঘর, ধন, নিজের জীবন এসব ছেড়ে দেওয়া কি চারটিখানি কথা?

ঈশ্বর হলেন পরম ধন, অমূল্য তাঁর দাম। সেই পরম ধনের সন্ধান পায় ধ্যানে। তখন ‘ঝোলাগুড়ের সরবৎ’ আপনি ফেলে দেয় — ‘মিছরির সরবৎ’ পেয়েছে যে!

কারও কোন বিষয়ে একাগ্রতা দেখলে তার দিকে নজর দিতেন ঠাকুর। মোড় ফিরিয়ে দিলেই হলো। তিনি তো এসেছেনই এইজন্য — জীবের কল্যাণের জন্য। তাই তাঁর দৃষ্টি ছিল সর্বদা ব্রহ্মমুখীন। মানুষের দৃষ্টি বহির্মুখীন।

বড়বাজারে ঠাকুর গিছলেন। দেখতে পেলেন একটি লোক গৃহ-ভিত্তির ভিতর একটি ছোট্ট 'সেলে' বসে দোকান করছে। সেই 'সেলে' চন্দ্র সূর্য পবনের প্রবেশ নিষেধ। লোকটি কলকে-টলকে বেচছে। আমাদের কিন্তু সেদিকে তত নজর ছিল না। তিনি পরে বললেন, 'দেখ পয়সার জন্য কি কঠোর তপস্যা, কি একাগ্রতা'। এইটেই ফিরিয়ে দেওয়া ঈশ্বরের দিকে। এ দৃষ্টি কার আছে, কে দেখে এই ভাব নিয়ে?

এখন সন্ধ্যা সাতটা। ভক্তরা ছাদে বেঞ্চেতে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন — মোটা সুধীর, বড় অমুল্য, শচী, শান্তি, ভৌমিক, ছোট রমেশ, বড় জিতেন, জগবন্ধু প্রভৃতি। শ্রীম নিজ কক্ষে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর ছাদে আসিলেন। ভক্তগণ সকলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীম চেয়ারে বসিয়াছেন দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ দুইদিকে বেঞ্চেতে বসা। কথোপকথন হইতেছে।

শ্রীম (সকলের প্রতি সহাস্যে) — আহা, আপনারা ধ্যান ভঙ্গ করলেন? ধ্যান করুন, ধ্যান করুন। ব্রাহ্মসমাজে সব প্রোগ্রাম করে কাজ হয়। তিনটা থেকে সাড়ে তিনটা, ধ্যান। সাড়ে তিনটা থেকে চারটা, নৃত্য। যেই ঘন্টা বাজলো অমনি ধ্যানে বসে গেল। আবার ঘন্টা বাজলো অমনি ধ্যান ভঙ্গ হলো। তেমনি নৃত্য ঘন্টায় আরম্ভ, আবার ঘন্টায় শেষ। আচ্ছা, ধ্যান, নৃত্য কি এতই হালকা বস্তু যে ঘন্টার সঙ্গে হয়ে যাবে?

বিদ্যেসাগর মশায় বেশ বলেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে মেয়েমানুষ এমন জায়গায় বসে যে, সেখান থেকে young man-দের (যুবকদের) দেখা যায়। ছেলেরা কেউ বা ফুল, কেউ বা handkerchief (রুমাল) ছুঁড়ে মারতো মেয়েদের উপর। তাই কেহ

কেহ গার্ড দিতো। একদিন ছেলেদের কি বলায় এমন মার দিল একজনকে, একেবারে black and blue (গায়ে কাল দাগ পড়ে গেল)। চণ্ডীবাবু ছিল তার নাম, বিদ্যেসাগর মশায়ের ভক্ত। ইনি তো ওঁর life লিখেছেন। বিদ্যেসাগর মশায় শুনে একটু ব্যস্ত হয়ে পরদিন তাঁকে দেখতে গেলেন। চণ্ডীবাবু শুয়ে আছেন। বিদ্যেসাগর মশায় তাঁকে তামাক সেজে খাওয়াচ্ছেন। ওঁর কাছে গেলেও উনি সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়ে, পান তামাক সেজে খাওয়াতেন। খুব সেবা করতেন। চণ্ডীবাবু তামাক খাচ্ছেন — গুড়ুর গুড়ুর। বিদ্যেসাগর মশায় তখন জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁগা, তোমায় নাকি খুব প্রহার করেছে ছেলেরা? তা, কেমন তোমাদের চাল বুঝতে পারছি না। বাপ-পিতামহদের দেখেছি, নির্জনে দরজা বন্ধ করে ঈশ্বরের ধ্যান-চিন্তা করতেন। আর তোমরা এখন সকলে এক সঙ্গে বসে ধ্যান করতে আরম্ভ করেছ। কিন্তু মেয়েমানুষ আবার ঢুকালে কেন? (সকলের হাস্য) বিদ্যেসাগর মশায়ের খুব strong commonsense (প্রখর কাণ্ডজ্ঞান) ছিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — তাই ধ্যান করতে হয়। ধ্যান ভাঙ্গতে নেই। ধ্যানে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যায়। ধ্যান করুন, ধ্যান করুন (হাস্য)।

বড় অমূল্য — ধ্যান করতে পারছি কোথায়? মন বসে না, তার উপর আবার ঘুম এসে যায়।

শ্রীম — মন কি আর এক দিনে বসে? অভ্যাস করতে হয় — 'অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়' (গীতা ১২/৯)। শ্রীকৃষ্ণ মনের কর্তা কিনা, তাই কি করে মনকে বশ করতে হয় তা জানেন। তাই অর্জুনকে অভ্যাস করতে বললেন। আর বৈরাগ্য করতে বলেছিলেন। মানে ঈশ্বরই অনন্তকাল থাকবেন, সংসার দু'দিনের জন্য। শরীর থাকবে না, একথা ভাবতে হয়। এসব অভ্যাস ও বৈরাগ্য করলে মন ক্রমশঃ ঈশ্বরেতে লগ্ন হয়ে যায়। তখনই মন বশীভূত হয়ে যায়। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই', ধ্যানের শেষ এটি। এক হয়ে যায় সব।

ঘুম আসে আসুক, তবুও অভ্যাস করতে হয়। আর নিদ্রাকেও ভাবনা দিয়ে sublimate (ঈশ্বর রূপায়ণ) করে ফেলতে হয়। 'যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা' — চণ্ডীতে আছে।

শ্রীম — আজ খাওয়ার সময় ভাবলুম, তিনি এতসব করে দিয়েছেন, তবুও লোকের চৈতন্য হয় না, বিশ্বাস হয় না। কি আশ্চর্য! দেখুন না, যার যে আহার সেটি আগে থেকেই করে রেখেছেন। কারো জন্য চাল, কারো জন্য গম, যব। আবার স্কট্‌লণ্ডের লোকের জন্য ওটমিল। জন্মের পূর্বেই সব করে রেখেছেন। জন্মলাভ করেই খাবে বলে। আবার দেখুন না শক্ত খাবারের জন্য দাঁত হয়েছে। যেমন মশলা পেষা হামানদিস্তায়। আবার হজমের জন্য 'সেলাইবা' (লালা)।

২

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। আবার কথা প্রসঙ্গ চলিতেছে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ওদের (উত্তরের) বাড়ির এক তলার ছাদে বৃষ্টির জল জমে আছে। বিকালে এখানে দাঁড়িয়ে দেখছি কাক, পায়রা, শালিক এরা সব ঐ জলে নেমে স্নান করছে। তাই ভাবলুম, দেখ ঈশ্বর এত করে রেখেছেন তবুও লোকের বিশ্বাস হয় না।

একদিন সকালে গোলদিঘিতে বসে আছি। দেখলুম, কাকটাক পাখীগুলি স্নান করছে। ভাবতে লাগলুম, ও-ও, সবই আগে থেকেই করে রেখেছেন তিনি। এমন যে তুচ্ছ জীব পাখী তাদের জন্যও সব জোগাড় করা রয়েছে। তবুও কি মানুষের বিশ্বাস হয়?

বড় অমূল্য — এ কি আমরা বিশ্বাস করতে পারি — হয় কৈ বিশ্বাস?

শ্রীম (ধমকের সহিত) — কয় দিন ভেবেছেন আপনি বলুন তো? কি চেষ্টা করেছেন বিশ্বাস করবার জন্য? এ কি এ বই ও বইয়ের পাতা উল্টানোর কাজ! ফ্যাসান আর কি! যেমন এই দীক্ষা নেওয়া ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকলেই নেয় আমিও নিলুম।

একি ঢং!

প্রথম চাই গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি। যার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তার গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি হয় কি করে? যার গুরুতে বিশ্বাস হয়েছে তার ঈশ্বরেতেও বিশ্বাস আছে। তখন গুরু যে মহামন্ত্রটি বলে দিয়েছেন সেটিকে ফোটাবার জন্য নির্জনে গোপনে বসে চেষ্টা করলে অঙ্কুরিত হবে সে বীজটি। সেই থেকে বৃক্ষ ফল ফুলে সুশোভিত হবে। কিছুই করবো না, ফ্যাসান করে দীক্ষা নিয়ে বলা হচ্ছে, কৈ কিছুই হলো না। দেখাদেখি নিলে কাজ হয় না।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — নির্জনে কেউ যেতে চায় না। যাদের অনেক privilege leave (ছুটি) পাওনা আছে তারাও যেতে চায় না। মাইনেও পাওয়া যাবে। তবুও ছুটি নেবে না। কেন? আ—রা—ম চায়, আরাম (হাস্য)। মহা মুস্কিল। খালি মিন্‌মিন্‌ পিন্‌পিন্‌ করবে বসে বসে — নড়তে চায় না।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — পুরুষকার চাই — মরণ পণ করা পুরুষকার, তবে হয়। পুরুষকারও ঈশ্বরেরই একটি রূপ — 'পৌরুষং নৃষু', গীতার কথা (৭/৮)। কয়েক হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষকারব্যঞ্জক আর একটি কথা বলেছিলেন — ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ' (গীতা ২/৩)। তারও কয়েক হাজার বছর পূর্বে ঋষিরা বলেছিলেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত' (কঠো ১/৩/১৪)। শাস্ত্রে সর্বত্র এই পুরুষকারের কথা রয়েছে।

ঠাকুরও বলেছিলেন একজন ভক্তকে, ওকি, এমন করে (গালে হাত দিয়ে) কেন বসেছ। ছি, এই করে কি ভগবান দর্শন হয়? 'কোমর বাঁধ, মনে বল আন।' তাই পুরুষকার চাই। লেদারুর মত চললে হবে না।

বড় জিতেন — কি?

শ্রীম — লেদারু! লেদারু! যার পুরুষকার নাই। বুঝতে হবে তার এই জন্মে এই পর্যন্তই। এর বেশি নয়। এখন থাক বসে। (আস্তে আস্তে) একজন বলেছিল, যা শালা পাদতে পাদতে যা (সকলের

উচ্চহাস্য)।

বড় অমূল্য — নির্জনে যাওয়ার কতকগুলি adverse circumstances (প্রতিকূল অবস্থা) এসে পড়ে।

শ্রীম — যে যায়, সে কি আর নিজের জোরে যাচ্ছে? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। তিনি যে আপনার জন! ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বর আমাদের আপনার বাপ, আপনার মা। তাঁর কাছে জোর চলে। জোর করে বলতে হয়, পিতা, এ সংসার-তরঙ্গের ভিতর দিয়ে আমাকে চালিয়ে নাও। তুমি না চালালে কে আমায় চালাবে? তুমি ছাড়া যে আমার কেউ নাই সংসারে! বাবা, তোমাকে চালাতেই হবে।

আমরা তাঁর আর কতটা জানি? তাঁর অনন্ত শক্তি। তিনি ইচ্ছা করলে কি না হতে পারে! মানুষের জ্ঞান কতটুকু? দেখুন, এক চোখেতেই কত রকম শক্তির প্রকাশ হয়! খালি চোখে এক রকম দেখে। চশমা দিয়ে আর এক রকম। টেলিস্কোপ দিয়ে আর এক রকম। আবার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আর এক রকম দেখা যায়।

তিনি ইচ্ছা করলে আরও কত কিছু করতে পারেন। It is a possible imagination (এটা সম্ভবপর কল্পনা)। একটা ইন্দ্রিয়েই এতদূর। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটা। এতে আরও বেশী (শক্তি)। আবার তিনি ইচ্ছা করলে দশটা পনেরটা ইন্দ্রিয়ও করতে পারেন।

আবার একটা ইন্দ্রিয় কম হলে কম পড়ে information (বিষয় জ্ঞান)। Rule of three (ত্রৈরাশিক) কষ না! ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — বলতো ঐ চৌপদ দুটি — শেলির (Shelly-এর) 'স্কাইলার্ক'-এর (চাতকের)।

শচী (কোনও রকমে) — 'We see before and after' (আমরা অগ্রপশ্চাৎ দেখিয়া চলি)।

শ্রীম — বার বার পড়তে হয়। তবে তাড়াতাড়ি বলা যায়।

শ্রীম (স্বগতঃ) — 'স্কাইলার্ক, দি স্কোর্নার অব দি আর্থ' (হে চাতক, তুমি পৃথিবীর কিছুই নেবে না)। (ভক্তদের প্রতি) যে ব্রহ্মানন্দ

উপভোগ করছে সে কি আর বিষয়ানন্দ নেয়? পরমব্রহ্মের সঙ্গে যোগ হয়ে আছে। এ দিকে ফিরেও চায় না। আহা, এ সব poem (কবিতা) কি উচ্চভাবের ব্যঞ্জক! একটা idea (আদর্শ) মানুষকে দিবেন কিনা! তাই স্কাইলার্কের (চাতকের) ভিতর দিয়ে দিচ্ছেন।

যে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে তার সুখ দুঃখ নাই। এই বিষয় দ্বারা কৃত সুখ দুঃখের পরে ব্রহ্মসুখ। ব্রহ্মানন্দে সব একাকার। গঙ্গার জল খালের জল এক। সাধারণ লোকের চেয়ে একবারে উল্টো পথ।

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — টনি সাহেব (Mr. Tawney) আমাদের পড়াতেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তারপর বিলেত চলে যান। তখনও আমাদের সঙ্গে correspondence (পত্রালাপ) ছিল। আমরা একবার লিখেছিলাম সমাধির কথা। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কি একটা poem (কবিতা) আছে — হাঁ, মনে পড়ছে — 'Serene Mood' (প্রশান্ত ভাব)। ওতে আছে ঐ সমাধির কথা। তা তিনি উত্তরে লিখেছিলেন, হাঁ তোমার কথায় এতদিনে আমি বুঝতে পেরেছি যে ঐটা সমাধির কথা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কি করে বুঝবেন বল। ওঁদের education (শিক্ষা) হলো materialistic (ভোগপ্রধান)। ও দেশে দু'চারজন এমনতর কবি হয়েছেন। এ দেশে তার অন্ত নাই।

বড় জিতেন — ওয়ার্ডসওয়ার্থের এ সব ভাব ছিল?

শ্রীম — হাঁ, উনি ঐ ভাবেই থাকতেন কিনা!

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — ওদের ড্রামাগুলি দেখ না — সবগুলিতে ‘লভ’ (স্ত্রীপুরুষের প্রেম) ঢুকিয়ে দিয়েছে। এ দেশে এ-ও আছে, আবার highest ideal-এর (ঈশ্বরের সঙ্গে) touchও (সম্পর্ক) রয়েছে। শেক্সপীয়রের ড্রামা সকলে নিতে পারলো না — যোগীরা নিলেন না। কিন্তু এ দেশের কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব’, ‘রঘুবংশ’, ‘শকুন্তলা’, ভবভূতির ‘উত্তর রামচরিত’ — এসব অদ্বিতীয় ড্রামা। এসবে highest ideal-এর (ঈশ্বরের) সঙ্গে touch (সম্পর্ক) রেখে তবে অন্য কথা বলেছেন। রামায়ণ, মহাভারত যাঁরা লিখেছেন

তাঁদের knowledge (জ্ঞান) ছিল encyclopaedic (বিশ্বব্যাপী)।

কি hypnotism (যাদু, মোহ) ঢুকেছিল এ দেশের লোকের ভিতর, ইংরেজদের এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে! এ দেশের ঐ সব অমর poems (কাব্য) কেউ ছুঁতো না। ইংরেজদের সব ভাল! তাই তাদের সব অনুকরণ করতে লাগলো। ওদের পোষাক হ্যাট-কোট, ওদের খানা লাঞ্চ-ডিনার, ওদের poetry (কবিতা) শেক্সপীয়র মিল্টন — সব ভাল। এ সব অনুকরণ করতে হবে।

কিন্তু ঠাকুর এসে এ সব উল্টে দিলেন। ঠাকুর নিজের জীবনে এ দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি মূর্তিমান করলেন। ভারতের অতুল সম্পদ আত্মজ্ঞান। নিজে তাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নানা ভাবে নিজের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের তাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এঁরা প্রায় সকলেই ইংরেজ ঘেঁষা, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত। এঁদের ধরে এনে নিজের ঘরে ঢুকালেন। তাঁর কৃপায় তাঁরা আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলেন।

তিনি তাঁদের বললেন, ‘শান্তি সুখের পথ ভোগে নয়, ত্যাগে। ব্রহ্মজ্ঞানে। সংসারে থাক, কিন্তু ঈশ্বরকে একহাতে ধরে রাখ, অন্য হাতে সংসার কর, নইলে দিশেহারা হয়ে যাবে।’ এমনি প্রভাব তাঁর মহামায়ার। সব উল্টো করে ধরে — সত্যকে মিথ্যে বলে দেখায়, আর মিথ্যাকে সত্য বলে দেখায়।

শুধু কি বললেন, তা নয়। নিজ জীবনে সব দেখিয়ে দিলেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে। তখন materialism (জড়বাদ) এসেছিল শিক্ষার সঙ্গে। যে-ই ইংরাজী শিক্ষা লাভ করতো সে-ই sceptic (ধর্মে উদাসীন), or atheist (অথবা নাস্তিক) হয়ে যেতো। এই সব লোকই তাঁর কাছে গিয়ে সর্বদা সমাধি দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল। তিনি ভগবানের সঙ্গে কথা কইতেন একঘর লোকের সামনে। কত পরীক্ষা করে তবে তাঁকে নিলে Young Bengal (বাংলার যুবক সম্প্রদায়)! বিবেকানন্দ তাঁর জীবনবেদ নিয়ে গিয়ে প্রচার করলেন ও দেশে। ওরা যখন মানতে লাগলো ঠাকুরকে, তখন এ দেশের মোহগ্রস্ত লোক বুঝলে— এ দেশেও অমূল্য রত্ন আছে।

নিজেদের সংস্কৃতির দিকে তখন দৃষ্টি ফিরলো।

এমনি খেলা ভগবানের — যে ব্যক্তি বলেছিল, 'Away with idolatry' (ছুঁড়ে ফেলে দাও মূর্তিপূজা), সেই ব্যক্তিই ঠাকুরের কাছে শিখে ‘সারমন’ দিল — ‘মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ীর পূজা’।

শ্রীম উঠিয়া গিয়া ছাদের উত্তর প্রান্তে দাঁড়াইয়া মর্টন স্কুলের ছাত্র প্রভাসের পিতার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। খানিক পর পুনরায় আসিয়া নিজের আসনে বসিলেন।

বড় জিতেন — বড় ডুবে গেছি সংসারে।

শ্রীম (কল্পিত বিস্ময়ে) — আবার ‘আমি’! (রহস্য করিয়া) kindly (দয়া করিয়া) একবার বলুন — সুখও আমার নয়, দুঃখও আমার নয়।

রাত্রি নয়টা। ‘কথামৃত’ পাঠ হইতেছে। শান্তি পড়িতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে অসুস্থ। হীরানন্দ আসিয়াছেন তাঁহাকে দর্শন করিতে সুদূর সিন্ধুদেশ হইতে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কোথায় ঘর, সিন্ধুদেশ — বার শ’ মাইল দূরে। সেখান থেকে হীরানন্দ এসেছেন ঠাকুরকে দেখতে। তা আসবেন না — কত প্রেম ঢেলেছেন ঠাকুর! তা কি ভুলতে পারে মানুষ! তাঁর সংস্কার ছিল, তাই ঠাকুরের সঙ্গে মিলন হলো, তাঁর কৃপালাভ করলো। জন্ম ও-দেশে, কিন্তু লেখাপড়া শিখতে এলো কলকাতায়। তাতেই ঠাকুরের সঙ্গে মিলন হলো। পূর্ব জন্মের শুভ সংস্কার ছিল। ঠাকুর বলেছিলেন, ‘যারা আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তাদের এখানে আসতে হবে’। এই তার প্রমাণ। হীরানন্দের ভিতর দিয়ে ঠাকুরের উদার ভাব ও-দেশে গেছে। কত বড় বস্তু পেয়েছেন হীরানন্দ! তার তুলনায় কষ্ট করে দেখতে আসা আর কি! এ ঋণ কি শোধ হয় কখনও?

এই যে, নরেন্দ্রের সঙ্গে বিচার করতে লাগিয়ে দিলেন, কেন? না, দেখতে তাঁর বীজ কি ভাবে কাজ করছে, কোন্ জমিতে। দেখলেন হীরানন্দের জ্ঞান ও ভক্তির পথ। আর নরেন্দ্রের জ্ঞান পথ

— অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ঘর।

যেমন বাপ নিশ্চিন্ত হয়, যখন দেখে ছেলেরা নিজের সম্পত্তি বুঝে নিয়েছে, আর মনোযোগের সহিত কাজকর্ম করছে, তেমনি, ঠাকুরও নিশ্চিন্ত হতেন, যখন দেখতেন, ভক্তরা আপন আপন ঘর চিনেছে, আর ওতে লগ্ন হয়ে আছে।

তিনি জানতেন এর পর এরা জগতের সেবা করবে। এই জন্যেই তো এদের আগমন! নিজের ধাতে, নিজের ভাবে কাজ করলে কাজটি হয় উত্তম। এতে নিজেরও কল্যাণ আর জগতেরও কল্যাণ। তাতেই উভয় পক্ষের আনন্দ।

পরস্পরের এই আলোচনায় আর একটি লাভ হয়। গোঁড়ামী ভেঙ্গে যায়, চিত্ত উদার হয়, একঘেয়ে ভাব নষ্ট হয়। অপরের standpoint (মত) জানা থাকলে narrowness (সংকীর্ণতা) ঢুকতে পারে না। ঠাকুর বলতেন, 'রাঁড়ীপুতী বুদ্ধি না হয়' — মানে dogmatic, narrow (গোঁড়া, সংকীর্ণ) বুদ্ধি না হয়।

ঈশ্বর অনন্ত। তাঁর ভাবও অনন্ত। তোমার যেটা ভাল লাগে তাই নাও। তাতেই তোমার শাশ্বত শান্তিসুখ লাভ হবে। অপরকেও অপরের ভাবে চলতে দাও। তাদের শান্তিসুখ লাভ হবে ঐ পথে। এটি শেখাতে এসেছেন ঠাকুর, অবতার।

কলিকাতা।
১৭ই জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ।
বৃহস্পতিবার।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয় বিপদে

১

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদ। অপরাহ্ন তিনটা। কয়দিনের পর আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। শ্রীম নিজ কক্ষ হইতে ছাদে আসিয়াছেন, চারিদিকে সব দেখিতেছেন। একটু পর আসিয়া টিনের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শচী জগবন্ধুর সহিত এই ঘরে আজকাল থাকেন। জগবন্ধু তাঁহাকে ফিলজফি পড়াইতেছেন।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — হাঁ, খুব পড়, খুব পড়। এমন দিন আর হবে না। পড়া যতদিন চলে ততদিন ব্রহ্মচর্য রক্ষা হয়। ব্রহ্মচর্য আশ্রম মানে ছাত্রজীবন। পড়লে আজ পর্যন্ত জগতে যে সব চিন্তা হয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় হয়। Culture হয়, মানে মনের কর্ষণ হয়, মনটি সংস্কৃত হয়। অর্থাৎ নানা চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে যেটি sublime (সর্বশ্রেষ্ঠ) সে চিন্তাটিতে মন অবশেষে আশ্রয় গ্রহণ করে, জন্ম জন্ম ঘুরতে ঘুরতে। তুমি হয়তো ধরে রেখেছ ঋষিদের মহাবাক্য 'ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ' (কেনো ২/৫)। ঈশ্বরকে এই শরীরে না জানতে পারলে মহা অনিষ্ট হবে — বার বার জন্মমরণ চক্রে পতিত হতে হবে। কাজেই, তোমার কাছে ঈশ্বর-দর্শন মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আর এখন যা পড়ছো ethics (নীতিশাস্ত্র) তা'তে একটা আছে Hedonism (আনন্দবাদ)। ভারতীয় ভাষায় বলে 'চার্বাক মত'। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' খাও দাও আনন্দকর, এই দলের মত। এই দুটো মতই তোমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইবে। একটা ব্রহ্মানন্দ ভোগে, একটা বিষয় ভোগে। বিচারবান লোক, যেটা ভাল, যেটা অনন্তকাল শান্তিসুখ

দিবে, সেটাই নেবে।

এই জন্য বিচারের প্রয়োজন। তাই নানানখানা জানারও প্রয়োজন। সব দেখে একটাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে হবে। জগতে থাকতে হলে নানা জনের চিন্তার সঙ্গে পরিচয় করা দরকার এই জন্য। এটা ওটা গ্রহণ বর্জন করতে করতে শেষে sublime thought (সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব) আশ্রয় করতে হবে — আমরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'।

তখন মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংসারে থাকে দাসীবৎ। আগে ঈশ্বর পরে জগৎ — এ জ্ঞান সুদৃঢ় হয়। ইতিপূর্বে উল্টোভাব আশ্রয় করেছিল — আগে জগৎ পরে ঈশ্বর, জগৎই সব।

ঈশ্বরের সন্তান আমি, সচ্চিদানন্দের অংশ, এ ভাব দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরমত্-সহিষ্ণুতা আসবে! ততদিনে power of judgement and reason (বিচার ও যুক্তি) সুদৃঢ় হবে।

খেদও মিটে। মনে হয় কিনা আমি পড়লাম না, শুনলাম না। তাছাড়া, ব্রহ্মচিন্তা না হলে পড়ার চিন্তা ভাল। এতেও মন উঁচু চিন্তার সহিত পরিচিত হয়। এ দিয়ে লোক চেনা যায় — কোন্ ব্যক্তি কিরূপ বা কোন্ জাতি কিরূপ — তার চিন্তার পরিচয় বলে দেয়।

মানুষটা কি? কতকগুলি চিন্তার সমষ্টিমাত্র। এর ভিতর একটা হয়তো খুব প্রবল চিন্তা। সেটি কাজে, কথায়, ব্যবহারে প্রকাশ পায়। তাই লোক চেনার সুবিধা হয় অনেক জানা থাকলে। তাতে অপরের জন্য সহানুভূতি বাড়ে আর নিজেকেও বাঁচিয়ে চলতে পারে।

দেখ না পড়ার প্রভাব কিরূপ। মনটা হয়তো নেমে গেছে দেহ সুখে। তখন কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' খানা খুলে পড়ছো। সঙ্গে সঙ্গেই মনে চলে গেল নির্জনে হিমালয়ে। আর দেখছ শিব দেবদারু বনে বসে ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন। সমস্ত প্রকৃতি শাসন করছে নন্দী বেত্র হস্তে, ধ্যান ভঙ্গ না করে।

পাঁচটা জানা থাকলে সংসারে চলা সহজ হয়। তাই বলে, knowledge is power (জ্ঞানই শক্তি)। সংসারে থাকতে হলে দশ জনের সঙ্গে মিশতে হবে। সংস্কৃত মন সহজে মিশতে পারে

অনেক লোকের সঙ্গে। নইলে নিজের মতটা নিয়েই একা থাকতে হবে।

এত সব আয়োজন শেষে ব্রহ্মচিন্তার জন্য। ব্রহ্মচিন্তা তো হচ্ছে না! তাই উঁচু আরও পাঁচটা চিন্তা নিয়ে মন থাকে। ক্রমে ব্রহ্মচিন্তা আসবে মন সংস্কৃত শুদ্ধ যখন হবে। তাই এগুলি next best (ব্রহ্মচিন্তার পূর্ববর্তী উত্তম চিন্তা) তাই পড়া ভাল।

শ্রীম (সহাস্যে অন্তেবাসীর প্রতি) — আমি একবার বিদ্যেসাগর মশায়কে বলেছিলাম — আপনার কত জানা আছে এই সব শাস্ত্রাদি। উনি এই কথা শুনে একেবারে কেঁদে ফেললেন। বললেন, (নাকি সুরে কান্নার অভিনয় করিয়া) 'কৈ আর পড়তে পারলাম? ভেবেছিলাম পড়বো। কিন্তু সংসারে পড়ে এতেই জড়িয়ে গেছি। পড়া আর হল কৈ?' ঠিক এইরকম দুঃখ করে বলেছিলেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — বেদে আছে দুটি বিদ্যা জানা দরকার — পরা আর অপরা। সংসারের নানা বিদ্যা — শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন — এ সব অপরা অর্থাৎ নাশবান। আর পরা বিদ্যা হলো ব্রহ্মবিদ্যা — 'যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।' পরা বিদ্যাতে মন গেলে আর দরকার নাই অন্য কিছুর। কিন্তু তা তো হয় না। তাই অন্য বিদ্যাতে মন রাখাই দ্বিতীয় পন্থা। তা না হলে মন একেবারে নিচে নেমে যায় বিষয় ভোগে। মনের স্বভাবই এই নিচে নেমে যাবে জলের মত। 'পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ' (কঠো ২/১/১) — ভগবানই মনাদি একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিম্নমুখ করে তৈরি করেছেন। বেদ বলছেন তাই মনকে উপরে তুলে রাখতে হবে চেষ্টা করে। গীতায়ও তাই বলেছেন — 'আত্মানং নাবসাদয়েৎ' (গীতা ৬/৫)।

স্থূল থেকে সূক্ষ্ম ভাল, তার চাইতে কারণ ভাল, কারণ থেকে মহাকারণ ভাল। তাই লৌকিক বিদ্যায় সূক্ষ্মে মন রাখা ভাল।

শ্রীম (শচীর প্রতি) — এ সব বিদ্যার ভিতর সংস্কৃত পড়া আরও ভাল। সংস্কৃতকে দেবভাষা বলে। এটা পড়লে মন পবিত্র বলে বোধ হয়। এই ভাষার ভিতরে ভারতীয় সকল উচ্চ চিন্তা গ্রথিত আছে।

এই ভাষার মাহাত্ম্য এই, এর ভিতর দিয়ে শেষে ব্রহ্ম চিন্তায় মনকে টেনে নেবে। ভাষা ভাবের বাহন। দেবভাষায় এত সব উচ্চ চিন্তা নিহিত আছে যে এর নাম শুনলেই মন পবিত্রতাতে পূর্ণ হয়। কাব্যগুলি দেখ। এতে সংসারের ভাবও আছে আবার ঈশ্বরের ভাবও আছে। পড়, এ সুযোগ ছেড়ো না। ছাড়লে পরে পশ্চাৎ-তাপ হবে। এমন দিন আর হবে না।

লক্ষ্মণ প্রবেশ করিলেন। ইনি অদ্বৈত আশ্রমের সেবক।

শ্রীম (লক্ষ্মণের প্রতি) — তুমিও পড় সংস্কৃত। ব্যাকরণ কৌমুদী পড়লে সংস্কৃত বুঝতে পারবে। কারুকে বললেই পড়িয়ে দিবে। সংস্কৃত না পড়লে হিন্দুদের চিন্তা কত উঁচুতে উঠেছিল তা বুঝতে পারবে না। ভারতের সকল চিন্তা সম্পদ এই দেবভাষার সিন্দুকে নিবদ্ধ। বিদ্যেসাগর মশায়ও রাঁধতেন আর সঙ্গে সঙ্গে পড়তেন। দেখ পড়ে পড়ে কত বড় লোক হয়েছেন তিনি।

২

অল্পক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হইবে। ছাদে ভক্তগণ আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, শান্তি, ছোট রমেশ, মনোরঞ্জন, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, বলাই, বড় অমূল্য, শচী, জগবন্ধু প্রভৃতি মাদুরে বসিয়াছেন। শ্রীম আসিয়া বসিলেন চেয়ারে উত্তরাস্য। ভক্তগণ শ্রীম-র সম্মুখে।

শ্রীম হাততালি দিয়া 'হরিবোল হরিবোল' বলিতেছেন। তারপর সকলে কিছুকাল ধ্যান করিলেন। এইবার 'কথামৃত' বর্ষণ হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গুরুবাক্য শুনে চললে আর ভয় নাই। সংসারে থাকতে গেলে একেবারে ভয় নাই একথা বলা চলে না। ভয় আছে। শোক তাপ, দুঃখ, কষ্ট, অভাব, জরা মৃত্যু, এ সব ভয় তো চোখের সামনেই রয়েছে। তারপর unseen (অ-দৃষ্ট) কত ভয় আছে, কত বিপদ ভাবনা আছে। তাহলেও গুরুবাক্যে বিশ্বাস হলে এ সব ভয়ও কিছু করতে পারে না। যে গুরুবাক্য আশ্রয় করে থাকে

তাকে এ সব ভয় অতলে ফেলতে পারে না। মেঘের মত এ সব আসে যায়। জ্ঞান সূর্য সর্বদা মঙ্গলময় কিরণ বিস্তার করে। মেঘ সাময়িক। শরীর থাকলে মেঘ আসবেই মনাকাশে। গুরুবাক্য-রূপ সূর্য উঠে মেঘকে সরিয়ে দিবে।

যদি বল কেন ঈশ্বর এ সব মেঘ করলেন? তার উত্তর, তবে তো ভক্তরা পাকা মাঝি হবে! In a clam sea everyone is a pilot. প্রশান্ত সমুদ্রে নৌকো চালানোর আর কি বাহাদুরী? উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রে যে নৌকো চালাতে পারে সে পাকা মাঝি। তবেই শান্তিসুখ-আনন্দ হৃদয়ে বিরাজ করবে, বাইরে হয়তো প্রবল ঝড়। এতে ভক্তের মাহাত্ম্য বাড়ে। বিপদে ধীর প্রশান্ত থাকে ভক্তগণ। তাদের দেখে অপরে ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ হবে। সংসার করা কি ছেলেখেলা! অযুত হস্তীর বল যদি হৃদয়ে থাকে তবে গিয়ে সংসার কর।

গুরু আগে থেকেই বলে দেন — সংসারে নানারূপ ঝঞ্ঝাবাত আসবেই। তাই ভক্তগণ সর্বদা প্রস্তুত থাকে এর জন্য। অন্য লোক একটু কাল মেঘ দেখলেই ঘাবড়িয়ে যায়। ঠাকুর ভক্তদের একটি মহামন্ত্র বলে দিছলেন, একটি গান গেয়ে নেচে নেচে —

দয়াল গুরু বলে দাও রে সাঁতার,
যদি পড়বে আবর্ত জলে
ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলে,
বল, গুরু কোথায় তুমি পারের কাণ্ডারী।

গুরুভক্তের বিনাশ নাই। শত ধাক্কা খেলেও তার বিনাশ নাই। তাকে এ সব ধাক্কা উপরে তোলে। তার মনকে ভগবানে 'আরো দৃঢ়বদ্ধ করে। ভক্তের শক্তি বৃদ্ধি হয় বিপদে। সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়। দু'হাতে ভগবানকে ধরার শক্তিলাভ হয়। এটাই হলো মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

গুরু যা বলেন তা সাধন করতে হয় এক মনে। তাতে শক্তি জমে। কেউ কেউ একটু জমতেই অমনি লেকচার দেয়। গাছে না

উঠতেই এক কাঁদি! জমা না হতেই খরচ! তা হলে আর কি করে হয়?

ডিকেন্সের একটা বইতে আছে এসব কথা। ঠাকুরের কথায়ও parallel passage (অনুরূপ উক্তি) আছে। 'মন্দিরে তোর নাইকো মাধব শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল।'

গুরুর ঋণ কেউ শোধ করতে পারে না। তাই obligation (বাধ্যবাধকতা) নেই। অহেতুক কৃপাসিন্দু গুরু। তাঁর কেনা হয়ে যাওয়া। তুমি বুঝতে পার আর নাই পার, তুমি তাঁর কেনা গোলাম। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, আমরা তোমার 'অশুল্ক দাসিকাঃ'।

এখানে obligation (বাধ্যবাধকতা), gratefulness (কৃতজ্ঞতা), 'Thank you'-র (ধন্যবাদের) অবসর কোথায়? একি দুনিয়াদারি ব্যাপার — যেমন একজন ফ্রেণ্ড আর একজন ফ্রেণ্ডের কাছে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ থাকে? তা নয়। তারও উপর। কৃতজ্ঞতা উঁচু জিনিস বটে, কিন্তু তারও উপরে গুরুর শরণাগতি।

ঠাকুর বলতেন, অকৃতজ্ঞের মুখ দর্শন করতে নেই। অতবড় জিনিস কৃতজ্ঞতা! কৃতজ্ঞতা মানে উপকারীর উপকার স্বীকার করা। এতেও সমান ভাব আছে — 'তুমি আমি'র ভিতরের ব্যাপার। কিন্তু গুরুর সঙ্গে তা নাই — সবই 'তুমি'। 'আমি' নাই। যেমন শিশু ও মা। গণনাতে দুই বটে, কিন্তু শিশুর অস্তিত্ব নাই মা ছাড়া! গুরু মানে ভগবান, অবতার।

ভক্তরা যে ঠাকুরের এতো সেবা করেছে তা'তে কি তারা ঋণের এক কণাও শোধ দিতে পেরেছে? তা পারে নাই। হাজার কর তবুও গুরুর ঋণ শোধ হয় না।

ঠাকুর কেন সেবা নিতেন? তাঁর কি দরকার সেবার? যিনি সর্বদা জগন্মাতার কোলের শিশু, জগন্মাতা যাঁর সকল ভার নিয়েছেন, তিনি কেন ভক্তদের সেবা নিতেন? সেবা না করলে জোর করে নিতেন। কেন এ লীলা? ভক্তদের কল্যাণের জন্য। তিনি জানতেন, তিনি ও জগন্মাতা ব্রহ্মশক্তি — অভেদ। তাঁর শরীরের সেবা মানে জগন্মাতার

সেবা। ঠাকুর নিজের মুখে বলেছেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই এই মানুষের শরীর ধারণ করে এসেছেন। ভিতরে ব্রহ্মশক্তি মা — বাইরে শিশু।

গুরু যা বলেন, যা দেন সবই প্রসাদ। থিয়েটারে গিয়ে গিরিশবাবুকে ঠাকুর একটা টাকা দিলেন। গিরিশবাবু আনন্দে ঐ টাকাটা মাথায় নিয়ে নাচতে লাগলেন। প্রসাদ বলে ঐটি গ্রহণ করলেন। ঐ টাকাটি বুঝি পুজোর ঘরে রেখে দিয়েছিলেন।

শ্রীম মত্ত হইয়া সঙ্গীতে গুরু বন্দনা করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও সঙ্গে যোগদান করিলেন।

চল গুরু দুজন যাই পারে।
আমার একলা যেতে ভয় করে।।
দেহ ছিল শ্মশানের সমান।
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করলো ফুল বাগান।।
তার সৌরভেতে আকুল করে মুনি ঋষির প্রাণ হরে।
চল গুরু দুজন যাই পারে।।

এখন রাত্রি দশটা। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। কি দারুণ বৃষ্টি! আর থামে না। রাস্তা সব জলমগ্ন। মর্টন স্কুলের সম্মুখে আমহার্স্ট স্ট্রীটে কোমর জল। ডাক্তার বক্সীর মোটর গাড়ী জলে ডুবিয়া আছে। বৃষ্টির বেগ কমিলে ভক্তরা সকলে গাড়ী ঠেলিয়া আমহার্স্ট স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সঙ্গমস্থলে লইয়া গেল। বহু কষ্টে রাত্রি বারটায় হ্যারিসন রোড - কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়া গাড়ী কাশীপুর গেল। সকল সহর নীরব নিথর।

মর্টন স্কুল, ৫০ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।
১৮ই জুলাই, ১৯২৪ খ্রীঃ, ২রা শ্রাবণ ১৩৩১ সাল।
শুক্রবার, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ২২।৪০ পল।

ষোড়শ অধ্যায়

সেই অভাব পূর্ণ হলো ঠাকুরের দর্শনে

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। রাত্রি আটটা। আকাশে চাঁদ। মাঝে মাঝে কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ডগুলি চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছে — স্নেহময়ী জননীর সঙ্গে যেমন শিশুগণ খেলা করে।

আজ ১০ই আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ। ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল। রবিবার শুক্লা দ্বাদশী ১৯।৪ পল।

শ্রীম পশ্চিমাস্য বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন। ভক্তগণও শ্রীম-র তিন দিকে বেঞ্চেতে বসা — দুর্গাপদ ('হিলিংবাম'), সুখেন্দু, শান্তি ও সঙ্গী, বলাই, গদাধর, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, বড় অমূল্য, ছোট অমূল্য, বেলেঘাটার এক জন ভক্ত, ভৌমিক, বিদ্যার্থী বিমল দত্ত ও তার সঙ্গী, অমৃত, জগবন্ধু প্রভৃতি। সিলেটের রজনী দক্ষিণ দিকে ভাঙ্গা বেঞ্চের উপর একাকী বসিয়া আছেন।

আজ রবিবার বলিয়া সারাদিন লোক সমাগম হইয়াছে। শ্রীম ক্লান্ত। শরীর তেমন ভাল নয়। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথার বিরাম নাই। তিনি বলেন, এতে ক্লান্তি দূর হয় — প্রাণ ফিরে আসে। মাছটা ড্যাঙ্গায় মরমর হয়েছে। যেই জলে ফেলে দিল অমনি সোঁ করে দৌড়। কেন? প্রাণ পেয়েছে যে। তেমনি ঈশ্বরের কথা। শরীর ও মনের সকল অবসাদ মুহূর্তে দূর করে দেয়।

শ্রীম স্বচ্ছন্দে 'কথামৃত' বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি) — আপনাদের অন্তত সপ্তাহে একদিন করে মঠে যাওয়া উচিত। এতো কাছে যখন রয়েছেন! ভাগ্যে থাকলে হয় এ সব যোগাযোগ। এখন তার advantage (সুযোগ) নিতে হয়।

আজ যাব কাল যাব, এই ক'রে মানুষের সারাজীবন কেটে যায়। আর যাওয়া হয় না। ন'টার সময় খেয়ে দেয়ে গেলেন। সারাদিন মঠে থেকে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এলেন। ইস্টিমার হওয়ায় আজকাল মঠে যাওয়ার কত সুবিধা।

দুর্গাপদ — বাবুরাম মহারাজ থাকতে এসব আলোচনা হত। বলতেন, ইষ্টিমার হলে মঠে লোক ধরবে না। কিন্তু আজকাল তো তত লোক যেতে দেখছি না? রাখাল মহারাজ থাকতে রবিবারে একশ' লোক খেতো। তখন মনে হতো সর্বদাই যেন উৎসব লেগে রয়েছে। বাবুরাম মহারাজ ভক্তসেবার আলাদা বন্দোবস্ত করতেন। সেই সবই তো রয়েছে, লোক যাচ্ছে না পূর্বের মত।

শ্রীম — লোক কি abstract (সূক্ষ্ম) ধরতে পারে? স্থূল চাই। Personality (মানুষ) চাই। ঈশ্বর অবতার হয়ে আসেন কেন কিছু দিন পর পর? Abstract-কে (সূক্ষ্ম গুণাবলীকে) concrete formএ (স্থূলরূপে) দেখাতে আসেন। স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, ঈশ্বরপ্রেম, এগুলি যখন কোন মানুষের ভিতর প্রকাশিত হয় তখনই লোক আকৃষ্ট হয়। Personality-র অভাব হলে লোকের আকর্ষণও কম হয়।

মঠে ছবির পুজো না হয়ে যদি সশরীরে ঠাকুর উপস্থিত থাকতেন, তা হলে লোকের আকর্ষণ আরও বেশী হতো। কেন? না, ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন হতো তা হলে আরও বেশি।

তিনি থাকতে ভক্তরা কত কষ্ট ক'রে যেতো। দুপুরের রোদ, আবার জ্যৈষ্ঠ মাস — এতেই চলছে দক্ষিণেশ্বর। ঘেমে একাকার। আবার জলঝড়েও গিয়ে উপস্থিত হতো। কোন বাধাই মানছে না। প্রাণটা যেন উপড়ে নিয়ে যাচ্ছে কে, দেহ থেকে আলাদা ক'রে। অত আকর্ষণ! কেন? জগতে তো আর কোথাও এ ভালবাসা নেই — এই নিঃস্বার্থ প্রেম? এ ঝড়ের মত ভালবাসা সকল বাধা নির্মূল ক'রে যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতো ভক্তদের। তাদের মনেই হতো না — রোদ বৃষ্টি কষ্ট। মনে হতো — গঙ্গা যেন আনন্দসাগরে মিলতে যাচ্ছে।

দুর্গাপদ — ঠাকুর টানতেন তাই ভক্তরা যেতেন।

শ্রীম — হাঁ, তা তো বটেই। তাঁর Divine Personality-র (দিব্যভাবের) টানে যেতো।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। কি যেন স্মরণ করিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতে লাগিলেন — অতীতের স্মৃতিবর্ণনা।

শ্রীম (সহাস্যে) — আমরা ছেলেবেলায় personality (বিশিষ্ট পুরুষ) বড় ভালবাসতাম। তখন কলেজে পড়াশোনা করা যাচ্ছে। বঙ্কিমবাবুর বই পড়া গিছলো। পড়ে, তাঁকে দেখবার জন্য খুব ইচ্ছা হল। একবার বেলগেছেতে কি একটা re-union (মিলনোৎসব) হয়েছিল। মস্ত বড় একটা বাগানে সারি সারি টেন্ট পড়েছিল। বঙ্কিমবাবু ওখানে গিছলেন। আমরা তাঁর পিছু পিছু দু'ঘন্টা ধরে ঘুরলুম। যেখানে যাচ্ছেন পিছু পিছু ছুটছি সেখানে (হাস্য)।

বিদ্যেসাগর মহাশয়ও আমাদের খুব আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বাদুরবাগানের বাড়ি থেকে বের হয়েছেন অমনি তাঁর পিছু ধরলুম। চটর চটর করে তিনি এ-বাড়ি ঢুকছেন, ও-বাড়ি ঢুকছেন, আমিও পিছু পিছু চলছি। একবার মনে হয় বিডন স্ট্রীট পর্যন্ত তাঁর পিছু পিছু গিছলাম।

কেশব সেনের জন্যও টান হয়েছিল। তাঁকে দেখতে যেতাম যেখানে যেতেন। একবার কলেজ স্কোয়ারে কি একটা সভা হয়েছিল। তাঁকে দেখতে গিছলাম। আমি তখন এ্যানট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছি। সঙ্গে একজন বন্ধু ছিল। দূর থেকে দেখছি খালি। আর একবার তারও পূর্বে এ্যালবার্ট হলে তাঁকে দেখেছিলাম পিলারের উপর উঠে উঁকি দিয়ে — উনি বিলিতি মেইল লিখছেন। তখন বুঝি সেকেণ্ড ক্লাশে* পড়তাম। অতি সসম্ভ্রমে দেখতাম।

মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও দেখেছিলাম। তখন আমার বয়স বছর বার। আমাদের পাড়ায় এসেছিলেন মনমোহন ঘোষের সঙ্গে।

---

*বর্তমান নবম শ্রেণী

তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি ছিল আমাদের পাড়ায়। তাদেরই বাড়িতে এসেছিলেন। আমরা সব ওই বাড়ির রোয়াকে বসে আছি। এসেই আমাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন হাসতে হাসতে — 'well gentlemen, how do you do?' (ভদ্র মহোদয়গণ, কুশল তো?) তখন বিলেত থেকে সবেমাত্র এয়েছেন।

জুনিয়ার personalities (ব্যক্তিদের) মধ্যে এ.এম. বোস, সুরেন ব্যানার্জী প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শেষটায় এ.এম. বোস ঠাকুরকে খুব মানতেন। সুরেন ব্যানার্জীর সঙ্গে personal contactএ (ব্যক্তিগত সম্পর্কে) এসেছিলাম। তখন পাশটাশ করা গেছে বি.এ.। প্রেসিডেন্সি কলেজে 'স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন' নাম দিয়ে একটা সঙ্ঘ করা গেল। তার প্রেসিডেন্ট এ.এম. বোস আর ভাইস প্রেসিডেন্ট সুরেন ব্যানার্জী, আর আমি সেক্রেটারী। তখন খুব পলিটিক্যাল ম্যান ছিলাম কিনা আমি (সকলের হাস্য)!

সুরেনবাবুর ফার্স্ট লেকচার শুনি ঐ এসোসিয়েশনে। তখন সবেমাত্র cashiered (পদচ্যুত) হয়েছেন। সিলেটের এডিসানেল ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ঐ লেকচারটি কটন সাহেব (Cotton) সম্বন্ধে ছিল। সেকেণ্ড লেকচারের বিষয় ছিল — The rise of the Sikhs — শিখদের অভ্যুত্থান। ওঁর বলবার ধরণই ছিল পৃথক। খুব attractive (চিত্তাকর্ষক) করতে পারতেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আটাশ।

(সহাস্যে) এক দিনের একটা কথা মনে পড়ে। আমার একটা 'ই' (ঝোঁক) ছিল কিনা, কোন কিছুতে লেগে পড়লে হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান থাকতো না। একবার সুরেনবাবুর বাসায় যাওয়া গেল তালতলায়। সকাল বেলা আটটা। ওঁর চা খাওয়া হয়ে গেছে। আমি বিলেতের সব খবর জিজ্ঞেস করছি। আই.সি. এসের জন্য যাবার কথা হচ্ছিল কিনা। এ খবর সে খবর নানান খানা খালি জিজ্ঞেসই করছি। তিনি সবে আই.সি.এস হয়ে এসেছেন। বেলা বেড়েই যাচ্ছে। বাড়ি থেকে চাকর এসে নাইতে বলে গেল। খাবার প্রস্তুত। উনি উঠেন নাই আর আমারও ওদিকে খেয়াল নেই। যখন আমি উঠলাম তখন তিনিও

উঠলেন। তখন বেলা একটা (সকলের বিস্ময়)! তখনই তাঁর infinite patience-এর (অসীম ধৈর্যের) পরিচয় পাই। আমার সঙ্গে মাত্র ঐ একটু অফিসিয়াল relation (সম্বন্ধ) ছিল।

এর একটা ফলও হয়েছিল বড্ড খারাপ। তখন কার্তিক কি অগ্রহায়ণ মাস ছিল। রৌদ্রে একটার পর হেঁটে বাড়ি এসেই জ্বরে পড়লাম। এমন জ্বর যে প্রাণ যায় যায়।

শ্রীম (স্বগত) — আর কে তখনকার নাম করা লোক? হাঁ, দ্বারকানাথ মিত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাড়িতে। আমি সেখানে বরযাত্রী হয়ে গিছলাম। ওঁর মেয়ের সঙ্গে আমার এক ক্লাশ-ফ্রেণ্ডের বিয়ে হয়েছিল।

রেভারেণ্ড কে.এম. ব্যানার্জীর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। আমাদের পাড়ায় ওঁর বোনের বাড়ি। খ্রীস্টান হয়ে গেলেও বোনকে দেখতে আসতেন। তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। ভাগ্‌নাদের মানুষ করে কর্ম করে দিলেন। আমরা তখন ছেলেমানুষ। ঐ বোনের ছেলেদের আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে তোদের মামা কি বললেন? ওরা উত্তর দিল, আমরা পাখা নিয়ে হাওয়া করতে গেলাম। উনি বললেন, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও পাখা — ও কৃত্রিম হাওয়া। ওঁদের কথাগুলি কেমন এক রকমের যেন — 'নিয়ে যাও — ও কৃত্রিম হাওয়া' (হাস্য)।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছি। একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে, একবার আদি সমাজে। আর একবার নববিধানে। যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এঁদেরও দেখেছি।

রামতনু লাহিড়ীকেও দেখেছি। ইনি সত্যবাদী বলে বিখ্যাত ছিলেন।

কিন্তু বঙ্কিমবাবু, বিদ্যেসাগর মশায়, কেশব সেন এঁদের জন্য যেমন একটা টান ছিল অন্যদের জন্য তেমন ছিল না। কেন যে ঐ টান ছিল এঁদের জন্য এর কারণ বুঝতে পেরেছি পরে। যতগুলি লোককে ভাল লাগতো সকলেই ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। বঙ্কিমবাবু আর বিদ্যেসাগর মশায় তো আমাদের সঙ্গেই দর্শন করলেন। কেশব সেন কয়েক বছর আগে থেকেই ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসা করতেন

— এইটিন সেভেন্টিফাইভ থেকে।

কেশব সেনের বক্তৃতা কেন ভাল লাগতো তার কারণও শেষে পাওয়া গেল। তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে inspiration (উদ্দীপনা) এনে বক্তৃতা দিতেন কিনা! ঠাকুরেরই কথা কেশববাবুর মুখে শুনতাম তাই ভাল লাগতো। ঠাকুরের কথা ও সমাধির ভাব দিয়ে কেশব বাবুর প্রিয় গাইয়ে ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল গান বাঁধতেন। তাই ঐসব গান এতো মনোমুগ্ধকর হতো। কেশব সেন মারা গেলে রাস্তা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্মশানে যাই, মনে পড়ছে। তখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে — এইটিন এইটিফোর। গভীর ভালবাসা না থাকলে কি চোখের জল বের হয়!

২

শ্রীম কিছু অধিকক্ষণ নীরব রহিলেন, আবার কথা চলিতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে। এখন তাই দেখছি।

এঁদের এত ভালবাসতুম কিন্তু সব জায়গায়ই যেন কি একটা void (অভাব) বলে মনে হতো। ঠাকুরকে দর্শন করে সেই void (শূন্যতা) পূর্ণ হ'ল। তাই, যে এদিককার সব করতে পারে সে ওদিককারও সব করতে পারে।

কি যেন একটা অভাব feel (অনুভব) করতুম। যেমন false (মিথ্যা) মৃগতৃষ্ণিকার পিছু পিছু লোক ছুটে তেমনি এখানে সেখানে যেতুম।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাঁ, প্রতাপ মজুমদারকেও দেখেছি। কেশব সেনকে বলতুম সিসারো (Cicero) আর প্রতাপ মজুমদারকে বলতুম দিমস্থেনিস্ (Demosthenis) (হাস্য)।

মাইকেলকে নিয়ে গিছলো ওরা দক্ষিণেশ্বর। ম্যাগাজিন ওয়ালাদের সঙ্গে কালী বাড়ির কর্তাদের মামলা হবার কথা ছিল। ঐ স্থান দেখতে গিছলেন। তখন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ঠাকুর পরে আমাদের

বলেছিলেন, আমার কথা কইতে ইচ্ছা হলো না ওর সঙ্গে। আর একজনকে (নারায়ণ শাস্ত্রীকে) বললুম জিজ্ঞাসা করতে, কেন নিজের ধর্ম ছেড়ে খ্রীস্টান হলো। পেট দেখিয়ে উত্তর দিলেন, এর জন্য। নারায়ণ শাস্ত্রী তখন ওখানে থাকতেন। এই কথা শুনে কথা কইতে ইচ্ছা হলো না!

মাইকেলকে যখন দেখি তখন আমি ফোর্থ ক্লাসে (বর্তমান সপ্তম শ্রেণী) পড়ি হেয়ার স্কুলে (১৮৬৬)। তখন ঠাকুর কামারপুকুরে গেছেন ঘর করতে। কয়েক মাস ছিলেন। তোতাপুরী আসার পর।

মাইকেলের সনেটগুলি (১৪ লাইনের ক্ষুদ্র কবিতাগুলি) immortal (অমর)। জন্মস্থান সাগরদাঁড়ী সম্বন্ধে লিখেছেন ফ্রান্সে বসে। এতে আছে কপোতাক্ষ নদীর কথা, আর পিতা রাজনারায়ণ আর মাতা জাহ্নবী। আহা, কি musical (সুর মধুর)। বাপ মাকে, গ্রামকে, নদীকে, সকলকে ভালবেসেছেন। তা না হলে কি আর কবি! কবির ভালবাসা থাকবে না তো কি থাকবে? শুষ্ক জ্ঞান বিচার কবির শোভা পায় না।

দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

মাইকেল বলতেন, gentleman (মশায়), মাসে এক হাজার টাকা না হলে ভালভাবে থাকা যায় না। তাঁর শেষ কালটা কি কষ্টে গেছে — দুর্দশার শেষ। যেমন কর্ম তেমনি ফল!

এঁর লিখিত সরমা ও সীতার conversation unparalleled (কথোপকথন অতুলনীয়)। (সহাস্যে) 'That fellow Ram'-কে

(রাম নামীয় মনুষ্যটাকে) ভালবাসতেন না — সীতাকে বনে পাঠিয়েছিলেন বলে। রাবণকে বলতেন, হাঁ, ইনি একজন বীর বটে! 'মেঘনাদবধ'-এ রাবণ বিভীষণকে বোঝাচ্ছেন— কি সুন্দর বর্ণনা — যত সব patriotic feelings invoke (স্বদেশপ্রেম জাগ্রত) করছেন।

শম্ভু মুখুয্যেকেও দেখেছিলাম বরানগরে। ইনি যখন লিখতেন বা পড়তেন তখন দু'দিকে দুটো সেজ জ্বলতো। তার মাঝখানে বসে পড়তেন। তাঁর sense of beauty (সৌন্দর্যবোধ) খুব strong (প্রখর) ছিল।

এইসব personalities-এর (বিশিষ্ট ব্যক্তিদের) সঙ্গে আমার contact (মিলন) হয়েছিল।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — সাহেবদের মধ্যে তেমন কারো নাম শুনা গেল না — এখানেও না, ওদের দেশেও না। কোথায় যেন সব মিশে গেল। এমনি একটিও দেখছি না, যে এদের thoughtএ revolution (চিন্তাধারায় বিপ্লব) আনতে পেরেছে। কি করে হবে? একে তো এদেশে আসতেই unwilling (অনিচ্ছুক)। তার উপর আবার সরে সরে থাকা। শুধু over-paid করে (টাকার লোভ দেখিয়ে) রাখা এদেশে। এ ভাবে কি করে হয়!

কি দুর্দশাই গেছে এদেশের। বিদ্যেসাগর মশায়কে পর্যন্ত charmed (মন্ত্রমুগ্ধ) করে ফেলেছিল ইংরেজ শাসন। 'চরিতাবলী'তে খালি ওদেশের লোকদের জীবনী অনুবাদ করে দিতেন। ডুবালের গল্প এদেশের ছেলেদের দিচ্ছেন। কি সে গল্প? না, যেন তেন প্রকারেণ পড়লো ডুবাল। বনবিড়াল মেরে তার ছালগুলি বাজারে বিক্রয় করে, সেই অর্থে পড়ার খরচ নির্বাহ করতো। কি হীন আদর্শ — নিষ্ঠুরতা দ্বারা বিদ্যালাভ! তা হবে না কেন? ও যে materialistic civilisation-এর (জড় সভ্যতার) উদ্গার। ওদের ideal — how to live well (আদর্শ — কি করে অধিক দেহসুখ লাভ হয়)। এই সব হীন আদর্শ ভারতের ছেলেদের সামনে এনে ধরলেন। ছেলেরাও তা imitate (অনুকরণ) করতে লাগলো।

কি আশ্চর্য, বিদ্যেসাগর মশায় পর্যন্ত পড়ে গেলেন ঐ দেশের গোলকধাঁধায়। সুকুমারমতি বালকবালিকাদের ঐ সব হীন আদর্শ পড়িয়ে পড়িয়ে সর্বনাশ হয়েছে দেশের।

তবুও রক্ষে — higher study-তে (উচ্চ ক্লাসে) 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা' পড়ে ঋষিদের জীবনের আদর্শের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে পেরেছিল, যাদের সংস্কার ছিল তারা।

জগবন্ধু — কলকাতায় স্টিফেন সাহেব একজন ফিলজফার।

শ্রীম — ও যেন কামারের বাড়িতে ছুঁচ বেচতে যাওয়া। India is the land of philosophy (ভারত দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি)। এখানে কি করবে ওরা ফিলজফির দু'একটা কথা বলে!

শ্রীম (কথার স্রোত পরিবর্তন করিয়া) — ভৌমিক মশায়, দেখুন না একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে — কি বিরাট কাণ্ডখানা চলছে। (সকলের প্রতি) গুরু প্রণামে আছে — 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্' — ঈশ্বর সর্বব্যাপী। (রহস্য করিয়া স্মিত হাস্যে) এ-ও বলা যায় — এতো আমাদের জানা আছে (শ্লোকটা মাত্র, ভাবটা নয়)। (সকলের হাস্য)।

এখন রাত্রি নয়টা। শ্রীম-র ইচ্ছায় শান্তি কথামৃত পাঠ করিতেছেন প্রথম ভাগ দশম খণ্ড — 'সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব'। পাঠ শেষ হইলে শ্রীম মন্তব্য করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সুরেনবাবুর বাগানে ঠাকুর আসায় দু'টি কাজ হলো — একটি, সকল ভক্তদের মিলন। আর দ্বিতীয়টি, প্রতাপ মজুমদারকে উপদেশ দান। ভালবাসতেন কি না এঁদের! কিন্তু ঝগড়াতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন ভক্তগণ, কেশববাবুর শরীর ত্যাগের পর। তাই প্রতাপ মজুমদারকে শান্তির রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, এ-সব ছেড়ে দিয়ে এখন ঈশ্বরে মন দাও, অনেক তো হল! প্রতাপবাবু শুনে হয়তো অবাক হয়ে গেলেন এই ভেবে — 'পরমহংস মশায়' বলেন কি? তবে কি এতদিন যা করলুম তা সব ধর্ম নয়? ধর্ম তা'হলে কি?

ধর্মের কথা বলা, কাগজে লেখা, বক্তৃতা দেওয়া এ-সব ধর্ম নয়। যাতে ভগবানে ঠিক ঠিক মন যায় তাকেই বলে ধর্ম। ধর্মাচরণ করলে, যথার্থভাবে ভগবানে বিশ্বাস, ভক্তি সুদৃঢ় হয়। ঠাকুর স্পষ্ট কথায় বললেন, 'এখন সব মনটা কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরকে দাও — ঈশ্বরেতে ঝাঁপ দাও।'

আর একটা মস্ত বড় কথা পাওয়া গেল আজকের পাঠে। ঠাকুর বলছেন, 'শক্তি মানলে নাস্তিক হয় না। এ জগতের পিছনে যে একটি মহাশক্তি রয়েছেন এটা বোধ হলে আর নাস্তিক কি করে হবে?'

শুনতে পাওয়া যায় সায়েন্সের আলোচনা করে অনেকে এই মহাশক্তিকে বুঝতে পেরেছে, যারা মহাসংস্কারবান। অন্তরে বুঝতে পারলেই হলো। সেই শক্তির কাছে আপনিই মাথা নত হয়ে যাবে। মুখে নাই বা বললে। ঠাকুরের মহাবাক্য রয়েছে — লংকা না জেনে খেলেও ঝাল লাগবে। শিশু মুখে 'বাবা' না বলতে পারলেও বাপ বুঝতে পারে শিশুর স্নেহদৃষ্টি দেখে।

কলিকাতা, ১০ই আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ।
রবিবার, রাত্রি দশটা।

সপ্তদশ অধ্যায়

অস্পৃশ্য রস্‌কের উদ্ধার

মর্টন স্কুল। রাত্রি প্রায় আটটা। শ্রীম দ্বিতলের সিঁড়ির পাশের ঘরে বসিয়া আছেন চেয়ারে পশ্চিমাস্য। দক্ষিণ দিকের পশ্চিমের দরজায় পিছন দিয়া গোপাল কবিরাজ শ্রীম-র শরীর পরীক্ষা করিতেছেন। কিছুকাল ধরিয়া শ্রীম বাঁ হাতে ও পিঠে বাতের বেদনায় ভুগিতেছেন। তাই বড় জিতেন গোপালবাবুকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ শ্রীম খুব কম ব্যবহার করেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মাঝে মাঝে ব্যবহার করেন। কিন্তু তিনি আয়ুর্বেদের উপর অধিক বিশ্বাসবান। শ্রীম বলেন, আয়ুর্বেদ এদেশের শরীরবিজ্ঞানের অনুকূল। অত উগ্র নয়। আর ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত।

গৃহমধ্যে ভক্তগণ উপবিষ্ট বেঞ্চেতে — শুকলাল, ভৌমিক, বড় জিতেন, জগবন্ধু, গদাধর, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, সিলেটের রজনী প্রভৃতি। ভবানীপুর হইতে দুইজন ভক্তসহ মন্মথবাবু আসিয়াছেন। জগবন্ধুর একজন বন্ধু — উপেন দত্ত রেঙ্গুনের ফেরৎ শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

বড় জিতেন ঠাকুরের অসুখের কথা উত্থাপন করিলেন। ভক্তদের সেবা, চিকিৎসা, ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের ঠাকুরের উপর ভক্তি — এই সব কথা ভক্তগণ আলোচনা করিতেছেন।

ভগবদ্ভক্তিতে জাতিভেদ যায়। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, হরিনাম প্রচার করিলে অস্পৃশ্যতা দূর হইয়া যাইবে। গান্ধীজী রামনাম প্রচার করিয়া অস্পৃশ্যতা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইনি মেথরদের সঙ্গে থাকেন, তাদের ভালবাসেন — এই সব নানা কথাও হইতেছে।

মন্মথ (শ্রীম-র প্রতি) — আজকাল কংগ্রেস মেথরদেরও

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার করছে।

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, তিনি নিজের মাথার চুল দিয়ে রস্‌কে মেথরের বাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করেছিলেন। আর কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'মা, আমি ব্রাহ্মণ, এই অভিমান বিনাশ কর!'

তাঁর সব আচরণ লোকশিক্ষার জন্য — symbolic (দৃষ্টান্ত স্বরূপ) সব। এই করে দেখালেন, মানুষ মাত্রেই ভগবানের অধিষ্ঠান, অতএব প্রিয়। যদি বল, ভগবান তো সর্বজীবেরও অধিষ্ঠান। তবে মানুষে কেন এই মর্যাদা প্রদান? তার কারণ মানুষে প্রকাশ অধিক। মানুষের মধ্যে আবার ভগবদ্ভক্তের ভিতর অধিক প্রকাশ।

যে দিন ঠাকুর এই নর্দমা পরিষ্কার লীলাটি করেছেন সেদিন থেকেই তাদের সূক্ষ্মরূপে উপরে উঠিয়ে দিয়েছেন। সমাজে ধীরে ধীরে তার প্রতিক্রিয়া হবে। ধীরে ধীরে তারা সমাজে সমান মর্যাদা পাবে। বহুকালের সঞ্চিত কুসংস্কার একদিনে যায় কি করে! ওটা থাকা উচিত নয়, ঠাকুরের এই আচরণের এই অর্থ। থাকবেও না, থাকতে পারেও না। তাই আজকাল এ-সব হচ্ছে কমিশনারাদি।

তিনি যে কি বস্তু ছিলেন তা কি আমরা বুঝতে পারি? তিনি যতটা যাকে বোঝান সে ততটাই বুঝতে পারে। এর বেশী নয়। তাঁরই মহাবাক্য, এক সের ঘটিতে দশ সের দুধ ধরে না।

ঠাকুরের জীবনের প্রত্যেকটি কার্য ভারতের নানা সমস্যার সমাধান সূচক। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হবে।

তিনি আদর্শে লীন থেকে দেখাতেন, মানুষের করা উচিত কি। সর্বদা প্রায় সমাধিস্থ। নিচে মন এলে দিবানিশি মুখে 'মা, মা' বাণী। একবার সমাধি হলেই মানুষ কৃতকৃত্য হয়। আর ঠাকুরের জীবনে সমাধির ঝড় বয়ে যাচ্ছে যেন। অত বেশী বেগ এই সমাধির — তাই মানুষভাবে বলছেন, 'মা, বেহুঁশ করো না'। এই সমাধির প্রতিক্রিয়াতে স্নায়ুমণ্ডল বিমর্দিত হয়ে যায়। তাই এই প্রার্থনা।

ঠাকুর মায়ের হাতে যন্ত্রবৎ যেন পুতুল। কেন করলেন এ-সব লীলা? দেখাতে — মানুষ মাত্রেই মায়ের হাতে পুতুলবৎ, 'যন্ত্রারূঢ়াণি

মায়য়া’ (গীতা ১৮/৬১)।

অত উঁচুতে থেকেও সংসারের দিকে দৃষ্টি রয়েছে। সাততলা থেকে নেমে একতলায় আসছেন — যেন নৌকোর বাইচ্ খেলছেন। সমাধি থেকে নিচে নেমেই দৃষ্টি পড়েছে অন্তরঙ্গদের উপর — কেন? এরা যে মায়ের চিহ্নিত লোক — অবতার-লীলার সহকারী কর্মী! তারপর বহিরঙ্গ ভক্তদের উপর দৃষ্টি, যেমন ব্রাহ্মভক্তগণ। তারাও অনেকে তাঁর কৃপায় কৃতকৃত্য হয়েছে। তারপর দৃষ্টি অভ্যাগত ভক্তদের উপর। এ-সব ভক্ত কখনও এসে পড়লো, যেমন খ্রীস্টান ভক্ত মিশ্র সাহেব। শুনেছি এইরূপ মুসলমান আদি নানা ধর্মের অনেক ভক্ত ঠাকুরের কাছে এসে কৃতকৃত্য হয়ে গেছে। তখন অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ভক্তগণ আসে নাই। এঁড়েদার কে একজন পন্ডিত এইরূপ অভ্যাগত ভক্তদের বিষয়ে একখানা পুস্তক সংকলন করেছিলেন। তা’তে খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের, নানা ধর্মের সাধকদের কথা ছিল। ছাপা হয় নাই, হাতের লেখা পুস্তক ছিল। নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর কাছে সকল ধর্মের সাধকের অবারিত দ্বার ছিল।

তার পরের কাজ আরও সামাজিক কতকগুলি জটিল সমস্যার সমাধান করা। অধর সেনের বাড়িতে ঠাকুর এসেছেন, খাওয়া দাওয়া হবে। কেদার চাটুয্যে বুঝতে পেরে পলায়নের চেষ্টা করছেন। অধর জাতিতে সুবর্ণ বণিক। তাঁর বাড়িতে খেলে ব্রাহ্মণ-সমাজে একঘরে হতে হবে, ভয়। ঠাকুরও তেমনি লোক, বুঝতে পেরেই বললেন, চল গো, চল সব, আসন পাতা হয়ে গেছে। কেদার চাটুয্যে তখন বাধ্য হয়ে খান। আর ক্ষমা প্রার্থনা করেন এই বলে, যেখানে প্রভু আহার করেন সেখানে আমি কোন ছার? আবার কেশব সেনের বাড়ি নিজে খেয়ে এলেন। কে খাওয়ালে তার ঠিক নাই। বাবুর্চি — কি জাত তার খবর নেই।

বাগদীকে দিলেন শ্বশুরের সম্মান, যে নিরাশ্রয় মা ঠাকরুণকে রাস্তায় আশ্রয় দিয়ে তাঁর সেবা করেছিল।

ব্রহ্মে লীন থাকলেও জগতের কল্যাণকর কাজের উপর দৃষ্টি

রাখতেন। তা রাখবেন না তো কি — জগৎও যে তাঁরই! তিনি সর্বদা দেখতেন, ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন। একে তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থা বলতেন। এক একবার দৃষ্টি নিচে নামিয়ে সমাজের সমস্যাগুলির সমাধান করে দিতেন নিজের আচরণ দিয়ে। কিন্তু মন ব্রহ্মে লীন। 'True to the kindred points of heaven and earth'। কবির চাতকের ন্যায় ঈশ্বর ও জগতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন ঠাকুর। সকল অবতারেরই স্বভাব এই। তাঁদের জীবনে সকল contradictions-এর (বিরুদ্ধ ভাবের) সমন্বয় হয়। দু'টি extreme points (শেষ প্রান্তে) — ব্রহ্মে ও জগতের খুঁটিনাটিতে, অবতারগণ বিচরণ করেন।

ঠাকুরের প্রধান কাজটি ছিল ভারতের ও জগতের সমষ্টি মনটিকে ব্রহ্মে তুলে ধরা। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন করা, নিজে ঈশ্বর হওয়া — এই উচ্চ ভূমিতে মনটিকে রাখতে পারলে নিচের সমস্যাগুলি মন থেকে আপনি খসে পড়ে যায় — কুসংস্কারগুলি, সমাজের তৈরি বিষয়গুলি, রাগদ্বেষের সৃষ্টিগুলি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে কাজ করতো একটি মেথর, নাম রস্‌কে (রসিক)। ঠাকুর গল্প করতেন, 'একদিন সে আমায় জিজ্ঞাসা করলো, প্রভো, আমার কি উপায় হবে'? সে নিজের বাড়িতে তুলসী-কুঞ্জ করে ওখানে বসে ভজন করতো। একদিন স্ত্রীকে বললো দুপুর বেলা — ছেলেদের ডাক। আমাকে ঐ তুলসী-কুঞ্জে নিয়ে শুইয়ে দাও। সে তখন ঠাকুরের নাম ক'রতে ক'রতে সজ্ঞানে শরীর ত্যাগ করলো।

এ-সব লীলা মানুষ বুঝবে কি করে? রসিক একজন মহাপুরুষ। শুধু কি সে ঠাকুরকে দর্শন করেছিল অনেকদিন ধরে — আবার তাঁকে চিনেও ছিল! তাঁর কত কৃপায় তবে সে চিনতে পেরেছিল। চিনেছিল — ভগবান নরদেহ ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি আমার জন্ম মরণের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন। তবেই না প্রার্থনা করেছিল — প্রভো, আমার কি উপায়

হবে! তাকে অমৃতত্ব প্রদান করলেন। কই তাকে তো প্রত্যাখ্যান করেন নাই মেথর বলে! যে দৃষ্টিতে উচ্চকুলসম্ভুত ভক্তদের দেখেছিলেন সেই করুণার স্নেহময় দৃষ্টিতে তাকেও দেখেছিলেন। ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে গেলেন। তা তিনি করবেন না তো কে করবে? তিনি যে জন্ম জন্মান্তরের পিতা। পিতামাতার দৃষ্টি সকল সন্তানের উপর সমান।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — কেশব সেনকে ব্রাহ্ম ভক্তরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন — পরমহংসমশায় কিরূপ সাধু? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ইনি ক্রাইস্ট, গৌরাঙ্গের ক্লাসের লোক। বলেছিলেন, সারা জগতে অমন লোক আর দেখি নাই। এঁকে কাঁচের আলমারীর ভিতর পুরে রাখা উচিত — অমূল্য বস্তু। কেশব সেনের উপরও অপার কৃপা হয়েছিল। তবেই তো ঐ মহান উক্তি!

আবার আর একটা দিক দেখুন। যদু মল্লিকের বাড়িতে দু'হাজার লোক বসেছে। সভা হচ্ছে। কেশব সেনও এসেছেন। সেই সভার মাঝে ঠাকুর খুঁচিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, — 'আমার কতখানি জ্ঞান হয়েছে বল'। বার বার জিজ্ঞাসা করায় কেশববাবু with diffidence (সন্দিগ্ধ চিত্তে) বললেন, ষোল আনা। তখুনি ঠাকুর উত্তর করলেন, 'তোমার কথা ল'তে পারলাম না। তুমি টাকাকড়ি, মানসম্ভ্রম, কামিনী কাঞ্চন নিয়ে রয়েছ। নারদ, শুকদেব বললে বরং বিশ্বাস হতো।'

যে কেশববাবু বললেন, ইনি ক্রাইস্ট গৌরাঙ্গের ক্লাসের লোক, সেই কেশববাবুকেই বললেন, 'তোমার কথা ল'তে পারলাম না।' কেন এরূপ বললেন — তাঁকে অপমান করার জন্য কি? নিশ্চয় না। হক্ কথা সময়ে সময়ে বলতেন জীবের কল্যাণের জন্য। তবে তো তফাৎ ধরতে পারবে? কত ভালবাসা কেশববাবুর উপর! কেশববাবুর শরীর চলে গেলে কেঁদেছিলেন, আর তিনদিন চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন। কত ভালবাসায় এরূপ হয়!

২

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — ব্রাহ্ম সমাজের ওরা বলতো ঠাকুর একজন সাধারণ সাধু। এতে একজন ভক্ত তাদের উপর খুব রাগ করেছে। ঠাকুর শুনে বললেন, 'আঁ, ওদের উপর অত চট কেন? রাগ করতে নেই। সবে কি ঠিক দাম দিতে পারে?' তারপর এই গল্পটি বললেন ঃ

একজন একটা মানিক নিয়ে গেল বাজারে বেচতে। বেগুনওয়ালা বললে, 'ন'সের বেগুন দিতে পারি এর দাম। মানিকওয়ালা বললে, না আর এক সের বাড়িয়ে দশ সের করে দাও। সে উত্তর করলে, না, এর বেশী দেওয়া যাবে না। ইচ্ছা হয় দাও, নইলে নিয়ে যাও। তারপর সে গেল কাপড়ওয়ালার কাছে। সে দেখে বললে, এর দাম ন'শ টাকা দিব। আরও একশ' বাড়িয়ে দশ শ' কর দাও মানিকওয়ালা বললে। কাপড়ওয়ালা তাতে রাজী হলো না। তখন মানিক নিয়ে গেল জহুরীর দোকানে। সে দেখেই এর দাম এক লাখ টাকা দিয়ে দিল।

তেমনি মানিক চিনে জহুরী। বেগুনওয়ালা, কাপড়ওয়ালার কর্ম নয়!

অবতারকে কি চিনতে পারে মানুষ? ব্রাহ্ম ভক্তদের দোষ কি? তারাও তো মানুষ! তারা চিনবে কি করে? তবুও তো সাধু বলে ধরতে পেরেছে — একজন সাধারণ সাধু। (সকলের হাস্য)। (সকলের প্রতি) না, এ হাসবার কথা নয়। কারো সাধ্য নাই অবতারকে চিনে। আমরাই কি তাঁকে চিনতে পারতুম তিনি না চিনালে — অসম্ভব একেবারে অসম্ভব! কেশববাবু, বিজয় গোস্বামী চিনেছিলেন তাঁকে তাঁর কৃপায়।

রামচন্দ্রকে চিনেছিলেন মাত্র দ্বাদশ জন ঋষি — ভরদ্বাজাদি। অন্য ঋষিরা বললেন, ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার বলে; কিন্তু আমরা তোমাকে অবতার বলতে পারবো না। তুমি একজন মহাজ্ঞানী, একজন বড় সাধু — এই বলে আমরা তোমাকে গ্রহণ করি। কিন্তু ঈশ্বর বলে নিতে পারি না। আমরা চাই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে

যিনি বাক্য মনের অতীত!

দেখুন না, অত বড় জ্ঞানী সব ঋষি, অনেকের আত্মদর্শন হয়েছে, তবুও চিনতে পারলো না ঐ আত্মাকে — যখন মায়াকে আশ্রয় করে মানুষ রূপে অবতীর্ণ হলেন তাঁদের কাছে। কি করে চিনবে, মায়ার মুখোস পরা যে! পরদাটা টেনে নিলে চিনতে পারে। মানুষের কাছে অবতারবাদটা একটা insoluble contradiction, the grandest mystery — (চিরন্তন বিরোধ, সর্বশ্রেষ্ঠ গোলক ধাঁধা)।

গোপাল কবিরাজ — আমার মনে একটা সংশয় ওঠে সর্বদা। স্বামীজী ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হয়েও কেন বললেন, আমার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে, ঈশ্বরের জন্য অনশন করবো! বরানগর মঠের বিবরণ প্রসঙ্গে 'কথামৃতে' এ-সব কথা পাওয়া যায়। আবার শোনা যায়, পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নিতে গিছলেন। এসব কি করে সম্ভব হয়?

শ্রীম — এতে আর অসম্ভব কি, কি-ই বা আশ্চর্য! স্বামীজী কত বড় আধার মনে করুন! ঠাকুর বলতেন, দিঘির মধ্যে নরেন্দ্র সায়র দিঘি। মাছের মধ্যে রুই মাছ, বাঁশের মধ্যে বড় ফুটোয়ালা বাঁশ। তাতে অনেক জিনিষ ধরে। আর ফুলের মধ্যে নরেন্দ্র শতদল পদ্ম। পদ্মফুল ফুটতে লাগে পনর দিন। অন্য ফুল আজ ফুটলো কালই ঝরে পড়লো। পদ্মফুল ফুটে চারিদিক আমোদিত করে আর বাসি হয় না। তাই এ সব বিরুদ্ধ ভাবনা স্বামীজীর ভিতর।

লোকশিক্ষা দিবেন যে স্বামীজী। তাইতো তাঁকে নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে নিয়ে গেছেন ঠাকুর। তবে তো বুঝতে পারবে অপরের অবস্থা — তাদের সংশয় দুঃখ জ্বালা সব! নিজের সব রকম experience (অভিজ্ঞতা) না থাকলে লোকশিক্ষা হয় না। স্বামীজী type of man (আদর্শ মানুষ) কিনা — নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। স্বামীজীর প্রাণের এই জ্বালা, সংশয় মাত্র symbolic (দৃষ্টান্তস্বরূপ)। জীবের জ্বালা, সংশয় পদে পদে।

স্বামীজী বলেছেন প্রায়োপবেশন করবেন, কেন? এতে দু'টি কাজ হবে। একটি, সকলে শিখবে ভগবানের জন্য সব করা যায়। দ্বিতীয়,

স্বামীজীকে ঠাকুর ঈশ্বরদর্শন করিয়ে দিয়েছেন। সেই দর্শনটি জীবনের প্রতি মুহূর্তে কাজে লাগাতে পারবে, জাগ্রত অবস্থাতে ঐ দর্শনের আনন্দ উপভোগ করতে পারবে, এই জন্য ঐ ব্যাকুলতা। আর পওহারী বাবার কাছে গিছলেন সত্য, কিন্তু দীক্ষা নিতে সঙ্কল্প করেছিলেন, এ কথা আমাদের বিশ্বাস হয় না। স্বামীজীকে ঠাকুর বলেছিলেন, তুই এরই ভিতর চিকিৎসক হয়ে গিয়েছিস। নানা অবস্থা জানা থাকলে ঔষধ প্রয়োগের সুবিধা হয়।

চৈতন্যদেবের জীবন দেখুন। কত পড়লেন ন্যায়, বেদান্ত, ব্যাকরণ কত কি! ষোল বছর বয়সে ভারত বিখ্যাত কেশব কাশ্মীরীকে পরাস্ত করলেন। তার পরের অবস্থায় সব ত্যাগ করলেন। তিনি ন্যায়ের এক অদ্বিতীয় টীকা লিখেছিলেন। বন্ধু রঘুনাথও টীকা লিখেছিলেন। চৈতন্যদেবের টীকা শুনে রঘুনাথ বললেন, তোমার টীকা থাকতে আমার টীকা কেউ পড়বে না। এই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ ঐ টীকা গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি, খ্যাতি, পত্নী, জননী সব ত্যাগ করলেন। আর এক অবস্থায় এগুলি আবার কাজে লেগেছিল। সার্বভৌম, প্রকাশানন্দ, রূপ, সনাতন তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সকলে আধ্যাত্মিকতার দাম দিতে পারে না। কি করে দেয়, চিনলে তো? তাই শুরু করে গুণ থেকে, বিদ্যা থেকে। গুণকে ধরে ধরে শেষে যায় আসল জায়গায়, আধ্যাত্মিক পরিচয়ে। বিদ্যার সঙ্গে, নানা গুণের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা থাকলে প্রচারের সুবিধা হয়। 'নিজের প্রাণ শুধু নরুনেই নেওয়া যায়। অপরকে মারতে হলে ঢাল, তরোয়ালের দরকার হয়,' — ঠাকুর বলতেন।

বড় আধারে এ-সব সংশয় হয়। পিটারকে দেখুন না। তাঁর সম্বন্ধে ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'Upon this rock I will build my church' (St. Matthew 16:18) — এই বিশ্বাসের পাহাড়ের উপর আমার ধর্মমন্দির রচনা করবো। এই বিশ্বাসের পাহাড়কে কত সংশয়, লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। ক্রাইস্ট বললেন, সব ছেড়ে

আমার সঙ্গে চলে এসো। অর্থাৎ সন্ন্যাস নিতে বললেন। তাঁর দেহ বুদ্ধি রয়েছে। তাই বললেন, আপনার সঙ্গে গেলে খাব পরবো কি? আবার দেখ, প্রাণের মায়ায় ক্রাইস্টকে তিনবার অস্বীকার করলেন, জজের বাড়িতে, গুরু বলে। এমনি কাণ্ড মহামায়ার — ঠিক সাধারণ মানুষের ব্যবহার। এ-সব দুর্বলতা, দুঃখ জ্বালার অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তাঁরা ঠিক ঠিক আচার্য হয়েছিলেন — জীবের দুঃখ দূর করবার জন্য নিজের জীবনের প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত প্রদান করেছেন — এমনি ত্যাগ!

স্বামীজীরও এই-ই অবস্থা। নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে নিয়ে তবে চিকিৎসক বানালেন ঠাকুর। তবে জগতের ও ভারতের লোকের দুঃখ দূর করতে গিয়ে নিজের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত দান করলেন নারায়ণ সেবায়।

স্বামীজীরূপ পদ্মফুলটি যখন ফুটলো তখন তার সৌরভে দিঙমণ্ডল সুবাসিত হলো। একবার পড়ে দেখুন তাঁর লেখা স্তবস্তুতিগুলি। আবার লেকচারগুলি পড়লে যেন মরা মানুষ জীবন্ত হয়ে ওঠে — অমনি তেজ, অমনি প্রাণবন্ত কথা।

অবতার ও পার্ষদগণের ভিতর দু'টি স্পষ্ট মানুষ দেখা যায়। একটি যেন সাধারণ মানুষ সুখদুঃখময়। আর একটি দেবমানুষ— সদানন্দময় পুরুষ। মানুষের ষোল আনা দুর্বলতাও রয়েছে, আবার সকল দুর্বলতার ঊর্ধ্বের চৈতন্যময় ভাবও রয়েছে। এ-সব যা দেখছেন স্বামীজীতে সবই মানুষভাবের বিকাশ। আবার চৈতন্যময় ভাবও দেখুন। পাদ্রীরা যখন বড্ড জ্বালাতন করেছিলেন আমেরিকায় তখন বলেছিলেন, কি আমাকে এই দুগ্ধপোষ্য শিশুরা ভয় দেখিয়ে জব্দ করতে চায়, কি আশ্চর্য! আমি নির্বিকল্প সমাধিবান। এই সমগ্র জগৎকে তুচ্ছ এক খণ্ড তৃণের মত দেখছি। মেকলাউডকে লিখেছিলেন, আমি সমস্ত জগৎকে কিরূপ দেখছি জান? সব সচ্চিদানন্দময়। জীব, জন্তু, বৃক্ষলতা সব সচ্চিদানন্দে মোড়া। ঠাকুরও দেখতেন — সব সচ্চিদানন্দের তৈরি। বলেছিলেন, 'সব মোমের তৈরি দেখালেন মা।'

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের তৈরি।

অবতার ও পার্ষদগণের নিজেদের কোন সমস্যা নাই। তাঁরা ভাবেন, দেহ ধারণ করলে আমাদেরই এই অবস্থা, এই সংশয়,এই দুঃখ, সাধারণ জীবের না জানি কত কষ্ট দুঃখ লাঞ্ছনা! তাই তাঁরা জীবের দুঃখে কাতর হন। আত্মদর্শন তো হয়ে গেছে, নিজেদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এখন খালি জগতের লোকের কল্যাণের জন্য কাজ করা। স্বামীজীকে ঠাকুর দয়া দিয়ে বেঁধেছিলেন নির্বিকল্প সমাধির পর। তা নইলে কাজ করে কে জগতের জন্য! তাই প্রার্থনা করেছিলেন, 'মা, বাঁধ নরেনকে, মায়া দিয়ে বাঁধ।' দয়া, বিদ্যামায়ার ঐশ্বর্য, তাই দিয়ে বেঁধেছিলেন। তবে জগৎ উদ্ধার কার্যটি হল। ঠাকুরের নিজের শরীর, মন শুদ্ধসত্ত্বগুণময়। তা দিয়ে রজের কাজ হয় না। তাই বলেছিলেন, মা এটা (স্বামীজীর শরীর) দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন।

সাধারণ জীব দুঃখসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। জন্ম জন্ম ধরে। তাদের উদ্ধারের জন্য মহাপুরুষগণ, পিটার, স্বামীজী, এঁরা করুণায় যেন উন্মাদ! আর জীবকে দুঃখসমুদ্র পারের মহামন্ত্র ভগবানের নাম, ছড়িয়ে দিয়ে যান। বলেন, এই নামরূপ ভেলা ধরে সংসার সমুদ্রে ভাসতে থাক। তাহলে দুঃখসমুদ্র আরামে পার হয়ে যাবে। অবতারের নাম ও রূপ — ঐ ভেলা। এই নাম চিন্তা কর, জপ কর, এই রূপ ধ্যান কর সর্বদা। তবেই সংসারের সকল জ্বালায় অবিচলিত থাকবে, আর অন্তিমে পরমানন্দ লাভ হবে।

পওহারী বাবার কাছে স্বামীজী গিছলেন নিশ্চয়। তা যাবেন না কেন? প্রাচীন সাধু। কিন্তু দীক্ষার জন্য গিছলেন, পূর্বে যা বলেছি, আমার বিশ্বাস হয় না। কেউ কেউ বলে বটে ঐ কথা। আর যদি বলা হয়, না দীক্ষা নিতেই গিছলেন, তাতেও আশ্চর্য নাই। এতেও শিক্ষালাভ করেছেন স্বামীজী। অতবড় মহাপুরুষ হয়েও যদি স্বামীজীর গুরু সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়ে থাকে, তবে সাধারণ লোকের গুরুনিষ্ঠা যে কি কঠিন ব্যাপার তা স্বামীজী বুঝতে পেরেছেন। তবেই

তো নিজের ভক্তদের উপর, জগতের লোকের উপর করুণার দৃষ্টি রাখতে পারবেন। ভাবতে পারেন — আমারই যদি এইরূপ সংশয় হয়, তবে অপরের তো হতেই পারে। তাই ভুল ত্রুটির জন্য, মন্দনিষ্ঠার জন্য ক্ষমাশীল হবেন।

স্বামীজী প্রভৃতি অবতারের পার্ষদগণ তো নিজেদের মুক্তির জন্য আসেন নাই! তাঁরা এসেছেন জগতের লোকের কল্যাণের জন্য — সকলের মুক্তির জন্য। সকলের সকল অবস্থা বোঝাবার জন্য তাঁদের চরিত্রে এই সব contradictions (বিরুদ্ধ ভাবের মিলন) দেখা যায়।

চৈতন্যদেবের পার্ষদ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ। শোনা যায় তাঁদের শেষে দুটো দল হয়েছিল। এ সব বৈচিত্র, দ্বন্দ্ব আসে মহাপুরুষদের জীবনে। এতে এঁদের মন নিচে নামে না — majestic heights-এ (ঈশ্বরেই) থাকে।

৩

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন।

একজন ভক্ত — চৈতন্যদেব, রায় রামানন্দকে খুব ভালবাসতেন — গৃহস্থ ভক্ত, তবুও।

শ্রীম (খানিক পর) — তা ভালবাসবেন না? কতবড় প্রেমিক ভক্ত! উচ্চস্তরের 'রস' (প্রেমানন্দ) চৈতন্যদেব তাঁর সঙ্গে উপভোগ করতেন। ইনি সাড়ে তিন জন রসিক ভক্তের একজন। স্বরূপ দামোদর আর একজন রসিক ভক্ত। ইনি সন্ন্যাসী। শিখি মাইতি আর একজন, আর তাঁর ভগিনী মাধবী দেবী একজন। মাধবী দেবীকে বলা হতো আধখানা রসিক ভক্ত। ইনি অশীতিপর বৃদ্ধা। এই সাড়ে তিনজন রসিক ভক্ত-সঙ্গে গোপী প্রেমের রস আস্বাদন করতেন।

রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রথম পরিচয় গোদাবরী তটে রাজামহেন্দ্রীতে। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। চৈতন্যদেব হরিকথায় কয়েকদিন অতিবাহিত করেন রামানন্দ রায়ের

সঙ্গে। একদিন সাধ্যসাধন বিচার হয়েছিল। জীবের সহিত ঈশ্বরের নানাবিধ সাধ্য সম্বন্ধের কথা প্রসঙ্গে রায় নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির কথা বলতে বলতে যেই গোপী প্রেমের কথা উল্লেখ করলেন অমনি চৈতন্যদেব বিহ্বল হয়ে রায়ের মুখ চেপে ধরলেন। মানে এর পর আর নাই আদর্শ! এর পরের কথা মুখে বলা যায় না! মহাভাবে সব একাকার! চৈতন্যদেব বেহুঁশ হয়ে যাবেন মহাভাবে, আর কিছু বললে। তাই বারণ করলেন অগ্রসর হতে। গোপীদের কি প্রেম ভগবানের জন্য! সর্বস্ব আপনি ত্যাগ হয়ে গেল। বিচার করে করেন নাই ত্যাগ। বসন্তকালের ঝরা পাতার মত আপনি সকল বন্ধন খসে গেল।

চৈতন্যদেব তারপর রামেশ্বর যাত্রা করলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আমি দক্ষিণ তীর্থ শেষ করে পুরীতে আসছি। আপনিও তখন একবার পুরী আসুন। তখন দু'জনে মিলে হরিনাম মহোৎসব করা যাবে। কত ভালবাসা রায়ের উপর। তা হবে না — রায় রামানন্দের যে ভিতরে পূর্ণ সন্ন্যাস। গৃহে থেকে ভিতর ফাঁক, পূর্ণ সন্ন্যাস, এমন আরও ভক্ত ছিলেন চৈতন্যদেবের — অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শিবানন্দ সেন, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, সার্বভৌম, মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি।

ঠাকুর বলেছিলেন, আমি আর গৌরাঙ্গ এক। একদিন বসে বসে 'গৌর গৌর' নাম করছেন গুনগুন করে। একজন বললে, আপনি মায়ের নাম করুন, 'গৌর গৌর' করছেন কেন? ঠাকুর তক্ষুনি উত্তর করলেন, কি আর করি বাপু বল। তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ — স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, টাকাকড়ি, কিন্তু আমার এই এক অবলম্বন। তাই কখনও গৌর বলি, কখনও মা, কখনও রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, এই করে সময় কাটাই (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর নিজের অবস্থার ইঙ্গিত করতেন 'অশোক বনে সীতা'র অবস্থা বর্ণনা করে। হনুমান সীতাকে দেখে এসে রামকে বললেন, দেখে এলাম কয়খানা হাড় পড়ে আছে। আর যম আনাগোনা ক'রছে। রাম জিজ্ঞাসা করলেন কেন? যম তো স্থূল দেহ নেয় না — সূক্ষ্ম

দেহ নেয়। সূক্ষ্ম দেহের মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার সব তাঁর পাদপদ্মে সমর্পিত। তাই যম আর কি করে, আনাগোনা করছে। ঠাকুরেরও এই অবস্থা — সর্বদা মা মা, কখনও একেবারে নির্বিকল্প অবস্থা। আমরা চব্বিশ ঘন্টা watch (পর্যবেক্ষণ) করে দেখেছি এক নিমেষের জন্যও ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত হন নাই। নিদ্রার সময়ও নিঃশ্বাসের সঙ্গে অজানা ভাবে, 'মা মা' বলছেন। অবতারাদি ছাড়া এ অবস্থা সম্ভব হয় না জীবে।

আহা, কি কথা সব! এ সব দুর্লভ কথা ভাববারও অবসর নাই লোকের। বুদ্ধি দিয়ে এসব চিন্তা করলে মানুষ একেবারে দেবতা হয়ে যেতে পারে। তখন বুঝতে পারবে নিজে কোথায় রয়েছে। নিজের হীন অবস্থা বুঝলেই অন্তর ভেদ করে প্রার্থনা স্বতঃই হতে থাকবে। তা দ্বারা যুক্ত হয়ে অনায়াসে দেবভূমিতে আরোহণ করবে। এই ভাবে ঈশ্বরীয় ধ্যান সহজ ও স্বাভাবিক। তারই জন্য ভগবান অবতার হয়ে আসেন যাতে ভক্তরা তাঁর জীবন চিন্তা, বাণী চিন্তা দ্বারা দেবত্ব লাভ করতে পারে। এটা সহজ পথ।

গোপাল কবিরাজ — আচ্ছা, হরমোহনের শেষটা কেমন হয়ে গেল?

শ্রীম — সবই লোকশিক্ষার জন্য হয়। মানুষ এসব দেখে সাবধান হবে যাতে self complacence (আত্মতুষ্টি) না আসে। তারও বাড়া, তারও বাড়া আছে। ভক্তরা কি লোক খারাপ? ঠাকুর নানা অবস্থা বোঝাবার জন্য ভক্তদের জীবন এরূপ করেন। ঠাকুর হরমোহনের গল্প করতেন — অনেকদিন সে আসে না দেখে খবর নিলুম। শুনলুম, মামা ধরে বিয়ে করিয়ে দিয়েছে। মামার বাড়িতেই থাকতো। একজনকে পাঠালাম বলে আসতে, একবারটি দেখা করে এসে। লোক ফিরে এসে বললে, হরমোহন এখন মাগের গোলামী করছে। মামাদের সঙ্গে পৃথক হয়ে গেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এখন তাকে সবই করতে হচ্ছে কিনা — বাজারহাট করা, আবার বাড়ি আগলান! ঠাকুর বলেছিলেন,

অনেক দিন পর একবার এসে দেখা করেছিল। দেখলাম, সংসার তার সব হরণ করে ফেলেছে। আগে যা সব ভাল জিনিস ছিল সে সব খুইয়েছে। এমনি মহামায়ার খেলা!

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এ সবই ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে কি না পারেন? এর এই অবস্থা করলেন, লোকশিক্ষার জন্য — object lesson. যা উপদেশ দিতেন সেই সব মূর্তি গ্রহণ করেছে। ভাল কথাও মূর্তি ধারণ করে। আবার এই সবও আছে। ঠাকুর ভক্তদের শিক্ষা দিলেন, সর্বদা ভগবানের সহিত যুক্ত হয়ে, শরণাগত হয়ে না থাকলে এই সব দুরবস্থা প্রাপ্ত হয় — চোখের সামনে একেবারে ধরে দেখালেন। শুধু উপদেশ দেন না অবতার! তাঁর কথার সুফল, পালন না করলে কুফল, এই দুইই চোখের সামনে ধরেন।

গোপাল কবিরাজ — ঠাকুর পাশের বাড়িতে গেছেন, তবুও হরমোহন এসে দেখা করেন নাই — এমনি মোহ!

শ্রীম — কেন, শুধু চোখে দেখলেই বুঝি দেখা হল? সবগুলি ইন্দ্রিয় দিয়েও দেখা যায়। মন বুদ্ধি আদি অন্তর ইন্দ্রিয় দিয়েও দেখা যায়। কীর্তনের শব্দ কানে গেলেও দেখা হল। অপরের মুখে ঠাকুরের মুহুর্মুহু সমাধির কথা শুনলেও দেখা হয়। আবার প্রাণের ভিতরও দেখা যায়। সংসারের জ্বালায় অস্থির হয়ে তাঁর কথা ভাবলেও দেখাই হল। দেখার এই সব নানা গ্রেড আছে। তিনি যাদের ভালবেসেছেন তাদের ভাবনা কি? এ সব আচরণ দেখে ভক্তদের উপর শ্রদ্ধা হারালে নিজের ক্ষতি। তাঁরা সব মহৎ ব্যক্তি। তাঁর ভালবাসা পেয়েছেন যে! কি করবে — প্রকৃতি টেনে নিয়ে যায়। নানা রূপ, নানা ভাব ধারণ, এ যেন যাত্রার পার্টি। একজন ব্যক্তিই কখন রাজা, কখনও ভিখারী, আবার কখনও ঋষি।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা।
১১ই আগস্ট ১৯২৪ খ্রীঃ, ২৬শে শ্রাবণ ১৩৩১ সাল।
সোমবার, শুক্লা একাদশী ১২।৫৫ পল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

তীর্থ ও তপস্যা — ঋষিকেশ ও স্বর্গাশ্রম

১

মর্টন স্কুলের নূতন বৎসরের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীম উহার রেক্টার। তাই উহার তত্ত্বাবধানে সারাদিন ব্যস্ত। ছাত্র ভর্তি করা, নূতন শিক্ষক নিয়োগ করা, নূতন পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা প্রভৃতির কার্যে শ্রীম-র সমস্ত দিন অতিবাহিত হইতেছে। আজ রমণী স্কুলে নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি এম.এ. পাশ আর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, শ্রীম-র প্রিয়পাত্র।

পরিশ্রান্ত হইয়া শ্রীম চারতলার নিজের কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। এখন অপরাহ্ন পাঁচটা। শ্রীম-র অপেক্ষায় অনেকগুলি ভক্ত, কেহ ছাদে, কেহ সিঁড়ির ঘরে, বসিয়া আছেন। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বিনয়, জগবন্ধু, ছোট নলিনী, ছোট রমেশ, বলাই, 'ব্রুকবণ্ড' (যতীন), রমণী, সুখেন্দু, বিবেকানন্দ সোসাইটির ব্রহ্মচারী তারক, মোটা সুধীর প্রভৃতি আসিয়াছেন।

আজ ৭ই জানুয়ারী ১৯২৫ খ্রীঃ, ২৩শে পৌষ, ১৩৩১ সাল, বুধবার শুক্লা ত্রয়োদশী ৫৩।১৬ পল।

রাত্রি সাতটায় শ্রীম স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। সিঁড়ির ঘরে দরজার কাছে দক্ষিণাস্য চেয়ারে বসিয়াছেন। ভক্তদিগকে ভাগবত পাঠ করিতে বলিলেন। পরিশ্রান্ত থাকিলে পাঠ বা ভজন করিতে বলেন। পাঠ বা ভজন শুনিতে শুনিতে পরিশ্রম দূর হইয়া যায়। মন দেহ থেকে পরমাত্মায় মগ্ন হয়। তাই তখন যৌবনের নবীন তেজে শ্রীম ঈশ্বরীয় কথামৃত বর্ষণ করিতে থাকেন। অথবা কখনও মনোনিবেশ করাইবার জন্য পঠিত বিষয়ের অনুকীর্তন করিতে ভক্তদের বলিয়া

থাকেন।

তিনি দশম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায় বাহির করিয়া দিলেন। জগবন্ধু পাঠ করিতেছেন।

বালক কৃষ্ণ রাখালগণের সঙ্গে বাল্যলীলায় নিমগ্ন। গো ও বৎসগণসহ কৃষ্ণ ও রাখালগণ নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। বাহ্য কোন দিকে লক্ষ্য নাই। কৃষ্ণ হঠাৎ বুঝিলেন, মায়াবী অঘাসুরের আকাশপ্রসারী মুখকবলে তাঁহারা প্রবেশ করিয়াছেন। তাই নিজের দৈবী বিভূতিবলে গো, বৎস ও সখাগণসহ নিজের শরীর আকাশ প্রমাণ স্ফীত করিতে লাগিলেন। ইহাতে দম বন্ধ হওয়ায় অঘাসুর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

শ্রীম — এইরূপ বাল্যলীলা শ্রীরামকৃষ্ণও কিছু কিছু করেছেন। সখাগণের সহিত মাণিক রাজার আম্র কাননে যাত্রাভিনয় করলেন। নিজে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। শিবের পার্ট করলেন যেন জীবন্ত শিব। সুকণ্ঠ সঙ্গীতে পাড়ার কুলবধূরা বিমোহিত হলেন। গ্রাম্য বধূ সাজিয়া সকলকে ঠকাইয়া এক অভিজাত পরিবারের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। — ইত্যাদি কত লীলাই না করেছেন!

পাড়ায় কুলকামিনীরা কেন এত স্নেহ করতেন ঠাকুরকে সকলে? তা করবেন না? তিনি যে সকলের অন্তরাত্মা! নিজেকে নিজে কে না ভালবাসে। তিনিই সকলের ভিতর অন্তর্যামী। তিনিই নরদেহধারী বালক। ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, তখন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্বগণও সঙ্গে সঙ্গে আসেন লীলা সম্ভোগের জন্য। শুকদেব তাই বললেন ভাগবতে। এঁরাই সব কামারপুকুর ও দক্ষিণেশ্বরে, আর জয়রামবাটিতে এসেছেন। বৃক্ষ, লতারূপ পর্যন্ত ধারণ করেন, বললেন। শুকদেব বললেন, গোপ বালকগণ সব দেবতা, আর গো ও বৎসগণ সব ঋষি। আহা, কি সুন্দর এই সিনটি! পাঁচ বছরের কৃষ্ণ ডান হাতে দইয়ের ভাণ্ড, আর বাম হাতে ফল — দৌড়াদৌড়ি করছেন।

আপনারা এই সব চিন্তা করুন আর পাঠ শুনুন। আমরা নিচে খেয়ে আসছি।

শ্রীম আহার করিতে তিনতলায় গেলেন। এখন ডাক্তার বক্সী পাঠ করিতেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায় শেষ হইয়াছে, চতুর্দশও শেষপ্রায়। শ্রীম আসিয়া পুনরায় চেয়ারে বসিলেন। এইবার শ্রীম 'মাস্টার' হইয়া ছাত্রদের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বলুন কি শুনলেন? (পাঠকের প্রতি) কি পড়লেন বলুন।

ডাক্তার — ব্রহ্মা ভগবানের লীলার মহিমা দর্শনের জন্য যোগবলে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ ও গাভীগণকে হরণ করিলেন।

ছোট জিতেন — শ্রীকৃষ্ণ খুঁজে যখন বন্ধুগণ ও গাভীগণকে দেখতে পেলেন না তখন ধ্যানে বুঝলেন ব্রহ্মা এদের হরণ করেছেন। তখন তিনি নিজের মায়াশক্তি দ্বারা অনুরূপ গোপ বালক ও গাভীগণে পরিণত হলেন। এক বৎসর এইরূপ ছিলেন। তারপর ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হল।

ছোট রমেশ — গোপ বালকগণের মা বাপ আত্মীয়রা কেহ বুঝতে পারেন নাই যে তাঁদের ঘরে যে সব ছেলে ও গাভী আছে এরা সত্যিকার নয়। কিন্তু মাতাদের নিজ সন্তানের উপর যে মোহগ্রস্ত স্নেহ থাকে তাহা ছিল না। তার স্থলে এক সশ্রদ্ধ দৈব আকর্ষণ অনুভব করতেন।

রমণী — ব্রহ্মা বড় মুস্কিলে পড়লেন। দু' সেট গোপবালক আর গাভীর কোনটা সত্যিকার আর কোনটা কৃষ্ণের দৈবশক্তিতে বানান, বুঝতে পারছেন না। কৃষ্ণকে মোহিত করতে গিয়ে নিজেই মোহিত হলেন।

ছোট নলিনী — ব্রহ্মা সব গোপবালককে চতুর্ভুজ ও শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বৈকুণ্ঠবাসী জ্ঞানানন্দ মূর্ত্তিতে দর্শন করলেন। আর সমগ্র জগৎ কৃষ্ণময় দেখে 'একি একি' বলে সংজ্ঞাহীন হয়ে নিজ বাহন থেকে পড়ে গেলেন।

শ্রীম — বিনয়বাবু, তুমি কি শুনলে?

বিনয় (লজ্জিতভাবে) — ব্রহ্মা স্তব করলেন, হে প্রভো আপনিই

সগুণ আপনিই নির্গুণ।

মোটা সুধীর — ব্রহ্মা স্তব করে বললেন, পৃথিবীর সব পরমাণু, শূন্যের হিমকণার পরমাণু, এবং নক্ষত্রাদির কিরণসমূহের পরমাণু গণনা করা বরং সম্ভব। কিন্তু আপনার গুণ সমূহের গণনা সম্ভব নহে।

বড় জিতেন — ব্রহ্মা বললেন, এই ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর। এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের গতাগতির গবাক্ষ স্বরূপ ভগবানের, কৃষ্ণের এক একটি লোমকূপ।

ব্রহ্মচারী তারক — শুকদেব কহিলেন, হে পরীক্ষিৎ, যারা সারগ্রাহী সাধু, হরি বলাই তাদের বাক্য, কর্ণ ও অন্তঃকরণ স্বরূপ।

সুখেন্দু — বলরামও ফাঁপরে পড়ে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন যত সব গোপবালক আর গাভী সব কৃষ্ণময়।

জগবন্ধু — ব্রহ্মা স্তব করে বলছেন, হে পরমাত্মন, যাতে আপনার ভক্তগণ শীঘ্র সংসার পাশ থেকে মুক্ত হতে পারেন তজ্জন্যই আপনার নরলীলা। আপনার স্বরূপের ধ্যান করা বড়ই কঠিন। কিন্তু আপনার এই নরদেহের লীলাসমূহ দর্শন মনন ও কীর্তন করা সহজ। এতেই সর্বদা আপনার কথা ভাবতে ভাবতে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে শীঘ্র মুক্তির অধিকারী হয়। এটা অতি সহজ পথ।

২

ভক্তগণের অনুকীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা কি সব কথা! ব্রহ্মা তন্ময় হয়ে দেখলেন অখিল জগৎ কৃষ্ণময়। ঠাকুরও দেখেছিলেন, মা-ই সমস্ত জগৎ হয়ে রয়েছেন। ঠাকুর বলতেন, শিব ধ্যানে পরমব্রহ্মকে দেখে সমাধিস্থ। একটু বুত্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, ঐ পরমব্রহ্মই জীব জগৎ হয়ে আছেন। তখন বিস্ময়ানন্দে নৃত্য করতেন।

চৈতন্যস্বরূপ ভগবান এই বিশ্বরূপে বিরাজিত। নামরূপের ক্ষুদ্র আবরণে চৈতন্যের ছড়াছড়ি — চৈতন্যের হাট বাজার। 'সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

ঠাকুর বলেছিলেন, এখানে এলে গেলেই হবে। কি হবে? এই যা বললেন ব্রহ্মা — মুক্তি, সংসারপাশ থেকে মুক্তি! এ আর কি বড় কথা? ঈশ্বরে অহৈতুকী ভক্তিলাভ হয় অবতারের সঙ্গ দ্বারা। ভক্তগণ মুক্তি চায় না, ভক্তি চায়।

বলেছিলেন, এখানকার যত সব কাজ এ সবই তোমাদের শিক্ষার জন্য। এ সবই নজীর। সংসারের নানাবিধ সমস্যায় পড়ে উদ্বিগ্ন হলে ঠাকুরের আচরণ অনুসরণ করে সেই সমস্যা থেকে মুক্ত হবে। সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরে ভালবাসা হবে সর্বদা অবতারকে চিন্তা করে করে। তা' হলেই শোক, মোহ অভিভূত করতে পারবে না।

ঠাকুর বলেছিলেন, নরলীলায়, অবতারলীলায় বিশ্বাস হয় শেষ জন্মে। ভগবানের যত রকম দান আছে, সকলের চাইতে বড় দান এইটি — অবতারশরীর ধারণ করা। অবতার না হলে মানুষ ঈশ্বরকে বুঝতে পারে না — অসীম অনন্তকে।

অবতারের রূপ চিন্তা, লীলা চিন্তা, মহাবাক্য চিন্তা, এই সবই ভক্তদের ধ্যানের বিষয়। এই সব করতে করতে ভক্তি লাভ হয়। তারপর অবতারের কৃপার স্বরূপ দর্শন হয়।

ঠাকুর বলেছিলেন, অবতার যেমন একটা দিগন্তব্যাপী মাঠ, তা'তে একটা উঁচু দেওয়াল, তার গায়ে একটি বৃহৎ ছিদ্র। এর ভিতর দিয়ে অসীম অনন্তকে দেখা যায়।

নির্গুণ নিরাকারকে মানুষ ধারণা করে কি ক'রে? তাই তিনি সাকার সগুণ রূপ ধারণ করেন। সগুণকে ধরে নির্গুণে যাবে। আবার নরদেহ ধারণ করেন। মানুষ হলেন তো ষোল আনা মানুষ। মানুষের দুর্বলতা সব রাখেন। আবার এক এক সময় মানুষের বুদ্ধির অতীত অবস্থা দর্শন করেন। সেই অবস্থায় কেহ ধরতে পারে না — ধরা না দিলে। ব্রহ্মা আর বলরাম কৃষ্ণময় জগৎ দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হলেন।

তিনি যাদের বোঝান কেবল তারাই কর্মজগৎ বুঝতে পারে। তাও আবার মাঝে মাঝে সংশয় এনে ঢেকে দেন। বলরাম পর্যন্ত কৃষ্ণকে পরমব্রহ্মরূপে ধরতে পারেন নাই। তা হলে যে নরলীলা হয় না।

নরলীলায় সংশয় এসে যায় এক একবার। মানুষের কাজ কিনা — যেন প্রকৃত মানুষের ব্যবহার।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শাস্ত্রার্থ বড় শক্ত কাজ। তিনি অবতার হয়ে এসে শাস্ত্রার্থ করেন। তা নইলে এসব sealed books (অ-বোধগম্য গ্রন্থাবলী) হয়ে পড়ে থাকে! পণ্ডিতদের অর্থ কদর্থ হয়। কেবল পাণ্ডিত্যের কর্ম নয় শাস্ত্রার্থ করা!

শাস্ত্র পড়তে চায় অনেকে। এখন শাস্ত্র interprete (ব্যাখ্যা) করবে কে? গুরু মুখে শুনলে হয়। শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশান থাকে। গুরু চিনি আলাদা করে ধরেন ভক্তদের কাছে। গুরু মানে ঈশ্বর, অবতার — যেমন ঠাকুর।

অবতারের কথা শুনে শুনে অভ্যাস এমনি হয়ে গেছে যে, বাবুদের লেকচার আর শুনতে ইচ্ছা হয় না। এরা কি বলতে কি বলে ফেলে। এক বলতে আর বলে। কিন্তু অবতারের বাণী ষোল আনা সত্য। এতে অসার ভাগ নাই।

আমরা ব্রাহ্ম সমাজে যাই কেন? ঠাকুরের কিছু কিছু ভাব ওদের ভিতর দিয়ে percolate (সঞ্চালিত) হচ্ছে। তাই শুনতে যাই। আদি সমাজে বেশ — সেখানে উপনিষদ পাঠ শোনা যায়। ঋষিদের সব কথা, সব সত্য, সব নির্মল, শুদ্ধ পবিত্র সব কথা। গীতাও ভগবানের মুখ দিয়ে বের হয়েছে। উপনিষদ, গীতা এসব শাস্ত্রের কথা আবার ঠাকুরের মুখ দিয়ে বের হয়েছে। তাই শাস্ত্র প্রমাণরূপে গ্রাহ্য। একজন ঋষি আর একজন ঋষির কথা সমর্থন করেছেন। একজন অবতার আর একজনের কথা সমর্থন করেন। এইভাবে শাস্ত্র প্রামাণ্য। ঠাকুর বলেছিলেন, গীতার কথায় কলমের আঁচড় দিবার যো নেই — সব সত্য। কে বলতে পারে এ কথা? কার এ শক্তি আছে অবতার ছাড়া? তাই একদিন গোপনে ডেকে ঠাকুর বললেন, এই মুখ দিয়ে ঈশ্বর কথা কন।

আপনারা এই সব মহাবাক্য চিন্তা করতে করতে বাড়ি যান।

এখন রাত্রি দশটা।

৩

মর্টন ইনস্টিটিউশন্। চারতলার সিঁড়ির ঘর। সন্ধ্যা সাতটা। শ্রীম দরজার কাছে চেয়ারে বসিয়া আছেন দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ আশেপাশে ও সম্মুখে বসা বেঞ্চেতে — জগবন্ধু, সুখেন্দু, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, বলাই, বড় জিতেন, ছোট নলিনী, ছোট জিতেন, কৃষ্ণ সরকার প্রভৃতি।

শ্রীম-র গায়ে লাল-ইমলির উঁচু গলা সাদা সুয়েটার, পায়ে চটি। জগবন্ধু ও ডাক্তার বক্সী আজ দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — আপনার পেসান্টস্ সব কেমন আছে, কি কি রোগ?

ডাক্তার বক্সী — সব ভাল। রোগ এখন বসন্ত আর কলেরা, কিছু অপারেশন।

শ্রীম (বলাইয়ের প্রতি) — আপনি জ্ঞান মহারাজকে কি করে দিছলেন?

বলাই — মেডাল।

শ্রীম — কটা?

বলাই — পনরটা।

শ্রীম — কদিন লাগলো?

বলাই — পাঁচদিন।

শ্রীম — কোঁদেছিলেন?

বলাই — আজ্ঞা হাঁ — ওঁকার।

শ্রীম — এতে ধ্যান জপের কাজ হয়ে যায়। এটি হল 'নি'। খুব কাজ। এরপরে আর গ্রাম নাই। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি — সেই 'নি' নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের বাচক। ওটি কোঁদা খুব কাজ। কেউ কেউ (লেখার অভিনয় করিয়া) এমনি করে লেখে — দুর্গা, হরি, এ সব নাম। এ সবই জপ ধ্যানের কাজ।

শ্রীম — ঐ মেডাল দিয়ে কি করবেন?

বলাই — জ্ঞান মহারাজ স্বামীজীর নামে অনেক প্রতিযোগিতা করান — আবৃত্তি, লেখা, খেলাধুলা — এই সব। তা'তে পুরস্কার দেন।

শ্রীম — মঠে আজ কেউ গিছলেন?

জগবন্ধু — আজ্ঞে না — দক্ষিণেশ্বর গিছলাম ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।

শ্রীম — ডাক্তারবাবু, দক্ষিণেশ্বরে আজ আপনি কা'কে কা'কে দেখলেন? কোনও মারোয়াড়ী কি হিন্দুস্থানী ভক্ত গিছলো? মাইসোরের কুমার রাজা (যুবরাজ) বুঝি যান নাই? আজকাল যাওয়া খুব সুবিধে — স্টিমার হওয়ায়। আপনারা তো গঙ্গা পার হলেই মঠে অনায়াসে যেতে পারেন? কাশীপুরে স্টিমারে উঠে ওপারে বেলুড়ে নামা।

(স্বগত) আজকাল কত সুবিধা! তবুও যায় না! আমরা কত কষ্ট করে যেতাম। তাই এখন অত সুবিধা দেখে মনে হয় রোজ যাই।

(ভক্তদের প্রতি) — তখন সবে ঠাকুর চলে গেছেন। পূর্বের অভ্যাসে বরানগর মঠে যাওয়া হতো মাঝে মাঝে। যাওয়া কত কষ্টকর ছিল। সোয়ারের গাড়ী সর্বদা পাওয়া যেতো না। তখন হাঁটতে হতো। তখন এমনি একটি fascination (আকর্ষণ) ঠাকুর করে দিছলেন যে, বরানগর মঠের পায়খানা যাওয়ার জলও গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ পবিত্র মনে হতো। তাই হাতে ছিটিয়ে মাথায় দিতুম। কখনও কখনও বাসন মাজতুম। কখনও পুকুরে বাসন ও অন্য জিনিস ধোয়া যেতো। কখনও পুকুর থেকে জল তুলতুম। ছোট একটা পুকুর ছিল। আবার কখনও বাজারে যেতুম শশী মহারাজের সঙ্গে। (সহাস্যে) একদিন হৃদয় মুখুয্যে বললেন, বাসন মাজলে কি হবে? টাকা দিতে হয়।*

জগবন্ধু — হৃদয় মুখুয্যে তখন কি করে এলেন?

শ্রীম — কি রকম করে ঐ দিন এসে পড়েছিলেন।

---

*ঐ সময় শ্রীম তিনটা স্কুলে এক ঘন্টা করে হেড্‌মাস্টারী করতেন। একটা স্কুলের প্রাপ্য মাইনে বরানগর মঠে দিতেন। আর একটা থেকে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা হতো।

শ্রীম — ঠাকুর চলে যেতেই মা বৃন্দাবনে চলে গেলেন। তীব্র বৈরাগ্য।

জগবন্ধু — সঙ্গে কে কে গিছ্লেন?

শ্রীম — গোলাপ মা, কালী, তারক, যোগেন এই সব। যোগীন মা বুঝি ওখানে আগে থেকেই ছিলেন? এখানকার গিন্নীও (শ্রীম-র ধর্মপত্নী) সঙ্গে যান। এক বছর মা বৃন্দাবনে ছিলেন বলরামবাবুদের বাড়িতে — কালাবাবুর কুঞ্জে। মায়ের ঐ সময়টা প্রায় বিদেহ অবস্থায় কেটেছিল। সর্বদা বিরহ ব্যথা — সবে মাত্র ভগবান অন্তর্ধান করেছেন। কৃষ্ণ বিরহে যেন রাধারাণী। নিত্য গোবিন্দজীর দর্শন হতো। এক বছর পর কলকাতায় ফিরে এসে মা কামারপুকুর যান। সঙ্গে ছিলেন যোগীন মা, বুড়ো গোপাল, আমাদের বাড়ির উনি — এঁরা সব।

ওঁরা এই প্রথম যান কামারপুকুর। আমি গিছ্লুম ঠাকুরের শরীর থাকতে থাকতে। তখন ঠাকুর অমনি একটা ভাব করেছিলেন — কামারপুকুরের চারধারে একটা জ্যোতি জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে দেখতে পেতুম। সবকিছু জ্যোতির্ময় — বৃক্ষলতা পশুপক্ষী মানুষ জ্যোতির্ময় দেহ ধারণ করেছে। আর ঢিব ঢিব করে পেন্নাম করতুম।

বর্ধমানের রাস্তা দিয়ে চল্‌ছি আর ভাবছি — ঠাকুর এই রাস্তা দিয়ে চলতেন। তাই সব পবিত্র শুদ্ধ তেজোময়। ধূলিকণায় সব তাঁর স্পর্শ রয়েছে ভেবে অমনি পেন্নাম। এই করতে করতে চলছি। একটা মাঠ এলো, তার মাঝখানে একটা মন্দির। আমি ঠাকুরবাড়ি মনে করে পেন্নাম করছি। গরুর গাড়ীতে গিছলাম। সেটা একটু আগে গেছে। চলছি একা। ওমা, চেয়ে দেখি সামনে এক অস্ত্রধারী পুরুষ। আমি তার দিকে নজর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চললুম। তারপর খানিকটা এসেই অমনি দৌড়। একেবারে গাড়ীর কাছে এলাম। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলুম, লোকে যে বলে এটা ডাকাতের দেশ? এই লোকটা কি ডাকাত? গাড়োয়ান বললে, না, আমরাই ডাকাত। ঐ লোকটা ডাক পিয়ন। তার সঙ্গে টাকাকড়ি যাচ্ছে। তাই সে অস্ত্র সঙ্গে রাখে। ‘আমরাই ডাকাত’ এই কথা শুনে ভয় হতে লাগলো।

ফিরে এলে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, কি করে গেলে, তুমি ঐ ডাকাতের দেশে? ভক্তরা জিজ্ঞেস করছেন সব খুঁটিনাটি। আমিই সকলের আগে যাই। এর পর ভক্তরা কেহ কেহ যায়।

আমি ঠাকুরকে সব বললাম। সব জ্যোতির্ময় দেখেছিলাম। রাস্তায় একটা বিড়ালকে জ্যোতির্ময় দেখে সাষ্টাঙ্গ পেন্নাম করেছিলাম শুনে, ঠাকুর হাসতে লাগলেন। যখন বললাম, আবার যেতে ইচ্ছে করছে। তিনি আস্তে আস্তে হাতে ইঙ্গিত করে বললেন, আমি ভাল হই। তখন একসঙ্গে যাওয়া যাবে। কাশীপুরে ঠাকুর তখন খুব রুগ্ন। তাঁর সঙ্গে আর যাওয়া হয় নাই।

যাঁর ইচ্ছাতে সব হয় তিনি কৃপা করে ঐ জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করালেন। মানুষ চেষ্টা করে কেবল এই দর্শন লাভ করতে পারে না। ঐ দর্শনের নেশা আজও আছে ঐরূপ জীবন্ত। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' — 'মা-ই সব হয়ে রয়েছেন'।

তারপর সেকেণ্ড ব্যাচে ওরা যায় মাকে রাখতে! তারপর বুঝি থার্ড ব্যাচে যায় গোলাপ মা, গৌরী মা, যোগীন মা আর আমাদের বাড়ির উনি (গিন্নীমা বা মা-ঠাকরুণের 'বৌমা') আর ছোট গোপাল। নিরঞ্জন ভাগলপুরে ছিল। সংবাদ পেয়ে ওখানে যায়।

তখন এমনি অবস্থা, ভক্তরা সব নড়ে ভোলা। বৃন্দাবন থেকে ফিরে মা চললেন কামারপুকুর হেঁটে। এমন পয়সা নেই গাড়ী বা পাল্কী করে দেয়। খানিকটা রাস্তা চলার পর বুঝি একটা গরুর গাড়ী করা হয়েছিল।

জগবন্ধু — রামবাবু, বলরামবাবু, সুরেশবাবু, গিরিশবাবু, এঁরা তো পয়সাওয়ালা লোক ছিলেন?

শ্রীম — হাঁ। কিন্তু কারো কাছে চান নাই। ওদেরও খেয়াল হয় নাই।

শ্রীম — মা ঠাকুরুণ চলে আসার এক বছর পর আমরা যাই বৃন্দাবন।

জগবন্ধু — কোন year (বৎসর)?

শ্রীম — এইটিন্ এইটি-সেভেনের অক্টোবরে।

জগবন্ধু — পুজোর ছুটিতে?

শ্রীম — হাঁ। তখনই বৃন্দাবনের পর অযোধ্যা আর কাশী দর্শন হয়। অযোধ্যা তখন একটি পাড়া গাঁয়ের মত ছিল। রঘুনাথ দাস বাবাজীর ছাউনীতে গিছলুম। তখন একটি পরমহংস দেখেছিলাম— বালকের মত ভাব। তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হলো।

রঘুনাথ বাবাজীর সুনাম। স্বামীজীরাও গিছলেন তাঁর কাছে। আমায় বলেছিলেন, 'বেটা, কাঁহা ঘুমোগে। গুরুস্থানমে যাও, গুরুকা ধ্যান চিন্তা কর, উনকা গুণগান কীর্তন কর।' তখন ঠাকুর চলে যাওয়ায় ভক্তদের মন খুব উদাস ছিল।

(স্মরণ করিয়া) হাঁ, তখন সর—যূ, সরযূতে একটি স্টিমার দেখেছিলাম, লোক পার হচ্ছে।

অমৃত — এখনকার অযোধ্যা সে অযোধ্যা নয়?

শ্রীম — না। এখন তো নয়, প্রায় চল্লিশ বছর আগে। মডার্ণ ভাব তখনও ঢোকে নাই। সাধুরা তখন গেলে রঘুনাথ দাস বাবাজীর ছাউনীতে ভিক্ষা পেতেন।

শোনা যায় রঘুনাথ দাস বাবাজী এক সিপাই ছিলেন জেলখানার। একদিন রামায়ণ শুনতে বসে আপনার duty-র (কাজের) কথা ভুলে গেলেন — বিভোর হয়ে শুনছিলেন। রাত যখন প্রভাত হলো তখন চটকা ভাঙ্গলো। মনে অনুশোচনা এলো। তৎক্ষণাৎ উপরওয়ালা কর্মচারীর কাছে গিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে বললেন, আমায় শাস্তি দাও, কর্তব্য অবহেলা করেছি বলে। বিলেতি সাহেব ছিল ঐ লোকটি। তিনি বললেন, কি বলছো তুমি, বুঝতে পারছি না। আমি তো তিনবার রাউণ্ডে গিয়ে তোমায় দেখেছি ডিউটিতে। তুমি যে আমার সঙ্গে কত কথা কইলে, সেলাম করলে! এই কথা শুনেই তাঁর চক্ষু জলে ভরে গেল। তখন সাহেবকে বললেন, 'এই ন্যাও তোমার উর্দ্দী, সব। আর চাকরী করবো না সরকারের। যে আমার হয়ে এসে নিজে ডিউটি দেয়, তাঁরই চাকরী আজ থেকে করবো।'

তারপর অযোধ্যায় এসে বাস করেন। খুব সাধু সেবা করতেন তিনি।

৪

জগবন্ধু — কাশীতে তো আপনি প্রথম গিছলেন এন্ট্রান্স দেওয়ার পর। এটা আপনার দ্বিতীয় দর্শন?

শ্রীম — হাঁ। কাশীতে এইবারে তিনটি মহাত্মা দর্শন হয়। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ আর বিশুদ্ধানন্দ। ত্রৈলঙ্গ স্বামী তখন বসে থাকতেন, 'ড্রপসি' হয়েছিল। খাবার দিতেই চেঙ্গারিটা হাত দিয়ে ঢেকে পেছনে লুকিয়ে রাখলেন যেমন ছেলেরা করে থাকে, পাছে কেউ এসে ভাগ না বসায় (হাস্য)। — খুব প্রসন্ন বদন।

ভাস্করানন্দ একটা 'রিমার্ক পাস্' (মন্তব্য প্রকাশ) করলেন, ঠাকুরের অনেকগুলি গান আমার মুখে শুনে। বলেছিলেন, এই বলছো এই কর ঐ কর — অত কাজ করে এই সব ভাববার সময় পাও কি করে? তখন প্রায় ঐ ভাবেই থাকতুম। এখন আর ততটা হয় না।

আর বিশুদ্ধানন্দের সঙ্গে নানা কথা হয়েছিল। খুব পণ্ডিত ছিলেন।

একজন ভক্ত — উনি কে?

শ্রীম — এই যার নামে, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল হচ্ছে।

এই তিনজনের সঙ্গে তখন দেখা হয়।

জগবন্ধু — সেবারে কতদিন লেগেছিল?

শ্রীম — এই পুজোর ছুটিটা।

ডাক্তার — আর একবার হরিদ্বার ঋষিকেশ গিছলেন — কখন?

শ্রীম — নাইনটিন হাণ্ডরেড্ টুয়েলভে। কাশীতে যাই মা ঠাকরুণের সঙ্গে। সেখান থেকে একা যাই হরিদ্বার। কনখলের আশ্রমে গিয়ে উঠি। তারপর গঙ্গার ধারে একটি কুটীরে ছিলাম। হরি মহারাজ আর তারক মহারাজও তখন ওখানে ছিলেন। (সহাস্যে) একদিন ব্রহ্মচক্র রচনা হলো, ঐ কুটীরে এঁদের নিয়ে। হরি মহারাজ বিকেলে রোজ বেড়াতে নিয়ে যেতেন এ-আশ্রম সে-আশ্রমে। একদিন গুরুকুল কাংড়ীতে যাওয়া গিছলো। নিয়ে গিছলেন এসে শ্রদ্ধানন্দজী। শুনেছিলেন আমরা পড়াই, তাই অনেক পরামর্শ করেন। ভিজিটারস্

বুকে আবার আমাদের হাতে মন্তব্য লিখিয়ে রাখলেন।

শেষে যাই ঋষিকেশ। প্রথম ছিলাম মায়াকুণ্ডে রামায়তদের কাছে একটা পাকা বাড়িতে। তারপর ছিলাম স্বর্গাশ্রমে। লছমনঝোলা থেকে আসবার সময় স্বর্গাশ্রমের বাউণ্ডারি ওয়ালের গায়ে ছিল কুটীরটি। খুব ছোট কুটীর, পাহাড়ের ফুটে। হাতী নামতো রাত্রে জঙ্গল থেকে জল খেতে, দেয়ালের অপর পাশ দিয়ে। শুনেছিলাম জানোয়াররা আগুনকে ভয় করে, তাই হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে বাইরে রেখে দিতাম।

জগবন্ধু — গিন্নীমা সেকেণ্ড ব্যাচে গিছলেন কামারপুকুর?

শ্রীম — হাঁ। তখন মাকে রাখতে যান। থার্ড ব্যাচেও উনি গিছলেন।

জগবন্ধু — আচ্ছা, বরানগর মঠ কখন হয়?

শ্রীম — ঠাকুরের শরীর যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ওটা তো মঠ ছিল না প্রথম! একটা ভাঙা পোড়ো বাড়ি ছিল। লোকে বলতো ভূতের বাড়ি। কাশীপুর বাগান তো ছেড়ে দেওয়া হল। তখন লাটু, তারক আর বুড়ো গোপালের থাকার স্থান ছিল না। তাই তাদের জন্য একটা বাসার মত হলো ওটা। তারপর আঁটপুরে বাবুরামদের বাড়িতে গিয়ে বড় দিনের সময় সকলে মিলিত হল। সেখানে ঠিক হলো, ত'হলে আর কারো বাড়ি গিয়ে কাজ নেই — ওখানেই থাকা যাবে ঐ বাসায়। কিছুই ঠিক ছিল না পূর্বে। যিনি যন্ত্রী তিনিই সব করালেন প্রেরণা দিয়ে।

জগবন্ধু — মহারাজরা কখন গেরুয়া নিলেন?

শ্রীম — আঁটপুরেই ঠিক হলো সন্ন্যাস নেওয়ার কথা। তারপর হোম করে গেরুয়া নিল (এইটিন্ এইটিসেভেনে)। কাশীপুর বাগানে কেহ কেহ কখনও ধ্যান জপের সময় গেরুয়া পরতো।

বেলুড় মঠ হলো (এইটিন) নাইনটিসেভেনে। তখন এই সব সুবিধা ছিল না। বেলুড়, বালি স্টেশন হয় নাই। লিলুয়ায় নেমে ঠেকুতে ঠেকুতে চলছি, হাতে কিছু মিষ্টি ঠাকুরের জন্য। কখনও কখনও বিশ্রাম করছি। দক্ষিণেশ্বরে যেতেও মাঝে মাঝে বিশ্রাম

করতে হতো। এখন কত সুবিধা — স্টিমার, ট্রাম, বাস সব হয়েছে।

মা ঠাকরুণ কামারপুকুর থেকে এসে প্রথমে বাসা করেন বেলুড়ে। এইটিন্ এইটিএইট থেকে এইটিনাইনে (১৮৮৮-৮৯)। মাকে দেখতে যেতাম নৌকোয় পার হয়ে। নৌকোয় তো আমার অত ভয় কিন্তু তখন একটুও ভয় হতো না — খেয়ালই নাই।

একদিন পার হচ্ছি — সেদিন ছিল মহালয়া — ঝড় এলো। নৌকো গঙ্গায় ডুবো ডুবো। হঠাৎ এলো ঝড়। আগের দিন বেশ ছিল। আবার কবিত্ব হচ্ছিল সাদা-কাল মেঘের কোলাকুলি দেখে। ঝড় উঠতেই সব কাঁদতে লাগলো। আমি তখন সকলকে সাহস দিচ্ছি — কাঁদ কেন, কি হয়েছে (শ্রীম ও সকলের হাস্য)? কে সাহস দিচ্ছেন? না, যিনি নৌকোর কথা শুনলেই কাঁপেন। নৌকোটা একটা বজরার সঙ্গে বাঁধলো। মাঝিরা ওতে উঠে পড়লো। কেবল একজন হাল ধরে ছিল। এতে নৌকো আরও বেশী নড়তে লাগলো। তারপর সকলের মত হল, নৌকো মাঝখানে নিয়ে যাও। তখন সব শান্ত, কিনারাতেই যত ঢেউ আর ঝড়।

শ্রীম অনেকক্ষণ কি ভাবিতেছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — ওরা যখন মায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস করছে আমি তখন নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি। বার শ’ কাগজ আমার হাতে ইউনিভারসিটির। সব দেখতে হবে। চার শ’ দেখে আর পেরে উঠলুম না। বাকী কাগজ না দেখেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিলুম রেজিস্টারের কাছে। চিঠিতে লিখে দিলুম, আমার অসুখ। বস্তুতঃ তখন শরীরেরও অসুখ, মনের reaction (প্রতিক্রিয়া)!

তা আবার কেমন দশটা প্রশ্ন! এই দশটারই নম্বর দিতে হবে। ভাবলুম, আর পেরে উঠছি না, না হয় কিছু না দিবে। তাও ভাল। রেজিস্ট্রার চিঠি লিখলেন দেখা করতে। মনে মনে বিচার করলুম — আর দেখা, রসো। আবার ভাবছি বসে বসে, হয়তো পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে যায়, কি কি করে!

ডাক্তার — আবার তখন উনি (গিন্নিমা) বৃন্দাবনে!

শ্রীম — হাঁ। একজন আবার পড়ে গেল ছাদ থেকে। তাকে আবার হাসপাতালে নেওয়া হলো।

সেবারে আমার সঙ্গে দ্বিজ আর তার ভাই গিছলো বৃন্দাবন, অযোধ্যা, কাশী।

আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া এক বিরাট বরযাত্রা যাইতেছে দক্ষিণ দিকে। অসংখ্য আলোতে উদ্ভাসিত, আর কয়টা ইংলিশ ব্যাণ্ডের বাজনায় চারিদিক মুখরিত। শ্রীম বাজনা শুনিয়া বলিলেন, বেশ বড় হলে দেখবো। ভক্তরা দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, খুব বড়। শ্রীম উঠিয়া গিয়া তাঁহার শয়নকক্ষের পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। বর বসিয়াছে মোটরে। একটা ফুলের প্রকাণ্ড প্রজাপতির উদরে মোটরটি। তখন রাত্রি সওয়া নয়টা। ভক্তরা কেহ কেহ চলিয়া যাইতেছেন।

শ্রীম সিঁড়ির ঘরে গিয়া আবার বসিয়াছেন। সামনে বেঞ্চেতে ডাক্তার, বিনয়, ছোট জিতেন ও জগবন্ধু। এখন রাত্রি পৌনে দশটা। শ্রীম আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — ও কি patients (রোগী) ভাবলে হয়? এসব ভাবতে হয় সব ঈশ্বর। তাঁর সেবা করছি — এই ভাব।

ডাক্তার — তা হলে তো যাওয়া যায় না মঠে (সেবা ছেড়ে)।

শ্রীম — এর মধ্যে যখন সময় হয় যাওয়া। মঠে না গেলে যে ভাব থাকবে না! সাধুদের দেখলে মনে হবে সর্বস্ব ত্যাগ করে দু'হাতে ভগবানকে ধরাই মানুষ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাঁরা সব ছেড়ে তাঁকে ধরেছেন। তাঁদের দেখলে নিজের ঘরকেও আশ্রম বানাবার কথা মনে পড়বে। ভগবানই এই গৃহের কর্তা। আমরা সব সেবক, যেমন দাসদাসী। ভগবান সকলের ভিতর রয়েছেন। পরিজন প্রভৃতির ভিতরও তিনি। এই ভেবে সকলের সেবা করলেও সন্ন্যাস। কি সেই শ্লোকটা গীতার 'অনাশ্রিতঃ কর্মফলং—'?

ডাক্তার — অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।।

(গীতা ৬/১)

শ্রীম — এটাই হলো আদর্শ। নিজে কোন benefit (লাভ) না নিয়ে কর্ম করলেও সন্ন্যাসই হলো। দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় সব দিয়ে তাঁর সেবা করা আর কি! এরই নাম সন্ন্যাস। এ সবই তোমার আর এ সবই তুমি, এটার অভ্যাস করাকে কর্মযোগ বলে।

কেউ কেউ ঠাকুরের কাছে এলে দেখেই বলে দিতেন, এর এই পর্যন্তই এই জন্মে। তাই বেশী ধারণ করতে পারবে না। গুরু যে অমূল্য রত্ন দিচ্ছেন তা ধরে রাখবার শক্তি নাই। ছোট আধার।

কারো কারো আবার এমনি প্রকৃতি, গুরুর কথায় খালি revolt (বিদ্রোহ) ক'রছে।

ডাক্তার — তিনি না করিয়ে নিলে কি আর করা যায়?

শ্রীম — তিনিই তো করিয়ে নিচ্ছেন। প্রকৃতিও যে তিনি। আবার তিনিই তো চেষ্টা ও শক্তি দিয়ে প্রকৃতি জয় করিয়ে নিচ্ছেন।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস হয়ে গেলে বেঁচে গেল। রাস্তা কম পড়ে গেল। নইলে সবটা চলতে হবে। এটাকেই প্রকৃতি বলে। কিন্তু শেষে যাবে নিশ্চয়, তবে দেরীতে। একদিন সকলেই তাঁর কাছে যাবে। এটাই নিজের ঘর।

কলিকাতা।
১লা মার্চ ১৯২৬ খ্রীঃ।
১৭ই ফাল্গুন ১৩৩২ সাল, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র।

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিশ্রান্তির অবসরে

১

মর্টন স্কুল। তিনতলার উত্তর পূর্ব কোণের ঘর। শ্রীম মেঝেতে বিছানায় শুইয়া আছেন মশারীর ভিতর। শির পূর্ব দিকে। বিছানার সঙ্গে দক্ষিণ দিকে একখানা মাদুর পাতা আছে ভক্তদের বসিবার জন্য।

আজ ২০শে নভেম্বর ১৯২৯ খ্রীঃ, ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সাল।

অন্তেবাসী বেলুড় মঠ হইতে শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। নিচে বড় জিতেনের সঙ্গে দেখা হইলে দুই জনে সংবাদ লইয়া শ্রীম-র গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম দেখিয়াই বলিতে লাগিলেন, আসুন আসুন, মাদুরে বসুন।

এখন অপরাহ্ন সওয়া পাঁচটা। শ্রীম অসুস্থ, জ্বর হইয়াছে। অন্তেবাসী শ্রীম-র বাম হাত ধরিয়া দেখিলেন, একটু গরম। বড় জিতেন দেখিতেছেন ডান হাত।

শ্রীম — নাড়ী কি frequent (চঞ্চল), না, too frequent (বেশি চঞ্চল)?

তাই ভাবি কৃষ্ণকিশোর যা বলেছিলেন — 'কবরেজ, আমার রোগ ভাল কর। কিন্তু ওঁকারটি ভাল করো না।' সর্বদা তিনি ওঁকার জপ করতেন।

এমন এক একটা রোগের ধাক্কা আসে তখন ভুলিয়ে দেয় সব। তা আর কি করা যায় বল! তাঁর পাঁঠা, তিনি যদি ল্যাজে বলি দেন! আমরা তাঁর হাতে পড়েছি, না তিনি আমাদের হাতে পড়েছেন, কোনটা?

যিনি মেরেছেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন, ঠাকুরের এই শেষ কথা। ওদিকে গেলেও ধাক্কা, এদিকে গেলেও ধাক্কা (ঈশ্বর ও সংসার)।

একটি ভক্ত (স্বগত) — ঈশ্বরের দিকে বেশী গেলে যে ধাক্কা তা বেশ বোঝা গেছে। একটা সময় গেছে যখন দিবানিশি ভাবনা হতো ঃ

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।। (গীতা ৬/৩৮)।

শ্রীম — নাম-রূপ দেখছি ভুল হয়ে যাচ্ছে। লোকের নাম মনে রাখতে পারছি না।

কিন্তু ছেলেবেলার সব ঘটনা মনে হচ্ছে। মায়ের সঙ্গে যাওয়া, ইস্কুলে যাওয়া, এসব। একবার মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি রিষড়া গিছলুম। সেখান থেকে মাহেশে জগন্নাথ দর্শন হল। তারপর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে। বছর চারেক বয়স। ন্যাংটা দাঁড়িয়ে কাঁদছি মন্দিরের সামনে। মা-টা ওঁরা সব অন্য মন্দির দেখতে গেছেন। আমি শুনছি, লোকেরা বলাবলি করছে — এই রাণী রাসমণির কালীবাড়ি। একটি লোক এসে আমায় শান্ত করলেন। হয়তো উনিই ঠাকুর হবেন কে জানে! এইটিন ফিফ্‌টিএইট (১৮৫৮ খ্রীঃ)। ঠাকুর তখন কালীবাড়িতে কর্ম নিয়েছেন। ওঁর তখন খুব (তপস্যা) চলছে! তার চব্বিশ বছর পর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়।

আর একবার গেছি জৌনপুরে। তখন বয়স যোল-সতের। এইটিন্ সেভেনটিওয়ান্ (১৮৭১ খ্রীঃ) হবে। বেড়াতে গিছলাম চেঞ্জে। শহর থেকে পাঁচ মাইল দূর একটি জায়গা। খুব দিগন্তব্যাপী মাঠ। ফ্লাড (বন্যা) হয়েছিল। বৃষ্টি হচ্ছে, আর আমি গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি।

গুরুমশায়ের পাঠশালে (কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে শ্রীমানি বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম ভূমিখণ্ডে) যাচ্ছি। দেখি একটা ঘোড়া। খুব বড়। মনে হল বুঝি হাতী। তখনকার ধারণা এর থেকে বড় জানোয়ার হতে পারে না।

(সহাস্যে) ফাইট (ঝগড়া) করা যাচ্ছে। একজন দিল পেটে এক

ঘুঁষি মেরে। অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলাম। শেষে যে মেরেছিল সেই এসে সেবা করে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যখন তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে দেখা হল তখন তার অর্থ বোঝা গেল, কেন এই মঠ মন্দির অত সব।

তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর past life-টা (অতীত জীবনটা) একেবারে ভুলে গিছলাম। এখন আবার উঠছে মনে। তাঁর towering personality-তে (গগনস্পর্শী ব্যক্তিত্ব) — সে কি sacred halo (পবিত্র প্রভা) — সব ভুলিয়ে দিছলো। ঐ পাঁচ বৎসর তো অন্য কোনও চিন্তা ছিল না! অবসরই ছিল না।

শ্রীম নিজ চরিত্র বর্ণনা করিতেছেন। বড় জিতেন তারই মাঝে, তাঁহার দেহের সংবাদ লইতেছেন। ডাক্তার বক্সী কি বলছেন, কেন অসুখটা হলো, কি খাচ্ছেন ইত্যাদি।

শ্রীম — কেবল prescription (ব্যবস্থা-পত্র) লিখলেই কি ডাক্তারের কাজ হলো? Direction (উপদেশ) দেওয়া কি কম কাজ!

Rest (বিশ্রাম)! Oh, blessed retirement (কবিরা তাকেই বলেছেন — হে আনন্দময় বিশ্রান্তি)! ঠিকই। তার জন্যই তো পেনসান্ — এই সব।

আর চলে না (বড় জিতেনও মধুর স্বরে সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, 'আর চলে না')। একে বই (কথামৃত) ছাপা হচ্ছে, তার direction (নির্দেশনা)। তার উপর আবার ইস্কুলের direction (পরিচালনা)। এই বয়সে আর অত চলে না। এখন খালি rest (বিশ্রাম)।

অসুখটা কেন হল — খাওয়ার অনিয়মে। সকাল সকাল দিতে পারে না।

বড় জিতেন — কেন, রাত্রিতে তো সকালে আসে। আপনি খান না।

শ্রীম — হাঁ, রাত্রে হয়। দিনে পারে না।

শ্রীম-র অসুখের উপরোক্ত কারণও আছে। অধিকন্তু অন্য কারণও

রহিয়াছে। শ্রীম বিগত কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য পদরেণুতে তীর্থকৃত দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বেলঘরিয়ার জয়গোপাল সেনের বাগান, আর সিঁথির বেণী পালের বাগান দর্শন করিয়াছেন। তাহাতেও শরীরের উপর চাপ পড়িয়াছে। জয়গোপাল সেনের বাগানে ঠাকুর ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে কেশব সেনকে দেখিতে যান। আর বেণী পালের বাগানে ব্রাহ্ম সমাজের বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করেন। দক্ষিণেশ্বর তো অবতারের প্রধান লীলা ভূমি! ভগবান নরদেহে এখানে ত্রিশ বছর লীলা প্রকট করেন। এই সব মহাতীর্থে শ্রীম ভক্তগণকে প্রায়ই প্রেরণ করেন। কখনও নিজেও যান।

শ্রীম — বুড়ো মানুষদের, যেমন আঙ্গুর তুলো দিয়ে রাখে, তেমনি রাখতে হয়। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) একটুকুও নাড়াচাড়া করা চলে না। (বড় জিতেনও সস্নেহ কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন — 'নাড়াচাড়া করা চলে না')।

বড় জিতেন (বিনীতভাবে) — যখন জানেন ও রকম অনিয়ম আর নাড়াচাড়া করলে অসুখ হয় তখন কেন ও সব করা! নিয়মমত খাওয়া দাওয়া বিশ্রামাদি করলে হয়।

শ্রীম (স্মিতহাস্যে) — 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি'। প্রকৃতিতে করাচ্ছে। প্রকৃতিই যে এই রকম। ঐ সব নিয়ম পালনের প্রকৃতিও ভিন্ন।

এইবার হাইকোর্টের একটা বিচারের সমালোচনা হইতেছে। জাষ্টিস্ সুরাবর্দী, রক্সবার্গ প্রভৃতি বিচারাসনে ছিলেন। Abduction case (মেয়ে চুরির মোকদ্দমা)। বড় জিতেন হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক।

বড় জিতেন — হয়ে গেল। কিন্তু যে দোষী তার সাজা কমে গেল। লোকেরা বলতে লাগলো ঠিক জাষ্টিস্ হয় নাই।

শ্রীম — জজেরা তো বলেন না যে unalloyed justice (নির্ভেজাল ন্যায় বিচার) হয়! ওঁরা বলেন, আমরা যেমন facts (সাক্ষ্য) পেয়েছি তেমনি বিচার করেছি।

(শ্রীম কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া, সহাস্যে) — কি বলেন মিঃ রায়? জজ্ জিজ্ঞাসা করলেন। Now, I place myself absolutely

at the hands of your Lordship. (এখন আমি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে জজ সাহেবের হাতে সমর্পণ করলাম) — উকীল রায় উত্তর করলেন।

এ ছাড়া উপায় নাই। ঈশ্বরের শরণাগত হতেই হবে।

শ্রীম — কিন্তু তিনি এসে message (সংবাদ) দিয়ে গেছেন, ঈশ্বরকে দেখা যায়। আবার কথা কওয়া যায়।

শুকলাল, মনোরঞ্জন প্রভৃতি প্রবেশ করিলেন।

তা হলেই hallucination (মনের ভুল) বলবার যো নাই। কেমন করে বলবে hallucination (মনের ভুল)? কথা কওয়া যায় যে আবার। একঘর লোকের সামনে যে ঠাকুর কথা কইছেন। ঠাকুর যা বলছেন তা যে আবার বাস্তবের সঙ্গে আর শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে!

কিন্তু আবার সব ভুলে যাচ্ছে। এমনি তাঁর মহামায়া! বাইরের গুলো নিয়ে লোক মেতে যায়। তা কি করে বেচারী? এ ভুল ভাঙ্গাবার জন্য ঈশ্বরকে নরদেহে আসতে হয়। It requires God Himself to come in human form — এত প্রবল তাঁর মহামায়ার শক্তি!

শ্রীম খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (শ্রীশচৈতন্যের প্রতি) — মহাপুরুষ এখন ঔষধ খান কি?

শ্রীশচৈতন্য — আজ্ঞে হাঁ। যখন দরকার হয় খান।

মঠ হইতে শ্রীশচৈতন্য কলিকাতা আসিলেই শ্রীম মনে করেন মহাপুরুষ মহারাজের ঔষধ লইতে আসিয়াছেন।

স্বামী রাঘবানন্দের প্রবেশ।

শ্রীম — আপনাদের তো আর এখন অনিয়ম নাই খাওয়ার?

স্বামী রাঘবানন্দ — আজ্ঞে না। একজন হাত দেখে বললো, আশি বছর বাঁচবো।

শ্রীম — কেন, একশ’ বছর বাঁচবেন আপনারা। এখন তো আর কোন অনিয়ম নাই।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর এসে পথ সোজা করে দিয়েছেন। উঃ তিনি কি সাধনই করেছেন! সব করে মাখন তুলে দিয়েছেন। এখন খালি খাওয়া। দুধ দুইয়ে দই পেতেছেন। তারপর ঘোল করে মাখন তুলে রেখে গেছেন। এ খাওয়া কেবল।

তিনি অনেক করেছিলেন। শেষে বললেন, ওতে বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু তাঁকে করতে হয়েছিল জগতের কল্যাণের জন্য। (সাধুদের প্রতি) আপনারাও তো কিছু করেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আপনারা সব এবার যান। ছাদে গিয়ে পাঠ করুন। খোলা হাওয়া।

জগবন্ধু অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ করিলেন। মিষ্টিমুখ করিয়া সাড়ে সাতটায় তিনি বেলুড় মঠে রওনা হইলেন। শুকলাল সঙ্গে আসিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিলেন।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদে সাধু ও ভক্তগণ বসিয়া আছেন। শ্রীম তিনতলার শৌচাগার হইতে বাহির হইয়া চারতলার নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এখন সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা। শ্রীম-র গায়ে ওয়ার-ফ্লানেলের ধূসর রঙ্গের পাঞ্জাবী। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে ব্যাণ্ডেজ।

আজ ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীঃ।

ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্য অমর ডাক্তারের বাড়ি হইতে মহাপুরুষ মহারাজের জন্য ঔষধ লইয়া শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। আসিবার সময় তিনি অদ্বৈতাশ্রম হইয়া আসিয়াছেন। মঠের একজন সাধু তাঁহাকে হিতোপদেশ দিলেন মঠে ফিরিয়া যাইতে। শরীর ভাল না। আর কি আছে ওখানে শ্রীম-র কাছে — রোজ যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু তিনি তাঁহার কথা শুনিলেন না। কারণ মঠে শ্রীমহাপুরুষ সর্বদা তাঁহাকে উপদেশ দেন শ্রীম-র কাছে যাতায়াত করিতে। কয়েকদিন না গেলেই অসন্তুষ্ট হন। বলেন, শ্রীম তোমার ধর্ম-পথের জনক। আর বিশেষতঃ এখন শ্রীম অসুস্থ।

সুখেন্দু ব্রহ্মচারী শ্রীশচৈতন্যকে লইয়া শ্রীম-র ঘরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম মেঝেতে বিছানায় শুইয়া আছেন, শিয়র পূর্ব দিকে। বিছানার পাশে মেঝেতে মাদুর পাতা। সাধু ও ভক্তরা বসিয়া আছেন — স্বামী রাঘবানন্দ, শুকলাল, পূর্ণেন্দু, শান্তি প্রভৃতি।

শ্রীম-র আঙ্গুলহাড়া হইয়াছে। চক্ষু ছল ছল। মুখ শুষ্ক। কিন্তু নয়নে ও মুখমণ্ডলে এক স্নিগ্ধ আনন্দচ্ছটা। দেখিলে মনে হয় — এ যেন আনন্দের উপর রোগের জামা পরানো হইয়াছে। শ্রীশচৈতন্যকে দেখিয়াই শ্রীম বলিতেছেন — নমস্কার, নমস্কার — এই আঙ্গুলহাড়া হয়েছে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন আর নিজের মনে হাসিতেছেন।

শ্রীম (সহাস্যে শ্রীশচৈতন্যের প্রতি) — পায়খানায় গেছি। এটা (ব্যাণ্ডেজ) ধোয়া হয় নাই এসে। যাদের (শ্রীম-র ধর্মপত্নীর) শুচিবাই আছে, বলছে, এটা খুলে ফেলে দাও (শ্রীম-র হাস্য)।

বাবুরামের মায়ের ছিল (শুচিবাই)। ঠাকুর তাই প্রেসক্রিপসান করলেন — যেখানে লোকে হাগে সেখানকার মাটি এনে তিলক কাটবে। তা কি পারে? প্রকৃতি রয়েছে যে পেছনে। (শ্রীশচৈতন্যের প্রতি) আপনার ছিল শুচিবাই (হাস্য)?

শ্রীশচৈতন্য — আজ্ঞে না। তবে যাঁর (শ্রীম-র ধর্মপত্নীর) কথা বললেন তাঁর কাছে বকুনী খেয়েছি এখানে থাকার সময় (শ্রীম-র হাস্য)।

শ্রীম (সহাস্যে) — বিনয় মহারাজের কিছু আছে (শুচিবাই)।

স্বামী রাঘবানন্দ — আমার বরাবরই এর উল্টো। তাই আত্মীয় স্বজনরা বলতো এর কিছু হবে না।

একবার আমি বাবুরাম মহারাজের মাকে প্রণাম করলাম। উনি অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, ওমা এ কি করলে বাবা বামুনের ছেলে হয়ে!

তারপর তিনি আবার আমাকে উল্টো প্রণাম করলেন।

স্বামী রাঘবানন্দ — ঠাকুর তো ভক্তদের ভিতর জাতিভেদ মানতেন না। তবে কেন এঁরা এতো বাছবিচার করেন?

শ্রীম — ওঁর মনে কর অন্য স্ট্যাণ্ডার্ড ছিল। আমরা দেখছি (তর্জনী দিয়া শূন্যে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া) এইটুকু। আর উনি দেখছেন eternity-র (অনন্তের) দিক থেকে।

সম্মুখ ঠেলা বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু দুটি আরও প্রসারিত করিয়া শ্রীম বলিতেছেন ঃ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।। (গীতা ৪/৫)।

এই দেখ, বলছেন, 'তান্যহং বেদ সর্বাণি।' আমি পূর্বের সব জন্মের খবর জানি। আমার ও তোমার বহু জন্মের খবর জানি, — এর মানে আমি সর্বজ্ঞ তুমি অল্পজ্ঞ। তিনি কি আর ভক্তদের এই দু'দিনের পিতামাতা, বাড়ীঘর, জাতির খবর দেখেন?

ও একটা অবস্থা। শেষের দিকে ঠাকুর বলছেন, মা আমায় এমনি অবস্থায় রেখেছেন যে এখন একটি ব্রাহ্মণের হাতে রাঁধা না হলে খেতে পারি না। ওসব অবস্থার কথা। এক এক অবস্থায় এক এক রকম।

স্বামী রাঘবানন্দ — আজ আমি গঙ্গাধর মহারাজের (স্বামী অখণ্ডানন্দের) কাছে গিছলাম অদ্বৈতাশ্রমে। তিনি বললেন একদিন ঠাকুর গঙ্গাস্নান করছেন — সঙ্গে উনি। চাঁদনীর ঘাটে। খাতাঞ্চি শানে পা ঘষছে। এমন সময় একজন বুড়ো ব্রাহ্মণ এসে খাতাঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করছে, এ বাগানে কত লিচু গাছ, কত আম গাছ, জমা কত, পুকুরে মাছ আছে কি ইত্যাদি। ঠাকুর পাশ ফিরে দেখলেন, বিরক্ত হয়েছেন। তারপর ঘরে চলে গেলেন। গঙ্গাধর মহারাজ গঙ্গাজল নিয়ে সঙ্গে গেলেন। একটু পর ঐ ব্রাহ্মণটিও ওখানে এসেছেন। ওমনি ঠাকুর বললেন, 'হাঁ গা, তোমার কি আক্কেল! তিনকাল গেছে এককাল আছে। কোথায় ভগবানের নাম করবে, তা নয়। গঙ্গায় দাঁড়িয়ে এ সব কি কথা!' ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে হাজরা মশায়ের কাছে গিয়ে বসলো আর ঠাকুরের নিন্দা করতে লাগলো। গঙ্গাধর মহারাজ তা' শুনে এসে ঠাকুরকে রিপোর্ট করলেন। ঠাকুর বললেন, ওকি

শুনতে আছে? যাক্ গিয়ে, যাক্।

শ্রীম — ও দিয়ে গঙ্গাধরকেও শিক্ষা দিলেন কিসে ব্রাহ্মণ হয়। ওঁর একটু ব্রাহ্মণের অভিমান ছিল কি না! খুব আচারে থাকতেন।

তাই ঠাকুর বলতেন, 'ইদানিং ব্রাহ্মণ', 'ইদানিং ব্রহ্মজ্ঞানী'। মানে পূর্বের ভাব আর নাই।

শ্রীম (সহাস্যে) — হাজরাও একটি ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে একদিন বললেন, 'তুমি তো বড় পাজি? ওদের ওসব বললে ওরা দাঁড়ায় কোথা?' হাজরা ভক্তদের কাছে সোঽহং উপদেশ দিতেন। ওঁর নিজের ঐ ভাব ছিল কি না।

হাজরার ঐ (সোঽহং) বলার মানে — ওখানে (ঠাকুরের কাছে) যেও না, এখানে এসো।

ঠাকুর শ্যামসুন্দরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেন। বলতেন, আমি না করলে কেউ করবে না। ছবিদের প্রণাম, ধূপ দেওয়াও ঐ ভক্তদের জন্য।

'উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্।' — যদি আমি কর্ম না করি তা হলে এই সকল লোক উৎসন্ন হইবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে। যিনি আপ্তকাম তাঁর আবার কর্তব্য কি? 'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন', এই ত্রিলোকে আমার কোনও কর্তব্য নাই, আবার বললেন। তবে কেন করা? না, — 'মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ' — মানুষ সর্ব বিষয়ে আমাকে অনুসরণ করে। আমি না করলে কেউ কর্ম করবে না। (গীতা ৩/২২-২৪)।

এ শরীর যাওয়ার পূর্বে কাশীপুরে একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর ওখানে যাবেন? ঠাকুর উত্তর করলেন, কেন, মা কালী কি এখানে নেই? আর একজন বলেছিল, গঙ্গার ধারে গেলে বেশ হয়।

স্বামী রাঘবানন্দ — আর একটি ঘটনা বললেন, আজ গঙ্গাধর মহারাজ। একটি ভিখারী এসেছে। ঠাকুর বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ঐ ওখানে আছে। দে দিয়ে দে। যেন কত ঘেন্না

পয়সায়। গঙ্গাজলের জালার কাছে তাকে পয়সা ছিল। দেওয়ার পর বললেন, হাত ধুয়ে ফেল।

শ্রীম — ঐটিও গঙ্গাধরের শিক্ষার জন্য। তাঁর লেকচারের রকম দেখ। শত লেকচারে যা না হয় ঐ একটি ঘটনাতে তার ঢের বেশী কাজ হবে। আহা, কি শিক্ষা!

(সহাস্যে) একজনকে বলেছিলেন, পায়ের উপর পা রেখে বসে নস্যি নেওয়ায়, কি রে তুই এ বয়সেই বাল্যপৌগণ্ড যৌবন বার্ধক্য সব শেষ করে ফেললি! ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মত থাক্‌বি।

আর একজনের কথা শুনে বলেছিলেন, এরই মধ্যে লেকচার? ঐ ব্যক্তি বিডন স্কোয়ারে লেকচার দিত।

কাপ্তেনের গাড়ীতে উঠেছেন স্বামীজী। সামনের সিটে বসে পড়লেন। কত অনুরোধ পেছনের সিটে বসতে। ভ্রুক্ষেপও নাই — 'মানাপমানয়োস্তুল্যঃ' (গীতা ১৪/২৫)।

যাদের মন নিচের দিকে তারা ঐ নিয়ে মরে। কে একটু মান দিল না দিল সেদিকে লক্ষ্য নাই। লক্ষ্য নিজ আদর্শে। তা বলে স্বামীজী মান অপমান বুঝতেন না — তা নয়। ও সব তুচ্ছ জিনিষে লক্ষ্য নাই। ঠাকুর বলতেন কি না — নরেন, অখণ্ডের ঘর — নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বর কোটি। এই মানের জন্য সাধারণ মানুষের জিভের লাল পড়ছে।

স্বামী রাঘবানন্দ — গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, উনি পান খেতেন না। একদিন ঠাকুর তাঁকে বললেন, দেখ, নরেন এক গাল পান খায় আর কলকাতার রাস্তা দিয়ে চলে যায়। আর সকলকে নারায়ণ দেখে।

শ্রীম — হে, উটি দেখতুম্ কি না — যারা 'air give' করতো (চাল দিত) তাদের গ্রাহ্যই করতেন না স্বামীজী।

স্বামী রাঘবানন্দ — কি করতো?

জগবন্ধু — চাল দিতো।

শ্রীম (সহাস্যে) — এই যারা 'air give' করতো।

সকলে কিছুক্ষণ নীরব। পুনরায় কথা।

একজন ভক্ত — আপনার হাতে whitlow (আঙ্গুলহাড়া) হয়েছে?

শ্রীম — whitlow (আঙ্গুলহাড়া) নয় — তার ছোট ভাই, ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ বললেন। কেবল একজন বলেছিল whitlow (আঙুলহাড়া)।

শান্তি — হাত গলায় ঝুলিয়ে রাখলে হয়। পুঁজ হয়েছে, তাই টনটন করে।

শুকলাল — এই খেলো তুলো ব্যবহার করবেন না।

শ্রীম — ডাক্তার দুর্গাপদও তাই বললেন। তুলোর সম্বন্ধে আমরা খুব সাবধান। তাই নূতন তুলো আনতে গেলেন সুখেন্দুবাবু।

একজন সাধু (স্বগত) — কি আশ্চর্য! অবতারের পার্ষদ জীবন্মুক্ত পুরুষ, তাঁকেও কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। শ্রীমহাপুরুষের দিকে চাইলেও এই কথাই মনে হয়। তিনিও কত ভুগছেন। জীবনটাই প্রহেলিকা!

৩

আজ ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৯ খ্রীঃ, সোমবার। শ্রীম এখনও অসুস্থ। জগবন্ধু আজও শ্রীমহাপুরুষের ঔষধের জন্য অমর ডাক্তারের বাড়ি আসিয়াছেন। আজ সঙ্গে বিনয় মহারাজ। সেখান হইতে উভয়ে শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শ্রীম ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থিত মর্টন স্কুলের চারতলের ঘরে থাকেন। অসুস্থ বলিয়া তিনতলের উত্তর পূর্ব কোণের ঘরে মেঝেতে শুইয়া আছেন পূর্ব দেয়ালের পাশে। শ্রীম-র শিয়র দক্ষিণে। বিছানার পশ্চিমে মাদুরে কয়েকজন সাধু ভক্ত বসা — স্বামী রাঘবানন্দ, সুখেন্দু প্রভৃতি।

ঘরের দরজা দক্ষিণমুখী। তাহার কাছে একটা হ্যারিকেন মেঝেতে জ্বলিতেছে। এখন রাত্রি সাড়ে ছ'টা। বিনয় ও জগবন্ধু প্রণাম করিয়া শ্রীম-র সম্মুখে মাদুরে বসিলেন। তাঁহারা শ্রীম-র শরীরের সংবাদ লইতেছেন। শ্রীম বলিতেছেন — শরীর থাকলে এ সব আছে। এতে আশ্চর্য কি? সুখদুঃখ রোগ শোক এ থাকবেই। অবতার এসে এই

কথা বলে গেছেন, নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন।

স্বামী রাঘবানন্দ — আচ্ছা, ভক্তদের দুঃখ কষ্ট হয় কেন?

শ্রীম — ভক্ত কোথায়? তিনিই ভক্ত হয়ে খেলা করছেন। ভক্ত-ভাগবত-ভগবান এই তিনই এক, ঠাকুর বলতেন। সুখও তাঁর, দুঃখও তাঁর।

কেন তিনি এই সব করেছেন, এই পাঁক করেছেন? তবেই তো তার ভিতর থেকে পদ্মফুল ফুটবে? পাঁকের ভিতর থেকে পদ্মফুল ফোটে।

স্বামী রাঘবানন্দ — সকলেই জ্ঞানী হতে চায়। কেউ ভক্ত হতে চায় না।

শ্রীম (সহাস্যে) — কোথায় জ্ঞানী? It is not as plenty as black berries (জ্ঞানী কালজামের মত অসংখ্য নয়)। জ্ঞানী মানে যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন।

শ্রীম — ভাগ্যিস, আমরা ইংলিশ লজিক পড়েছিলাম। ওতে আছে — Fallacy of Ambiguity (দ্ব্যর্থ ভ্রম)। একটা শব্দের অনেক অর্থ থাকে। তা থেকেই ভ্রম-জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

জ্ঞানী যিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন তিনি। আর শাস্ত্রজ্ঞানী।

স্বামী রাঘবানন্দ — ঋষিকেশে একজনকে মন্দিরে যেতে বলা হল — গেল না।

শ্রীম (সহাস্যে) — হাঁ, ও এক মত আছে — অভ্যেস করছে 'নেতি নেতি'। কিন্তু যতক্ষণ দেহবুদ্ধি আছে ততক্ষণ ভক্তি। ও ছাড়বার যো নাই। এ সংসারের লোক কি নিয়ে সব রয়েছে — 'ye worshippers of Mammon'. প্রায় সকলেই কামিনী কাঞ্চনের পূজারী। চারদিকেই এই। এর কথা বল, লোক নেবে। ও (ঈশ্বরের) কথা বল, কেউ শুনবে না। সাধুরা যদিও এটা ছেড়েছে তবুও তাদের danger (বিপদ) খুব। চারদিকে অন্য রকম — মনকে টেনে নিচে নামিয়ে দেয়।

(সহাস্যে) লোকের কাছে শ্লোক ঝাড় তবে কল্‌কে পাবে। লোক

চায় এই সব self assertion (আত্ম-প্রতিষ্ঠা)। তাই একজন বলেছিলেন, Let me have a fit audience though few (সংখ্যা খুব কম হউক তবুও আমি উপযুক্ত শ্রোতা চাই)। হরি মহারাজকে ঠাকুর বলেছিলেন, ভাবছিস্ লাঠি মেরে মনকে উপরে তুলবি? তা হবে না। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। তাঁর কৃপা হলে তিনি মনকে উপরে তুলে দিবেন।

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। সন্ধ্যা অতীত। শ্রীম চেয়ারে উপবিষ্ট দক্ষিণাস্য। শ্রীম-র বাম হাতে ও সম্মুখে বেঞ্চেতে বসা অনেকগুলি ভক্ত। শ্রীম-র অসুখ সারিয়াছে। একজন সাধু বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন। তিনি প্রায়ই মহাপুরুষ মহারাজের ঔষধ লইতে ডাক্তার অমর মুখার্জীর বাড়ি আসেন। কিন্তু আজ আসিয়াছেন তাঁহার নিজের ঔষধের জন্য। তিনি অসুস্থ। শ্রীমকে প্রণাম করিয়া তিনি বসিয়াছেন। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তার কি বলিয়াছেন? সাধু উত্তর করিলেন, ডাক্তার মানা করিয়াছেন বেশী কাজে জড়িত হইতে। আর বলিয়াছেন যেখানে ধুলা বা ধূঁয়া নাই এমন স্থানে থাকিতে। বেশী দায়িত্বপূর্ণ কাজ না লইতে।

শ্রীম — তা'হলে দেখছি ঢাকা যাওয়া হচ্ছে না। ডাক্তার যখন ওরূপ বলেছেন তখন কি ওসব কাজ নেওয়া উচিত? ক্লাস করার খাটুনি কত! শাস্ত্র পড়তে হবে। তারপর debate, controversy (বাগবিতণ্ডা) রয়েছে। ও কাজে responsibility (দায়িত্ব) কত। আবার anxieties and worries (দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা) আছে। ওটাকামণ্ড তো বেশ ছিল।

স্বামী রাঘবানন্দ আসিয়া বসিলেন। ইনি এখানেই থাকেন। আর বেলুড় মঠ হইতে ব্রহ্মচারী উদয়ও আসিয়াছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — সন্ন্যাস জীবন — রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলতেন — বেওয়ারিশ মাল। অর্থাৎ দাবী করার কেউ নাই। রেল স্টেশনে ওরূপ অনেক মাল পড়ে থাকে। কেউ দাবী করে না। রোমান 'ল'তে আছে 'res nulius' — মানে,

nobody's property — বেওয়ারিশ মাল। Conception of possession and property (অধিকারবাদ ও সম্পত্তিবাদ) ও থেকেই এসেছে। প্রথমে জমি পড়ে ছিল, কারো দাবী নাই। একজন এসে বসে পড়লো আর ভোগ করতে লাগলো। তারই স্বত্ব হয়ে গেল। সন্ন্যাসীও তেমনি 'res nulius' — বেওয়ারিশ মাল। চার পাঁচটা কেস দেখেছি। আত্মরক্ষা করতে পারে নাই। অসময়ে শরীর গেল।

ওখানে (মঠে) সকলেই নিজের নিজের ভাবে struggle (চেষ্টা) করছে এগুতে। এখন কে কার খবর রাখে, — পারে না। যখন পড়ে যায় তখন দেখে।

সংসারে যারা আছে তাদের এই সুবিধাগুলো আছে, খাওয়া পরার। দেহ রক্ষার চিন্তা নিজের করতে হয় না। কিন্তু অসুবিধাও কত!

যোগীন স্বামী একজনকে বলেছিলেন, সঙ্গে যম নিয়ে যাচ্ছে। যক্ষ্মা রোগী চেঞ্জে গেছে সঙ্গে স্ত্রী, যুবতী স্ত্রী। বলেছিলেন, সেবার সুবিধা হবে। কিন্তু যম সঙ্গে — মৃত্যু শিয়রে। এক শ' হাত দূরে থাকতে হয় ঐ অবস্থায়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এই যে কাজ সংসারে, ঠাকুর বলতেন, তার absolute value (শাশ্বত মূল্য) নাই বটে কিন্তু relative value (আপেক্ষিক মূল্য) বড্ড আছে। এই পাঁক আছে বলেই তার ভিতর থেকে পদ্মফুল ফুটবে। এর ভিতর থেকেই তিনি মানুষ তৈরি করবেন।

যদি কাজ না থাকতো তবে সংসারই হতো না। সংসার মানেই কাজ — ভাল মন্দ কাজ। যার কাজ নাই তার সংসার নাই, বিরজ অর্থাৎ সন্ন্যাসী।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ (গীতা ৩/১৭)।

এই জীবন্মুক্তদের কতগুলি কাজ থেকে যায়। স্বাভাবিক কাজ,

শরীর ধারণের কাজ। আবার প্রারব্ধ। ভালমন্দ উভয়ই ভোগ করতে হয়। সমাধিস্থ হলে কেবল কাজ থাকে না। নিচে মন নামলেই কাজ। আবার কেহ কেহ লোক সংগ্রহের জন্য কাজ করে। দেখ যারা সর্বজয়ী তাদেরও কাজ করতে হয় — 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ' (গীতা ৫/১৯)। তাই বলছেন categorically (ব্যাপকভাবে) — 'ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ' (গীতা ১৮/১১)। শরীর থাকতে কর্ম ছাড়ার যো নাই। এ তো হলো সিদ্ধপুরুষের জীবন্মুক্তের জন্য ব্যবস্থা।

এরপর সাধকের ব্যবস্থা। এরা নিষ্কামভাবে সব কাজ করবে। কাজ দু'রকম — সুখদায়ক ও দুঃখদায়ক। এ দু'টোরই ফল ত্যাগ করতে হবে।

Ideal-টি (আদর্শটি) শুনিয়ে দিলেন — 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' (গীতা ২/৫৬)। সুখ দুঃখে মনকে স্থির রাখা। সমাধি হলেই কেবল এই অবস্থা হয়। এর পূর্বে লক্ষ্য রেখে এতে, সব কাজ করে যাও। আর মিলিয়ে নেও। জন্ম জন্ম অভ্যাস করতে করতে তাঁর কৃপায় ঐটি হয়। কিন্তু লেগে থাকতে হবে। আর প্রার্থনা। তারপর 'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্' (গীতা ৬/৪৫)।

গুরু যা বলেন, সে কাজ করতে হয় নিষ্কাম ভাবে। অর্থাৎ কাজের ফল বা benefit নিজে না নেওয়া। এইভাবে অগ্রসর হওয়া। কখনও মন আগে যাবে কখন পিছনে যাবে। এই করে করে যখন সব কামনা নাশ হবে তখন তাঁর কৃপায় সমাধি লাভ হয়। সাধক এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছাবে যেখান থেকে আগে যেতে পারবে না আর পিছনেও যেতে মন চাইছে না। তখন দিবানিশি প্রাণ থেকে প্রার্থনা আসে, হে পরমাত্মা কৃপা কর। এটি শরণাগতি অবস্থা। যেন মাস্তুলে এসে ক্লান্ত হয়ে পাখী বসেছে। তারপর তাঁর কৃপায় তাঁর দর্শন লাভ হয়।

ঠাকুর সহজ পথেই এই অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন। বলেছেন, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ, তিনি দর্শন দিবেনই দিবেন। তিনি

নিজে এ পথে গেছেন। এ যুগের বিশেষ করে উপযোগী এ পথ।

একজন সাধু — আচ্ছা, একজন যদি নিজের শরীরের জন্য ভাবে, যত্ন নেয়, তাহলে সেই শরীরের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ আছে তাদেরও তো যত্ন নেওয়া উচিত, তাদের জন্য ভাবা উচিত?

শ্রীম — হাঁ। কি রকম ভাবে ওদের যত্ন নিতে হয়? না, ঈশ্বর ঐ শরীরগুলোর ভিতর আছেন এই বলে যত্ন নেওয়া। ঈশ্বরের সেবা করা ঐ শরীরগুলোতে। তা হলে অন্য লোকের মত sticky (মোহগ্রস্ত) হবে না; আসক্ত হবে না। হয়তো তাদের কাছে গেল, দেখে শুনে চলে এল।

দু'টোই পথ। একটা 'নেতি নেতি'। ত্যাগীরা এ পথ ধরে। আর একটা 'ইতি ইতি' — গৃহে যারা আছে তাদের পক্ষে এ পথ। এর মানে, ঈশ্বর সর্বভূতে সর্ব জীবে — পরিজনে রয়েছেন। যখনই মোহ আসবে তখনই ঈশ্বর ঐ সব শরীরের ভিতর রয়েছেন এইটি ভাবতে হয়।

একজন সাধু — ঈশ্বরকে ধরে থাকার মানে কি?

শ্রীম — তাঁর মহাবাক্য মেনে চলা। সত্য, পবিত্রতা, সংযম অভ্যাস করা, সর্বভূতের ভিতর তাঁকে দেখার অভ্যাস করা। আর সর্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করা। এইসব করলে তাঁর কাছে থাকা যায়। আর ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন, ভালমন্দ দুটো আছে। ভালটা ধরে থাকা।

উদয় ও আর একজন সাধু বেলুড় মঠে যাইবেন। তাঁহারা মিষ্টি মুখ করিয়া উঠিলেন। শ্রীম উদয়কে বলিলেন, এঁর শরীরটা তেমন ভাল নয়। আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যান, কষ্ট না হয়। রাত্রি প্রায় আটটা।

বেলুড় মঠ, হাওড়া।
৩০শে ডিসেম্বর ১৯২৯ খ্রীঃ, সোমবার।

বিংশ অধ্যায়

যাবৎ কায়া তাবৎ মহামায়া

১

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদ। অপরাহ্ন পাঁচটা। আজ লক্ষ্মীপূর্ণিমা। বিজয়ার প্রণাম করিতে সাধু ভক্তগণ সারাদিন আসিতেছেন। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। সাধু ভক্তগণ বসা বেঞ্চেতে। একজন সাধু আসিয়া শ্রীমকে প্রণাম করিতেই শ্রীম বলিলেন, বসুন বসুন, এই মিষ্টিমুখ করুন। শ্রীম-র হাতে একটি মাটির খুরি। তাহাতে রসগজা। তিনি দাঁড়াইয়া সকলকে হাতে রসগজা পরিবেশন করিতেছেন। এই সাধুটি সকালে বেলুড় মঠ হইতে বাঁকা রায়ের গলীতে স্টুডেন্টস্ হোমে আসিয়াছিলেন। অপরাহ্নে মুক্তারামবাবু স্ট্রীটস্থ অদ্বৈতাশ্রম হইয়া শ্রীম-র কাছে আসিয়াছেন। শ্রীম-র নিজ হাতে দেওয়া রসগজাটি হাতে করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। ভাবিতেছেন, অবতারের হাত থেকে এই অমৃত লইবার সৌভাগ্য হয় নাই। কিন্তু তাঁর নিজ হাতে গড়া অন্তরঙ্গ পার্ষদের হাত হইতে উহা পাইয়াছি। সত্যই আমরা ধন্য। স্থূল শরীরে এ সৌভাগ্য দুর্লভ।

সাধুটি শ্রীমকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। শ্রীম-র পরণে সাদা পাড় ধুতি। গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী। বুকের কাছে পাঞ্জাবীটা একটু ছেঁড়া আড়াআড়ি ভাবে। কাপড় জামা তেমন পরিষ্কার নয়। পায়ে বার্নিশ করা কাল চটিজুতা। জামার উপর গায়ে জড়ান ডোরাদার একখানা গামছা। শ্রীম-র শ্মশ্রু ও কেশ পাকা হইলেও ধবধবে সাদা নয়। কপালের পাশে ও ঘাড়ে কিছু কেশ আছে। তালু প্রায় উন্মুক্ত। স্নানের সময় মাথায় তেল মাখেন। তাহার চিহ্ন কেশে বিদ্যমান। মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইলেও আজ শ্রান্তির চিহ্ন বহন করিতেছে। সারাদিন সাধু-

ভক্ত সমাগম হইয়াছে। আজ মোটেই বিশ্রাম নাই। কিন্তু উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সুমুখ-ঠেলা নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি ফ্যাল ফ্যাল — যেন মন এ জগতের ঊর্ধ্বে পরমব্রহ্মে লীন। শ্রীম যেন যন্ত্রের মত বাহ্য ব্যবহার করিতেছেন। সাধু ভাবিতেছেন এই চক্ষু দুইটিকে ঠাকুর শালগ্রাম বলিয়াছিলেন। আর ইহাদের ভিতর সমগ্র বিশ্ব দর্শন করিয়াছিলেন। অথবা যেন ডিমে তা দেওয়া পাখীর মত শ্রীম-র দৃষ্টি উদাসীন। এখন শ্রীম-র বয়স সাতাত্তর চলিতেছে। তবুও সৈনিকের মত সোজা হইয়া বসিয়া আছেন। সন্ধ্যায় দেড় ঘন্টা শ্রীম স্থির হইয়া বসিয়া ধ্যান করেন। অসুখ বলিয়া ইদানীং তুলসী তলায় দাঁড়াইয়া প্রণাম করেন।

শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। সম্মুখে কয়েক সারি বেঞ্চেতে ভক্তগণ বসা। শ্রীম-র বাম হাতে তিনখানা বেঞ্চের উপর সতরঞ্জি পাতা। সাধুরা ইহাতে বসেন। এখন অন্তেবাসী উহাতে বসিয়া আছেন। ভাটপাড়ার ললিত, হিমাংশু, বরানগরের অনাথ আশ্রমের কর্মী সুধীর, স্বামী নিগমানন্দ প্রভৃতি আসিয়াছেন। স্বামী নিগমানন্দ গয়াতে আশ্রম করিয়াছেন। ওখানে থাকেন। শ্রীম তাঁহার নিকট গয়ার সংবাদ লইতেছেন।

শ্রীম (ললিতের প্রতি) — ইনি গয়াতে নির্জনে থাকেন বেশ।

স্বামী নিগমানন্দ — এখন রামায়ত সাধুদের সঙ্গে থাকি। আর রোজ দুই বেলা দুই স্থানে ভিক্ষা করি।

শ্রীম — ওরা বুঝি ভাড়া নেন না? ভাল লোক বুঝেছেন তাই নেন না — নির্দোষ লোক। আচ্ছা ওঁদের তুমি ঠাকুরের কথা বল? 'এই গয়া থেকেই ভগবান গিয়ে দরিদ্র ক্ষুদিরামের গৃহে জন্ম নিয়েছেন' ইত্যাদি?

স্বামী নিগমানন্দ — আজ্ঞে না। ওঁরা রামায়ণ পড়েন, আমি শুনি।

শ্রীম — তুমি পড় না কিছু?

স্বামী নিগমানন্দ — পড়ি, গীতা, চণ্ডী।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — মঙ্গলনাথ বলেছিলেন, সাধু মানে নির্দোষ, যার দোষ নাই।

শ্রীম (সাধুর প্রতি) — সাধুর হয়তো সাধুসঙ্গ, নয়তো নিঃসঙ্গ। বেশ আছ ওখানে। গয়া কি কম স্থান! ওখান থেকে জ্ঞান, ভক্তি সব এসেছে। চৈতন্যদেব গয়া থেকে ফিরে এসে আর সে মানুষ নাই। কানাইয়ের নাটশালায় ঈশ্বরকে দর্শন করেছিলেন।

ললিত — শ্রীকৃষ্ণকে।

শ্রীম — আবার বুদ্ধদেব। আর ঠাকুর। এই তিনজন অবতার গয়ার সঙ্গে জড়িত।

স্বামী নিগমানন্দ — সপ্তাহে একদিন বিষ্ণুপাদপদ্মে যাই। আর সুবিধা হলে বুদ্ধগয়া যাই।

শ্রীম — বুদ্ধগয়ায় নরেন্দ্র ছিলেন। সঙ্গে আর কেউ কেউ ছিল। তখন ঠাকুরের শরীর আছে। ওখান থেকে ফিরে এসে নরেন্দ্র ঠাকুরকে বুদ্ধদেবের বিষয় বলেছিলেন। 'বুদ্ধদেব খুব উঁচু প্লেন থেকে কথা কয়েছিলেন'। খুব demonstrative description (জীবন্ত বর্ণনা) করলেন। ঠাকুর সব শুনলেন, তারপর নিজের বুক দেখিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এখানে সব হয়ে গেছে, কি বল' (হাস্য)? তখন নরেন্দ্র বললেন, 'আজ্ঞে হাঁ, তা বটে তা বটে'। বাজনার বোল মুখস্থ করা খুব সহজ কিন্তু হাতে আনা বড় কঠিন।

স্বামীজীর মুখে এই ভাবে (শ্রীম নিজ মুখে দক্ষিণ হস্ত চালনা করিয়া) হাত বুলিয়ে ঠাকুর বললেন, 'এ মুখ কি জ্ঞানীর! এ ভক্তের মুখ!' জ্ঞান বিচার যারা করে তাদের মুখ একটু শুষ্ক হয় বুঝি?

আর একবার বলেছিলেন, 'এই যে তুমি আমার জন্য ভাবছো, আমাকে দেখছো শুনছো' — ঠাকুরের অসুখ হয়েছিল কিনা, — 'একেই ভক্তি বলে'। বেদান্তের দিক দিয়ে ও (অবতারবাদ) টেঁকে না।

আর একবার নরেন্দ্র মা-ঠাকুরণের কাছে গেলেন ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর! মা যেমন ঘোমটা টেনে থাকতেন তেমনি আছেন। নরেন্দ্র পেন্নাম করছেন আর বলছেন, 'মা এখন দেখছি সব স্বপ্ন'। মা বললেন, 'হাঁ বাবা। কিন্তু দেখো আমায় যেন উড়িয়ে দিও না।'

তখন স্বামীজী বললেন, 'না মা, তা কেমন করে হয়?' কেমন eye opener (জ্ঞান বিকাশিনী) মায়ের এক একটি কথা!

শিষ্য কি গুরুকে চিনতে পারে? গুরুই শিষ্যকে চিনেন। একবারেই কি বুঝতে পারে শিষ্য? অনেক দিন লাগে বুঝতে! যেমন পদ্ম ফুটতে অনেক দিন লাগে, থাকেও তেমনি অনেক দিন। আর সব ছোট ফুল এই ফুটছে, এই ঝরছে! দেখ না, যখন নরেন্দ্র বুঝলেন ঠাকুর অবতার তখন জগতের সামনে গিয়ে প্রচার করলেন কি ভাবে!

পূর্বাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছে সায়েন্স কলেজের ধ্বজাদণ্ডের উপর দিয়া। একটি সাধু উহা দর্শন করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, এই দিনে ঠাকুর কেশব-সঙ্গে নৌকা বিহার করেন। শ্রীমও চাঁদ দেখিতেছেন। আবার কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, নরেন্দ্র কি সব স্তব-স্তুতিই না লিখেছেন! এই সব মঠ ও আশ্রমে নিত্য পাঠ হয়।

বরানগরের সুধীর মাঝে মাঝে স্বামীজীর জীবন কথা বলিতেছে। শ্রীম-র সেদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি আপন মনে স্বামীজীর চিন্তায় মগ্ন।

শ্রীম — হাঁ সতীনাথ বাবু, বল তো মুখে মুখে আরতিটি! সাধু ও ভক্তগণ সকলে আবৃত্তি করিতেছেন। শ্রীমও সঙ্গে যোগদান করিলেন।

খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়॥ ইত্যাদি।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — দেখ কি বলছেন স্বামীজী। ঠাকুর নির্গুণ আবার সগুণ! সাকার আবার নিরাকার! আবার জগদীশ্বর ও যোগেশ্বর!

আবার বলছেন, তোমার শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র সম্বল। যারা তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় নেয় তাদের কাছে এই ভবসমুদ্র যেন গোস্পদের জল — এমনি সামান্য, তুচ্ছ!

বলছেন, 'নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত'। অর্থাৎ তোমার এই সাকার রূপ সত্য — আবার তোমার নিরাকার নির্গুণ বাক্যমনের

অতীত জ্যোতির্ময় রূপও সত্য।

এইসব স্তব সমগ্র জগতে পাঠ হচ্ছে — ইউরোপ আমেরিকা পর্যন্ত।

একটা লেকচারে বলেছিলেন ঠাকুরকে — my hero, my guide, my philosopher and my everything (আমার উপাস্য দেবতা, সঞ্চালক ও উপদেষ্টা — আমার সর্বস্ব)।

দেখ না, আবার কি গান বেরিয়েছে তাঁর ভিতর থেকে! এর সবই তাঁর নিজের অনুভব।

গান।

একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ অতীত-আগামী-কালহীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।
সেথা হ'তে বহে কারণ-ধারা, ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি, 'অহমহমিতি' সর্বক্ষণ।।

(শ্রীম-র বিস্মৃতিতে ললিত ও শ্রীম-র যুগ্ম আবৃত্তি)

সে অপার ইচ্ছা-সাগরমাঝে অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি, কত গতিস্থিতি কে করে গণন।।

শ্রীম (ললিতের প্রতি) — এখানে আসুন না।

ললিত বেঞ্চ ছাড়িয়া নিচে গিয়া মাদুরে শ্রীম-র কাছে বসিলেন। পুনরায় আবৃত্তি। যেখানে শ্রীম ঠেকিতেছেন সেখানে ললিত বলিতেছেন।

কোটি চন্দ্র, কোটি তপন, লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহা ঘোর রোলে ছাইল গগন, করি দশদিক্ জ্যোতিঃমগন।
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী, সুখদুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য, তারি কিরণ, যেই সূর্য সেই কিরণ।।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তারপর আবার কথা।

শ্রীম (সতীনাথের প্রতি) — ঐ গানটি একবার বল তো?

সতীনাথ মুখে মুখে ধীরে ধীরে বলিতেছে। শ্রীম স্পষ্ট শুনিতে

পান নাই। তাই তাহাকে বলিতেছেন, এখানে এসে এতে বসে বল। আমি কালা। সতীনাথ এইবার শ্রীম-র পিছনে বেঞ্চের উপর বসিয়া বলিতেছে। এই যুবক ইদানীং যাতায়াত করে। মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল। বয়স ২৬/২৭, কণ্ঠস্বর মধুর। সতীনাথ আবার মুখে মুখে বলিতেছে।

গান। লম্বিত গলে মুণ্ডমাল, দম্ভিতা ধনি মুখ-করাল
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিতা ভয়ে মেদিনী।।
দিগ্বসনা চন্দ্র-ভাল, এলায়ে পড়েছে কেশজাল,
শোভিত অসি করে, কপাল প্রখরা শিখরি-নন্দিনী।।
চারিদিকে কত দিকপাল, ভৈরবী শিবা তাল-বেতাল,
অতি অপরূপ রূপ বিশাল, কালী কলুষ নাশিনী।।

শ্রীম ধ্যানস্থ হইয়া গান শুনিতেছেন। গান শেষ হইলেও কিছুকাল ধ্যানস্থ। শ্রীম পুনরায় স্বামীজীর মহিমা কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আগে যে গানটি হলো সেটি স্বামীজীর রচিত। ভাব ও অনুভব তাঁর নিজস্ব। ঠাকুর তাই বলতেন 'লরেনের' অখণ্ডের ঘর। আর দ্বিতীয় গানটির ভাব ঠাকুর ওঁর ভিতর ঢুকিয়ে দিছলেন। সেই অখণ্ডেরই শক্তিরূপ। সেই অখণ্ডই স্বীয় শক্তি সহায়ে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করছেন। এ ভাবটি ঠাকুরের কৃপায় পরে এসেছিল।

ঠাকুর সর্বদা বলতেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যখন স্বরূপাবস্থায় থাকেন তখন বলি ব্রহ্ম। যখন সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন তখন বলি শক্তি — আদ্যাশক্তি, কালী। স্বামীজীকে ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি যাকে ব্রহ্ম বল আমি তাঁকেই কালী বলি।

আহা, নরেন্দ্র যখন মানলেন মাকে তখন ঠাকুরের কত আনন্দ। ভক্তদের বলছেন আহ্লাদে — 'লরেন মাকে মেনেছে'। বাপের যেমন আহ্লাদ হয় ছেলে কথা মেনে নিলে তেমনি আহ্লাদ আজ ঠাকুরের।

কেন এই মানাবার জন্য চেষ্টা? স্বামীজীকে যে জগৎগুরু আচার্য

বানাবেন! তাই দুটো ভাব জানারই দরকার, নিরাকার নির্গুণ আবার সাকার সগুণ। সংসার আদ্যাশক্তির এলাকা। এখানে কিছু করতে হলে তাঁকে আগে প্রসন্ন করতে হয়। আদ্যাশক্তিরই অবতার, ঠাকুর বলতেন। রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য এঁরা আদ্যাশক্তিকে প্রসন্ন করে তবে অবতার লীলা করেন। তাই এই দুটো ভাবেরই দরকার। আর দুটোই বা বলা কেন? একটা বস্তুরই দুটো দিক।

স্বামীজী যখন শক্তি স্বীকার করলেন তখন ঐ বললেন গানে, 'তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ'। মন অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। আবার দেখলেন, সেই অখণ্ডই ব্রহ্মাণ্ডরূপ ধারণ করেছেন। জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সুখ দুঃখ, জন্ম মরণ — এ সবই তিনি হয়েছেন। তাই বললেন, 'যেই সূর্য সেই কিরণ'।

ঠাকুর কৃপা করে অন্তরঙ্গদের এ সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। তবেই তো তাঁদের ভিতর একেবারে ফাঁক! অন্তরঙ্গদের কতকগুলিকে ঘরে রেখেছেন। আবার কতকগুলিকে সব ছাড়িয়ে নিয়েছেন। ভক্তদের সগুণ নির্গুণ দুই ভাবেরই জ্ঞান আছে তাঁর কৃপায়। তা না হলে প্রচার হয় না। এই দুই ভাব যখন ভক্তরা নিলেন তখন ঠাকুর নিশ্চিন্ত, যেমন বাপ মা হয়। তাই অবতার, গুরু অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

২

শ্রীম-র সম্মুখে পূর্ণিমার চাঁদ। তিনি এক একবার এই চাঁদ দেখিতেছেন। আবার কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গানে শুনলেন ব্রহ্মশক্তিকে বলা হয়েছে 'চন্দ্রভাল' — ললাটে চাঁদের তিলক। এই চন্দ্র দর্শন করুন আপনারা। এটা তাঁর সংহারমূর্তির গান। তিনি আবার সৃজন করেন, পালন করেন। পালনের জন্য এই চাঁদকে, সূর্যকে পাঠিয়ে দেন। তিনি ভয়ঙ্করা আবার স্নেহময়ী জননী।

সতীনাথ — এই গানের একটি ছবি আমরা যে ঘরে থাকি ঠাকুর বাড়িতে (শ্রীম-র গৃহে) সেই ঘরে রয়েছে।

শ্রীম — বটে! যারা ও ঘরে থাকে তাদের বলবে দু'চারখানা বাতাসা দিতে, তবে ঠাণ্ডা থাকবেন। ঠাকুর কার বাড়িতে গেছেন, ওখানে এই ছবি দেখে বললেন, এ সব ছবি এমনি রাখতে নেই, পুজো দিতে হয়। বলবে ওদের বাতাসা দিতে।

ললিত — নন্দ বসুর বাড়িতে, বাগবাজার। শেষে তারা মঠে পাঠিয়ে দেন ঐ ছবি।

একজন ভক্ত — তাহলে আমরা ঠাকুরবাড়ির ছবিখানাও মঠে পাঠিয়ে দিব।

শ্রীম — পুজো দিবে তবে ঠাণ্ডা থাকবেন। আমরা সর্বদা এই প্রার্থনা করি — 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৪/২১)। আমরা চাই তোমার দক্ষিণ মুখ মানে দয়াল মুখ, প্রসন্ন মুখ — প্রচণ্ড মুখ নয়। অর্জুন প্রচণ্ড মুখ দেখে একেবারে কাঁপতে লাগলেন। আর বললেন, ঠাকুর এ রূপ সম্বরণ কর। তোমার সৌম্য রূপ দেখাও। এ রূপ দেখে তখন ধাতস্থ হলেন।

ঠাকুরবাড়িতে আজকাল থাকেন মনোরঞ্জন, মোটা সুধীর, যতীন ও সতীনাথ।

শ্রীম — যাঁরা ওখানে থাকেন তাঁরা যেন পুজো দেন। আমরা সব ফাক্কাবাজী দেখতে চাই না। যারা ঐটি দেখতে চায় তাদের দেখাক। আমরা তাঁর শরণাগত। আমরা সর্বদা তাঁর সৌম্য স্নেহময় রূপ চাই — মাতৃরূপ।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব। আবার কথামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (স্বগত) — 'কিয়া হুয়া'? 'ঝাড়া হুয়া, পঁচাস বার'। 'যাও, তবে মা'র কাছে গিয়ে বল' — 'ঝাড়া জব হুয়া, মার কাছে যাও'। (অন্তেবাসীর প্রতি) শিষ্য গুরুকে বললেন।

অন্তেবাসী — ঠাকুর তোতাপুরীকে বলেছিলেন।

শ্রীম — হাঁ। 'ঝাড়া হুয়া' তো বল গিয়ে মাকে। এপারে (সংসারে) যখন রয়েছ তখন মাকে মানতেই হবে। শরীর যত দিন ভাল থাকে তত দিন 'সোঽহং' বলা চলে। 'ঝাড়া' (পেটের অসুখ) হলেই মাকে,

জগদম্বাকে বলতে হয় (হাস্য)।

তোতাপুরী typical (আনুষ্ঠানিক) বেদান্তবাদী — সোঽহং মতে সিদ্ধ পরমহংস। ব্রহ্মশক্তিকে মানেন না। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' অভ্যাস করে সিদ্ধ হয়েছেন। বাংলার জলবায়ুতে দীর্ঘ এগার মাস ছিলেন ঠাকুরের কাছে। তা'তে শরীর ভেঙ্গে যায়। পেটের খুব অসুখ চলছে। কষ্টে গঙ্গায় শরীর ত্যাগ করারও সংকল্প করেছিলেন। ঠাকুর বললেন, শরীর ত্যাগ করবো বললেই হয় না। মহামায়ার এলাকায় রয়েছ যতদিন শরীর আছে। মাকে মান, তবে মন স্থির থাকবে দুঃখেও। ঠাকুরের কৃপায় তোতাপুরী শেষে মাকে মেনেছিলেন। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত পরমব্রহ্ম, তিনি লীলাতে শক্তিরূপ ধারণ করেন। তখন জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। যতদিন দেহজ্ঞান ততদিন ব্রহ্মশক্তিকে পুজো দিতেই হবে।

তোতাপুরীর একটা নূতন অভিজ্ঞতা ঠাকুর করিয়ে দিলেন। যিনি ব্রহ্ম তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, ঠাকুর এই অবস্থাটাকে বিজ্ঞানীর অবস্থা বলতেন। ঠাকুর এই অবস্থাটি তোতাপুরীকে উপহার দিলেন গুরুদক্ষিণারূপে। যে চূণ সুরকীতে ছাদ তৈরি তাতেই সিঁড়িও তৈরি, এ জ্ঞান লাভ করে তোতাপুরী তবে যান।

যিনি তিন দিনের বেশি এক স্থানে থাকতেন না সেই কঠোর জ্ঞানী এগার মাস ঠাকুরের কাছে ছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, মা বলেছেন তোমার যাবার যো নাই, থাকতে হবে। যাবৎ না মহামায়া ছাড়বেন।

দেখ যে ব্যক্তি 'হাততালি দিয়ে গান'-কে বলেছিলেন, 'কেঁও রোটী ঠোকতা কেঁও'? তিনিই আবার এক সময়ে ঠাকুরের মুখে মায়ের গান শুনে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন। অবাক্ হয়ে বলতেন, আরে, 'এ কেয়া রে?' মনকে সবলে টেনে নিয়েছে গানের ভাব। কঠোর জ্ঞানী এখন প্রেমিক বিজ্ঞানী।

কেবল শাস্ত্র পড়ে কি এ বোঝা যায়? চোখে দেখলে তবে বোঝা যায়। আর লোক অবাক হয়। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে —

ব্রহ্মজ্ঞানী নিজের মালিক নিজে, যা খুশি করতে পারে। এরও উপরে যে মহাশক্তি রয়েছে, তার যে অধীন সব শরীরধারী, এ লীলাতে এইটে দেখালেন ঠাকুর! প্রারব্ধ ভোগ সকলেরই করতে হয়, জ্ঞানীরও — কেবল এ কথা স্বীকার করলে চলবে না। প্রারব্ধ ভোগের উপরে রয়েছেন ব্রহ্মশক্তি মহামায়া। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। তাঁর হাতে সব। দেখ না, পরমহংস জ্ঞানীকেও নিজের ইচ্ছা মত কাজ করতে দিলেন না — তাঁকে স্বীকার করতেই হল — শক্তিও সত্য। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।

ঠাকুরই এই ব্রহ্মশক্তি কালী। কিন্তু লীলার জন্য ভক্ত ও ভগবান, ছেলে ও মা — রূপ ধারণ করেছিলেন।

দেখনা — স্বামীজীকে নির্বিকল্প সমাধি দিলেন। অনেক দিন থেকে স্বামীজী ঐটে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাশীপুরেই দিলেন আবার ওখানেই বললেন, চাবিকাঠি রইল আমার হাতে। মায়ের কাজ কর গে। সময় হলেই খুলে দিব। ঐ চাবি খুলে দিলেন ক্ষীরভবানীতে।

স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন, এই দশটা বছর যেন নাকে দড়ি দিয়ে আমায় নাচাচ্ছে। ক্ষীরভবানীর ঐ ঘটনার পর স্বামীজীর অবস্থা বদলে গেল। পরমহংস অবস্থা তখন স্বামীজীর।

অন্তরঙ্গদের সাকার নিরাকার জ্ঞান দিয়েও তাঁর হাতে রেখেছেন। আর একজনকে বলেছিলেন, তোমায় মায়ের একটু কাজ করতে হবে। তা পঞ্চাশ বছর ধরে ঐ কাজ করতে হচ্ছে। ছাড়বার যো নাই তিনি ছুটি না দিলে।

তিনি প্রারব্ধও ক্ষয় করে দিতে পারেন, আবার নূতন প্রারব্ধও লাগিয়ে দিতে পারেন।

দেখ না, জগদম্বাকে প্রার্থনা করেছেন ভক্তের ভাবে ঠাকুর আর বলছেন 'মা একে বাঁধ তোমার মায়া দিয়ে। নইলে শরীর ছেড়ে চলে যাবে।' স্বামীজীর সম্বন্ধে বলেছিলেন।

শংকরাচার্যকেও এই বিজ্ঞানীর অবস্থা মানতে হয়েছে। শোনা যায়, দশাশ্বমেধ ঘাটে বৃদ্ধা সেজে মা তাকে শক্তি স্বীকার করতে

বাধ্য করান। শংকরের অসুখ, জলতৃষ্ণা পেয়েছে। অনেক নিচে জল, নাবতে পারছেন না অসুখ বলে। পাশে একটি বৃদ্ধা ছিলেন। তাকে বললেন জল এনে দিতে। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজেই কেন নিয়ে আস না জল, যুবক তুমি? উনি বললেন আমি অসুস্থ — শক্তি নাই শরীরে। তখন মা বলেন, ও, তাহলে শক্তিকে স্বীকার না করে পারছ কি? শংকরের যেন চট্‌কা ভাঙ্গলো। তারপর দেবীকে স্তবে প্রসন্ন করলেন। তখনই বললেন, 'আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং তদীয়ং, ক্ষুধাতৃষ্ণার্থ জননীং স্মরন্তি।' 'গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।'

এ প্রহেলিকা কেবল বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারা যায় না। মহামায়ার কৃপায় বোঝা যায়। অবতারাদির জীবন দেখলে কতকটা বোঝা যায়। 'যাবো তাঁর আণ্ডারে' — ঠাকুরের এই শেষ কথা।

ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তে আছে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দিতেও পারেন আবার নীচে নামিয়েও দিতে পারেন। একজন ভক্তকে ঠাকুর বললেন, ঈশ্বর-কোটি। আবার ঠাকুরের অসুখের সময় বললেন, ও এখানকার নয়। এলো। দেখে চলে গেল। যে আপনার লোক সে কি তা পারে? 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণ মুখং.....।'

বেলুড় মঠ।
৭ই অক্টোবর ১৯৩০ খ্রীঃ, মঙ্গলবার।

একবিংশ অধ্যায়

বিজয়ায় সাধু সম্মিলনে

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন প্রায় ছয়টা, লক্ষ্মী পূর্ণিমা। শ্রীম ভক্ত পরিবৃত হইয়া চেয়ারে বসিয়াছেন উত্তরাস্য। বিজয়ার প্রণাম করিতে সাধু ও ভক্তগণ আসিতেছেন যাইতেছেন সারাদিন। ব্রহ্মশক্তির বিচিত্র খেলার কথা হইতেছে। শ্রীম আবৃত্তি করিতেছেন, 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং' — আবৃত্তি শেষ হইবার পূর্বেই সবেগে স্বামী বিরজানন্দ প্রবেশ করিলেন। ইনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। বাল্যাবধি শ্রীম-র অতি প্রিয় ও স্নেহভাজন। শ্রীম মায়ের মত উঠিয়া আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে আসনে বসাইলেন। স্বামী বিরজানন্দ শ্রীম-র সকল বাধা না মানিয়া জোর করিয়া পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীম পুনরায় পূর্বানুবৃত্তি করিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্' (শ্বেতা ৪/২১)। তোমার যে দয়াল মুখ, প্রসন্ন ভাব, তা দিয়ে আমাদের রক্ষা কর, ঋষিরা এই প্রার্থনা করেছেন।

ভৃত্য হ্যারিকেন দিয়া গেল। শ্রীম হাততালি দিয়া, 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে লাগিলেন। স্বামী বিরজানন্দকে বলিলেন, এসো আমাদের ঠাকুরঘর দেখবে। উভয়ে উঠিয়া গিয়া শ্রীম-র শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তেবাসীও গেলেন। ভক্তরাও কেহ কেহ প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম পূর্ব দেয়ালের টাঙ্গান ছবিদের আলো দেখাইতেছেন।

শ্রীম (স্বামী বিরজানন্দের প্রতি) — তুমি তো বরানগর মঠে

ছিলে? এই সব ছবি তখনকার — প্রেমানন্দ, নরেন্দ্র, রাখাল এঁদের ছবি।

এই পাখীর ছবিটি ঠাকুরের শরীর গেলে করান হয়। আমায় বলেছিলেন, পাখী ডিমে তা দিচ্ছে, এরূপ একখানা ছবি করাতে পার — ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি? এতে যোগের উদ্দীপন হয়।

(দক্ষিণ দেয়ালে) এই দেখ প্রয়াগে কুম্ভের ছবি। এগুলি কৃষ্ণের।

পূর্ব দেয়ালে একটি খোল টাঙ্গান আছে। শ্রীম কয়েকবার চাটি দিয়া বাজাইলেন। ঘর মেরামত হইয়াছে। মেঝেতে সিমেন্টের দাগ রহিয়াছে। ঘর ভিজা। পশ্চিম-দক্ষিণে একটি টেবিল। সেটি পুস্তকপূর্ণ, আর পাশে কয়েকখানা চেয়ার।

স্বামী বিরজানন্দ — বেশ বড় ঘর। আমার ধারণা ছিল ছোট।

শ্রীম সকলকে লইয়া পুনরায় ছাদে আসিলেন। সাধুদিগকে জোড়া বেঞ্চেতে বসাইয়া শ্রীম 'তপোবনে' তুলসীতলায় যাইতেছেন। বলিলেন, তোমরা বসো, আসছি। স্বামী বিরজানন্দ বলিলেন, আমরাও আসি, আপনি এখন বসবেন। শ্রীম পুনরায় বলিলেন, না, না। একটু বসো আসছি। শ্রীম-র সঙ্গে একজন ভক্ত হ্যারিকেন লইয়া গেলেন, তুলসীতলায় আলো দেখাইতে হইবে।

স্বামী বিরজানন্দ প্রাচীন সাধু। কিন্তু কি আশ্চর্য, শ্রীম-র কাছে যেন একটি ছোট ছেলে। আধ আধ মিষ্টি ভাষণ — যেমন পিতামাতার কাছে করে থাকে মানুষ! বড়ই মধুর ব্যবহার। শ্রীম ফিরিয়া আসিয়াছেন।

স্বামী বিরজানন্দ — আপনি কেমন আছেন, দুধ কতটা খান, সন্দেশ খান কি?

শ্রীম — দুধ একসের হয়; সন্দেশ মাঝে মাঝে হয় আজকাল।

স্বামী বিরজানন্দ — মহাপুরুষ মহারাজও মাঝে মাঝে আমাদের ভয় দেখান।

আজকাল ছেলেদের মত হয়ে গেছেন — অনেকবার খাওয়া, অনেকবার শোওয়া।

শ্রীম — আমরাও ইদানীং এই সব করছি।

স্বামী বিরজানন্দ — তবুও আপনার তো রাত্রি ন'টা দশটা পর্যন্ত ঈশ্বরীয় কথাবার্তা কইতে হয়। একটা ইজি-চেয়ারে বসলে হয় না?

একজন ভক্ত (স্বগত) — শ্রীম ইজি-চেয়ারে কখনও বসেন না। আর্মচেয়ার মেন্টালিটি হয়ে যায়, ইনি বলেন।

শ্রীম (কথার স্রোত উল্টাইয়া দিয়া) — স্বামীজী বুদ্ধদেবকে খুব ভালবাসতেন। গয়া থেকে ফিরে এসে বুদ্ধদেবের নানা অনুভূতির কথা বলেছিলেন — নানা প্লেইনের কথা। ঠাকুর শুনে ইঙ্গিত করেছিলেন, এখানে এ সবই হয়েছে।

ঠাকুর স্বামীজীর মুখে হাত বুলাচ্ছেন আর বলছেন, এই ভক্তির মুখ গো — সরস। শুধু জ্ঞানীর মুখ শুষ্ক হয়।

আহা, কি ভালবাসা! মায়ের কাছে প্রার্থনা করছেন, 'মা, ও (স্বামীজী) আমার মাথার মণি। ও যা চায় তাই ওকে দাও।'

(সহাস্যে) ঠাকুর তখন চলে গেছেন। নরেন একদিন মাকে বলছেন — মা, এখন দেখছি সব মিথ্যা। মা, শুনে বললেন, হাঁ, বাবা। কিন্তু দেখো, আমায় যেন উড়িও না। নরেন আম্‌তা আম্‌তা করে তখন উত্তর করলেন, না মা, যে গুরুকে উড়িয়ে দেয় তার কি আর হবে (হাস্য)?

আমেরিকা থেকে ফেরার পর বলরামবাবুর বাড়ির ছাদে বেড়াতে বেড়াতে একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়' — ঠাকুরের এ কথাটা আমি এখনও বুঝতে পারি নাই, অর্থাৎ অবতারত্ব ঠাকুরের।

অবতার যেমন sun (সূর্য) আর সঙ্গীগণ planets (নক্ষত্র)। Planets (নক্ষত্রগণ) sun (সূর্য) ছাড়া থাকতে পারে না।

ভক্তদের জন্য কত ভাবনা, এতো অসুখ তবুও। এও 'crusification' (ক্রুশ বিদ্ধ)। Haemorrhage-এ (রক্তক্ষরণ) এক এক দিন ডাবর ভর্তি রক্ত যেতো মুখ দিয়ে। তখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। আবার একটু শক্ত হতেন। কিন্তু এর মধ্যেও ভক্তদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হতো। কিসে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে

সর্বদা সেই চিন্তা, সেই চেষ্টা করতেন। অবতারের সমস্তটা জীবনই ত্যাগ ভক্তদের জন্য, জগতের জন্য।

স্বামী বিরজানন্দ — রক্ত বমি হতো?

শ্রীম — হাঁ, ক্যানসার ছিল কিনা!

আহা, কি সব স্তব লিখেছেন — 'খণ্ডন-ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।' আর একটা লেকচারে বলেছেন, my hero, my guide, my philosopher, my everything (আমার উপাস্য দেবতা, সঞ্চালক ও উপদেষ্টা — আমার সর্বস্ব)!

স্বামী বিরজানন্দ — ক্যালকাটা এড্রেসে (কলিকাতার বক্তৃতায়)।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। আবার কথামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — মানুষ কি বুঝবে ভগবানের লীলা! দেখ না, গৌরাঙ্গ ব্যানার্জীকে কেমন করে নিয়ে গেলেন এক মুহূর্তে! খুব promising young professor of the Calcutta University (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উদীয়মান অধ্যাপক)। আশা ভরসা সব নিমেষে বিলীন হয়ে গেল। কেউ কি আর ভাবে কোথায় গেল, কেন গেল? ভেবেও বুঝবার যো নাই। ঋষিদের কথায় শেষে নির্ভর করতে হয়, সান্ত্বনা আনতে হয়।

জীবত্বটা মিথ্যা, ঈশ্বরই সত্য। মানুষ স্বরূপত ঈশ্বর। কেহ কেহ বলে তাঁর দাস, সন্তান ইত্যাদি — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (শ্বেতা ২/৫)। এ সবই একই কথা। ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে ঈশ্বরের কাছে যাবে। মাঝখানে এই অনন্ত জন্ম-মরণ চক্র!

আহা সমস্ত family-টাই (পরিবারটাই) গেল। কামাখ্যা দর্শনে গিছলো। ব্রহ্মপুত্র পার হচ্ছিল। ঢেউয়ে নৌকো ডুবে গেল।

এত দেখেও আমাদের চৈতন্য হয় না। একেই বলে মায়া! এর কাজই হলো এই, real-কে (সত্যকে, ঈশ্বরকে) unreal (মিথ্যা) বলে দেখায়। আর unreal-কে (জগৎকে, মিথ্যাকে) সত্য বলে দেখায়।

এই রকম একটি ঘটনা আমরা কালনায় নিজ চক্ষে দেখেছিলাম।

তখন ঠাকুরের শরীর আছে — এইটিন এইটিথ্রি (১৮৮৩ খ্রীঃ) হবে। আমরা কালনায় গিছলাম, সঙ্গে ছিলেন গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ)। স্টীমারে উঠেছি। নামলাম কালীগঞ্জ স্টেশনে। লোক সব জাহাজ থেকে নৌকোয় উঠে ড্যাঙ্গায় যাবে। কতকগুলি লোক আগেই নৌকোতে নেমে গেছে, বসে তামাক খাচ্ছে। আর একজন পেছন থেকে কলকে উঠিয়ে নিয়ে হাতে করে তামাক খাচ্ছে। আর ঐ ব্যক্তি হুঁকোটা টেনেই যাচ্ছে। হুঁস নাই। কেহ আবার লিচু খাচ্ছে। কেহ রঙ্গরস করছে। এই সব dramatis personae (কুশীলবগণ)। জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। আমরা সব জাহাজের উপর। ওমা, হঠাৎ দেখি নৌকোটা জাহাজের ঢেউ-এ একেবারে upset (উল্টে গেল)। একটি লোকেরও trace (চিহ্ন) পাওয়া গেল না। চোখের সামনে দেখলাম নিমেষে সব শেষ হয়ে গেল!

সারেঙ্গ জোরে জাহাজ চালিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমরা বললাম, থামাও, নয়তো রিপোর্ট করবো। থামালো বটে, কিন্তু একটি লোককেও দেখা গেল না।

আমরা রাত্রে একটা দোকানে রইলাম। ফিরে এসে ঠাকুরকে বলেছিলাম এই সব কথা।

এই এত সব দেখছি তবুও চৈতন্য হচ্ছে কৈ। এইটিই মহামায়ার কাজ — সব ভুলিয়ে দেন — ‘ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া’ (গীতা ১৮/৬১)।

কত সব হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে তবুও চৈতন্য হয় না। ‘টাইটানিক’-এ কত লোক ডুবলো!

স্বামী বিরজানন্দ — Air-ship-এ (উড়ো জাহাজে) কত লোক মরলো।

শ্রীম — ওমা, আমি তো এটা ভুলেই গেছি! কতবড় কাণ্ড! তিপান্নজন লোক গেল। ছয় সাত জন হাসপাতালে ছিল। তারাও গেল। ঐ সঙ্গে লর্ড টম্‌সনও গেল, খুব যোগ্য ব্যক্তি। ভাইসরয় পর্যন্ত হতে পারতো। দেখ কি সব কাণ্ড!

শ্রীম উঠিয়া নিজের ঘরে গেলেন। আবার বাহিরে আসিলেন। সঙ্গে দুইজন ভক্ত। তাঁহাদের হাতে মিষ্টি — সন্দেশ ও রসগোল্লা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — জগবন্ধুবাবুও রয়েছেন। এই যে জগবন্ধুবাবু, তুমি হাতে ন্যাও।

এই বলিয়া শ্রীম নিজ হাতে দুইটি সন্দেশ ও দুইটি রসগোল্লা জগবন্ধুর হাতে তুলিয়া দিলেন। ভক্তরা দিলেন স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী বিজয়ানন্দকে দুইটি প্লেটে, মিষ্টি।

স্বামী বিজয়ানন্দ (মুখে দিয়া) — খুব খর।

শ্রীম — এর মানে কি?

স্বামী বিজয়ানন্দ — খুব মিষ্টি।

শ্রীম — ও, তাহলে খেয়ে কাজ নাই।

স্বামী বিরজানন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে নিঃশেষে সমস্ত মিষ্টি পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন।

শ্রীম (স্বামী বিরজানন্দের প্রতি) — শুদ্ধানন্দ কেমন আছেন?

স্বামী বিরজানন্দ — এবার পাঁচ মাস ঘুরে এসেছেন। কিন্তু দেহের বিশেষ উন্নতি হয় নাই।

শ্রীম — ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কর্মকরা অভ্যাস যাদের, তারা কর্ম ছাড়া থাকতে পারে না। ইনস্‌পেক্‌সান করতে হয়। এ-ও কর্ম।

স্বামী বিরজানন্দ — না, এখন তেমন কাজ করেন না।

শ্রীম কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইলেন। আবার কথা হইতেছে।

শ্রীম (স্বামী বিরজানন্দের প্রতি) — জগবন্ধুবাবুর — জগবন্ধু মহারাজের শরীরটা বড়ই খারাপ।

স্বামী বিরজানন্দ — হেঁ, বরাবরই delicate health (দুর্বল স্বাস্থ্য)।

শ্রীম কি মায়ের মত আবেদন করিতেছেন, এই শরীরটার উপর লক্ষ্য রাখিতে?

স্বামী মাধবানন্দ, অভয়ানন্দ ও সাহেব মোক্ষপ্রাণের প্রবেশ।

তাঁহারাও শ্রীমকে বিজয়ার প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। স্বামী মাধবানন্দ পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীম দিবেন না পায়ে হাত দিতে। তাই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু স্বামী মাধবানন্দও ছাড়িলেন না। তিনি হাঁটু গাড়িয়া জোর করিয়া পায়ে হাত দিলেন। আর সহাস্যে বলিলেন, আজ একদিন হয়ে যাক্ না! এই ফাঁকে স্বামী অভয়ানন্দও পায়ে হাত দিয়া প্রণাম সারিলেন। স্বামী মাধবানন্দ বলিলেন, ইনি ভরত মহারাজ। শ্রীম আনন্দে বলিলেন, হাঁ, আজকাল মঠ manage (দেখাশোনা) করছেন। অনেক কাল ছিলেন মায়াবতী। স্বামী মাধবানন্দ সহাস্যে বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ। অতদিন 'গিরি' ছিলেন এখন 'পুরী' হউন এসে (সকলের হাস্য)।

সাধুরা যুগ্ম বেঞ্চেতে সতরঞ্চির উপর উপবেশন করিলেন।

শ্রীম (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি) — রোমাঁ রোলাঁর লেখা ঠাকুরের life-টি (জীবনীটি) বেশ হয়েছে। এই একটা মস্ত কাজ হলো। এখন অনেক লোক যাচ্ছে মঠে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। সেন্ট জেভিয়ার কলেজের প্রফেসাররা গিছলেন। তাঁরা নাকি বলেছেন, আমরা এত কাছে থেকেও জানতে পারি নাই এতদিন।

স্বামী মাধবানন্দ — ব্রেজিল থেকেও সাড়া আসছে। স্পেনিয়ার্ডে ট্রানস্লেশন হয়েছে এই বইটা। তাঁরা তা পড়েছেন।

শ্রীম (আহ্লাদে) — সব লাল হো যায়েগা।*

২

উত্তর কাশীতে সম্প্রতি আমেরিকাবাসী স্বামী যোগেশানন্দের দেহত্যাগ হইয়াছে। ইউরোপের অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত বিওসিয়াতে (Beotia) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকায় স্বামী প্রকাশানন্দের

* এটি মহারাজা রণজিৎ সিংহের উক্তি। ভারতের ম্যাপে ব্রিটিশ রাজ্য লাল রঙে রঞ্জিত। দেশীয় রাজ্য বা অন্য রাজ্য সব অন্যান্য রঙে রঞ্জিত। রণজিৎ সিংহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন অচিরে সমগ্র ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে। শ্রীম-র এই উক্তির অর্থ — অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে।

কৃপা লাভ করেন। বেলুড় মঠ হইতে সন্ন্যাস লইয়া তপস্যা করিতে উত্তর কাশী যান। সেই অবস্থায় শরীর যায়। তাঁহার বয়স মাত্র চল্লিশ। উত্তর কাশী যাইবার পূর্বে অন্তেবাসীর সহিত আসিয়া শ্রীমকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া অনুমতি গ্রহণ করেন। তাঁহার দেহত্যাগে শ্রীম বড়ই দুঃখিত। তথাপি হিমালয়ে গঙ্গাতীরে সাধুসঙ্গে তপস্যারত থাকিয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সৌভাগ্যের কথা বারংবার বলিয়াছেন। আজ স্বামী মাধবানন্দের কাছে বলিতেছেন — It is a sight for the Gods to see (ইহা সত্যিই এক দেবদৃশ্য)।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — আচ্ছা, আর কেউ কাছে ছিল নাকি?

স্বামী বিরজানন্দ — আমাদের সাধু পাঁচ ছয়জন ছিল। তবে চিকিৎসা চলে নাই ভাল। ডাক্তার প্রথমে বুঝতে পারে নাই। প্রথমে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করে। পরে বোঝা গেল টাইফয়েড।

শ্রীম (বিস্ময়ে) — কোথাকার লোক ভারতে এল! সাধু হলো, আবার মহাতীর্থ হিমালয়ে তপস্যারত থেকে শরীর ত্যাগ হলো। ঠাকুরের ভক্ত সাধুরাও আবার কাছে ছিলেন। এই সবই সৌভাগ্যের কথা! কোথায় ফুলটি ফুটেছিল, কোথায় এসে দেবপূজায় লাগলো! ঠাকুরকে মা দেখিয়েছিলেন, নানা দেশের, নানা রঙের, নানা ভাষার লোক তাঁর কাছে আসবে। আবার ঠাকুর নিশ্চয় করে বলেছিলেন, আন্তরিক ঈশ্বরকে যারা ডাকবে তাদের এখানে আসতে হবে। আর প্রার্থনা করে বলেছিলেন, মা যারা আন্তরিক এখানে আসবে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। তাই ধন্য যোগেশানন্দ। এ মৃত্যু নয়, অমৃতত্ব লাভ!

স্বামী বিরজানন্দ — সজ্ঞানে শরীর গেছে। শেষ অবধি জ্ঞান ছিল।

স্বামী মাধবানন্দ — অন্য জায়গা হলে চিকিৎসা করান যেতো। সানফ্রান্সিসকোর শান্তি-আশ্রমের জন্য খুব খেটেছিল। অনেকদিন ধরে মেইল ভ্যানে কাজ করে কিছু টাকা জমিয়ে এসেছে এই দেশে। অনেক সময় শান্তি-আশ্রমে একা থাকতো।

শ্রীম — কোথায় শান্তি-আশ্রম?

স্বামী মাধবানন্দ — ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একশ’ মাইল দূরে পাহাড়ী স্থান। হরি মহারাজ প্রথম start (আরম্ভ) করেন। অনেক জমি। খুব দুলর্ভ ছিল আগে।

শ্রীম — এমন শরীর যাওয়া desired by the Gods even (দেবতাদেরও এরূপ মৃত্যু কাম্য)! ভগবানের নাম করতে করতে নির্জন হিমালয়ে শরীর ত্যাগ!

স্বামী মাধবানন্দ — আজ্ঞা হাঁ। তীর্থে সাধুসঙ্গে সজ্ঞানে শরীর ত্যাগ।

সকলেই কিছুকাল নীরব রহিলেন। পুনরায় কথোপকথন।

স্বামী মাধবানন্দ — ম্যাকস্‌মূলারকে জানতেন কেবল পণ্ডিতমহল। রোমাঁ রোলাঁকে জানে সাধারণ লোকও। ওঁর অনেক বই আছে। তারা তা খুব পড়ে।

শ্রীম — এঁর লেখার ভারি সুন্দর মেথড্‌। প্রথম দিলেন একটা চ্যাপ্টার — Builders of Nation (জাতির সৃষ্টিকর্তাগণ)। রামমোহন রায়, কেশব সেন, দয়ানন্দ, আর কে?

স্বামী মাধবানন্দ — দেবেন্দ্র ঠাকুর।

শ্রীম — কেমন সুন্দর ড্র্যামাটিক atmosphere (নাটকীয় পরিবেশ) সৃষ্টি করে সেই আসরে নামিয়ে আনলেন ঠাকুরকে।

চ্যাপ্টারের হেডিংসগুলি কি সুন্দর! Builders of Unity (ঐক্যের প্রণেতাগণ), Ramakrishna and the great shepherds of India (শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভারতীয় ধর্ম-মহামানবগণ), The Swan Song (রাজহংস সঙ্গীত), Identity with the Absolute (ব্রহ্মৈকাত্মকতা), The Return to Man (নরলোকে প্রত্যাবর্তন)।

আবার মহা সমাধিকে কি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন — 'The River Re-enters the Sea (নদীর ব্রহ্মসাগরে পুনঃ প্রবেশ)। সাকার নিরাকারের কি মনোরম চিত্র!

কিংবদন্তি আছে, রাজহংস মৃত্যুর সময় গান গাইতে গাইতে চলে

যায় — 'the Swan Song', ঠাকুর মায়ের নাম করতে করতে চলে গেলেন — এই ভাবটার ইঙ্গিত এটি।

শ্রীম — ধনগোপাল আর মিস্ মেকলাউড — এঁরা অনেক help (সহায়তা) করেছেন এই লেখাতে। মিস্ মেকলাউড ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ধনগোপালের লেখার বেশ আকর্ষণ আছে। তবে facts (ঘটনা) সম্বন্ধে উনি বুঝি একটু loose (উদার)।

স্বামী মাধবানন্দ — এ সম্বন্ধে অশোকানন্দকে জিজ্ঞেস করবেন।

শ্রীম — তা হলেও খুব কাজ হয়েছে। ওঁর বই (In the Face of Silence) দেখেই তো ঠাকুরের সন্ধান পান। তারপর এই বই লেখেন। খুব কাজ!

স্বামী মাধবানন্দ — ওঁর (ধনগোপালের) দ্বারা influenced (প্রভাবিত) হয়ে স্যানফ্রানসিস্কো ইউনিটেরিয়ান চার্চের কর্তৃপক্ষ ঠাকুরের সম্বন্ধে রবিবারে একটা সারমন্ পর্যন্ত দিয়েছিলেন। আমাদের স্টুডেন্টসরা সব গিছলো শুনতে। ফিরে এসে বললে, খুব appreciation (সমাদর) হয়েছিল, ঠাকুরের সম্বন্ধে বক্তৃতাটি। আমরা যেতে পারি নাই। আমাদের ওখানে সার্ভিস ছিল। এটাই সব চাইতে বড় চার্চ।

আজকাল ও দেশের অনেকেই জেনেছে। ভারতে অনেকে আসছে। সম্প্রতি একটি মেয়ে এসেছেন, নাম মিস্ কেপার। জার্মান রক্ত গায়ে, কিন্তু আমেরিকান citizen (নাগরিক)। নিবেদিতা স্কুলে রয়েছেন। ধাত্রী-কাজ জানেন ভাল। Child welfare-এ (শিশু মহলে) কাজ করবেন এ দেশে।

শ্রীম — আপনারা যাচ্ছেন যেকালে অনেক লোক আসবে ওদেশ থেকে।

শ্রীম — তুমি কতদিন ছিলে?

স্বামী মাধবানন্দ — দু'বছর।

শ্রীম — ঐ যে এক একটি সেন্টার হচ্ছে ঐখান থেকে সব ভাব radiated (বিকীর্ণ) হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এঁদের মিষ্টিমুখ করাও।

ভক্তগণ দুইটি প্লেটে চারিটি করিয়া সন্দেশ ও দুইটি রসগোল্লা আনিয়া শ্রীম-র হাতে দিলেন। শ্রীম নিজ হাতে স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী অভয়ানন্দের হাতে দিলেন। স্বামী বিজয়ানন্দ স্বামী মাধবানন্দকে অতগুলি মিষ্টি খাইতে মানা করিলেন অসুখ হইবে বলিয়া। তিনি স্বল্পাহারী ও আহার সংযমী হইলেও কোনও কথা না শুনিয়া শ্রীম-র নিজ হাতের মিষ্টি মহাপ্রসাদের মত শ্রদ্ধা সহকারে খাইয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ পূর্বে স্বামী বিরজানন্দও অনুরূপ আচরণ করেন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদের দেওয়া খাবার ঠাকুরেরই প্রসাদ। মোক্ষপ্রাণকেও এরপর আর এক প্লেট মিষ্টি দেওয়া হইল।

স্বামী বিরজানন্দ ও বিজয়ানন্দ বাসে গেলেন। স্বামী মাধবানন্দ, অভয়ানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ ও মোক্ষপ্রাণ উঠিলেন ৭।২০ মিনিটে। তাঁহারা বাগবাজার স্টীমার ঘাটে উঠিলেন। কি সুন্দর রাত্রি! কোজাগর পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে কি অপূর্ব সুষমা বিস্তার করিয়াছে! আর গঙ্গাবক্ষে যেন গলিত রৌপ্যের হিল্লোল। সাধুর মনে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার-লীলামাধুরী। মধুময় পৃথিবী, চন্দ্রমা মধুর, গঙ্গাবারি মধুর — সাধুগণের হৃদয় মধুর, সব মধুর — ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

বেলুড় মঠ।
৭ই অক্টোবর ১৯৩০ খ্রীঃ, আশ্বিন ১৩৩৭ সাল।
মঙ্গলবার। লক্ষ্মী পূর্ণিমা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আমায় ছেড়ে কোথায় যাবে তীর্থে

১

কলিকাতা মর্টন স্কুল। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্ষ্ট স্ট্রীট। চারতলার সিঁড়ির ঘর। সকাল আটটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। সিঁড়ি বাহিয়া স্বামী শান্তানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ উপরে উঠিতেছেন। ওঠার শব্দ শুনিয়া শ্রীম গিয়া সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইলেন। সাধুদের দেখিয়াই শ্রীম উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, আসতে আজ্ঞা হউক। আসুন, আসুন। নমস্কার।

সাধুরা জোড়া বেঞ্চের উপর সতরঞ্চিতে বসিয়াছেন দক্ষিণাস্য। শ্রীম চেয়ারে বসিলেন তাঁহাদের সম্মুখে উত্তরাস্য, পিলারের গায়ে।

মর্টন স্কুলের এখন গ্রীষ্মের ছুটি। শ্রীম আজকাল আধ মাইল দূরে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের 'ঠাকুর বাড়িতে' থাকেন। পরিজন এখানে থাকেন। তাই আজ সকালে এখানে আসিয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেশ গরম। সাধুরা ওয়েলিংটন্ স্ট্রীটস্থিত অদ্বৈতাশ্রম হইতে আসিয়াছেন। স্বামী শান্তানন্দ থাকেন কাশীর অদ্বৈতাশ্রমে। আর অপর সাধুটি থাকেন দেওঘরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে। ঐ অঞ্চলের দারুণ গ্রীষ্মের জন্য তাঁহারা বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। শ্রীমকে ঠাকুরবাড়িতে না পাইয়া তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে কতগুলি ভক্ত আসিয়া পড়িলেন, পূর্ণেন্দু, বলাই, মনোরঞ্জন প্রভৃতি। একটু পরে আসিলেন বাগবাজারের ভক্ত দীনদয়াল সাহা। তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছেলেপুলে। শ্রীম তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, আসুন, আসুন। এই যে সাধু সব — প্রণাম করুন, প্রণাম। ভক্তটি মস্তক নত করিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। শ্রীম বলিলেন,

না হলো না — ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করুন। সাধুদের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হয়। ভক্ত অগত্যা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি) — বলবো, old tradition (প্রাচীন ঐতিহ্য) রয়েছে এর। ঠাকুর, ভাবে কেশব সেনকে বলেছিলেন, সাধুদের প্রণাম করলে সংসার অনিত্য বলে বোধ হয়। তাঁরা জেনেছেন কিনা সংসার অনিত্য!

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' নিজে নত হয়ে তাঁদের (কেশব সেনদের) প্রণাম করতেন তবে তাঁরাও করতেন। ইংরেজী পড়া লোক — ওসব ধাতে নেই।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। আবার কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — অবতার যখন আসেন তখন world of difference (আকাশ পাতাল তফাৎ)। তাঁর একটি কথা মনে হলে atmosphere (আবহাওয়া) অন্যরকম হয়ে যায় — world of difference!

(নয়ন হাস্যে) একজনের নাং আসে না — মেয়ে মানুষ। ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন একদিন। বেলা দশটা হবে। কুঠির ও-পাশ থেকে ঐ মেয়েমানুষটি হাতে ইসারা করে ঠাকুরকে ডাকছে। ঠাকুর গেলে বলছে, আমি শুনেছি আপনি ওষুধ জানেন। আমার লোকটিকে আনিয়ে দিতে হবে। রাগ করেছে। আসে না। ঠাকুর শুনে বললেন, না মা, আমি না। আর কেউ হবে। আমি ও সব জানি না (সকলের হাস্য)। দুর্গা ব্রহ্মচারী পঞ্চবটীতে থাকতো, ওষুধ দিত।

একদিন রাত্রি দশটার সময় ঠাকুরের ঘরের দরজা ঠক্‌ঠক্ করছে। খুলতেই একজন লোক বললে, মশায় একবারটি যেতে হবে। এই গাড়ী নিয়ে এসেছি। আমাদের বাবুর (প্রবল হাস্যের সহিত দুই হাতে একটা ফুটবলের আকার দেখাইয়া) একশিরা (সকলের সুদীর্ঘ উচ্চ হাস্য)।

ঠাকুর বললেন, আমি ওসব জানি না। ঐ পঞ্চবটীতে একজন আছে। তারপর লোকটি apology (ক্ষমা) চায়। জুড়িগাড়ী নিয়ে

হাজির। কে একজন সুবর্ণ বণিকদের বাবু অসুস্থ ছিল।

রোগ ভাল হউক, কি সংসারের উন্নতি হউক, এ সব কথা একদিনও তাঁকে বলতে শুনি নাই। তিনি কেবল প্রার্থনা করতেন, মা আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।

যে সাধুরা রোগ সারায়, নাম-যশ চায়, তিনি তাদের পছন্দ করতেন না। টাকাকড়ি, লোকমান্য, রোগ সারান — এ সবই ঐ নাং-এর ক্লাসে।

শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (দীনদয়ালের প্রতি) — মঠে যান না? যাবেন। পরিক্রমা করতে হয়। চরণামৃত খেতে হয়। আর সাধুদের ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হয়। পায়ে হাত না-ই বা দিলেন! যদি বল ভণ্ড, তা হলেই বা। আশ্রম কত বড়। থিয়েটারের সাধু দেখে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় — নারদ, চৈতন্য দেখে। আর সত্যিকারের সাধু দেখলে উদ্দীপন হবে না?

চৈতন্যদেব গাধার পিঠে গেরুয়া দেখে একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। এর মানে, যে আশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমে, সর্বদা ভগবানকে ডাকে এ তারই চিহ্ন — 'অহর্নিশং ব্রহ্মাণি যে রমন্ত' (আদি শঙ্করাচার্য রচিত 'যতি পঞ্চকম্' - ৪)।

দীনদয়াল — মঠে এতকাল গিয়েছি — কৈ কিছুই হয় নাই!

শ্রীম (বিরক্ত হইয়া) — আপনি কি আপনার মন বোঝেন? আপনি কি সিদ্ধ পুরুষ? যিনি সিদ্ধ পুরুষ তিনি নিজের মনকে নিজে জানেন। সিদ্ধ পুরুষ মানে গুরু। জ্যাঠামী করলে হবে না। হচ্ছে কি হচ্ছে না, এ কথা বলেন কি করে?

ঠাকুর বলতেন, ঘুমন্ত লোক কাশীতে চলে গেছে। তবুও সে জেগে বলছে, আমি যাই নাই কাশী — হাওড়াতেই রয়েছি।

ঠাকুর এই সব লোকদের দেখতে পারতেন না, কাছেও রাখতেন না। এই যারা সর্বদা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে আর বলে, 'আমি অধম', 'আমি পাপী', 'আমার কিছু হলো না'। এই pessimistic (নৈরাশ্য) ভাব ভালবাসতেন না।

বাবুরা complain (অসন্তোষ প্রকাশ) করে কি ক'রে, যারা ঠাকুর স্বামীজীদের চিন্তা করে? তাঁদের জীবনে কত কষ্ট গেছে তা দেখবে না!

কারো হয়তো একটু খাওয়ার কষ্ট হলো। অমনি ভ্যাক্ করে কেঁদে দিল — আজ আমার খাওয়া হয়নি বলে। এই আর এক থাক্ অপদার্থ লোক। Pessimism-এর (দুঃখবাদ) স্থান দিতে নাই মনে। একটি ভক্তকে (শ্রীমকে) বিচ্ছুতে কামড়িয়েছিল। কত কষ্ট, কত কান্না। যেই ঠাকুরের কথা মনে হল, ওমা অমনি আর যন্ত্রণা নাই। লজ্জা হল — তিনি কত সয়েছেন আর আমি এটুকু সইতে পাচ্ছি না! ক্যান্সারে কত কষ্ট ঠাকুরের। বলতেন, যম যন্ত্রণা। স্বামীজীর কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, কত অনাহার! আমেরিকায় ক্ষুধার জ্বালায় রাস্তায়ই বসে পড়লেন। কে একজন মেম্ (মিসেস হেইল) এসে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। এ সব দেখে শুনেও শিক্ষা হয় না! কি করে complain (অভিযোগ) করে, আশ্চর্য!

চন্দ্র মহারাজকে (স্বামী নির্ভরানন্দ) দেখলাম। একেবারে পঙ্গু। কিন্তু এই অচল শরীর নিয়ে কত স্থানে যাচ্ছেন! এঁরাই পরমহংসদেবের যথার্থ শিষ্য। স্বামীজী, চন্দ্র মহারাজ!

তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'they seeing see not; and hearing they hear not (St. Matthew 3:13) — (চোখ থাকতে কানা আর কান থাকতে কালা)।

কত দুর্গম স্থান জয়রামবাটি, কামারপুকুর। চন্দ্র মহারাজ, ও-সব তীর্থও হয়ে এলেন। জয়রামবাটিতে আবার যাত্রাগান শুনলেন — 'গুহক মিলন'। আবার ভরত রামের পাদুকা শিরে ধারণ করেছেন দেখে কাঁদলেন।

শ্রীম (দীনদয়ালকে দেখাইয়া সাধুদের প্রতি) — এঁকে বলেছি ছেলেপুলে রেখে আসবেন। ইনি রাখাল মহারাজের খুব সঙ্গ করেছেন।

(দীনদয়ালের প্রতি) — যিনি আপনাকে আনছেন এখানে তিনিই সময় হলে এদেরও আনবেন। আপনি কি নিজে আসছেন এখানে?

আপনি নিজে আসেন নাই। ঈশ্বর এনেছেন। দেখুন না, আমরা বুড়ো হয়েছি যেতে পারি না। তাই তিনি আপনাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই সাধুদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভক্তরা এলে ভগবানের কথা হবে বলে।

শ্রীম উঠিয়া নিজের ঘরে গেলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে একজন সাধুও গেলেন। কাঁচের বৈয়াম থেকে তালমিছরী একটা প্লেটে ঢালিয়া জল দিয়া ধুইতেছেন। বলিলেন, ঠাকুরকে দিতে হবে। তারপর পায়ের চটিজুতা ছাড়িয়া চক্ষু বুজিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। এইবার বাহিরে আসিয়া সাধুদের হাতে হাতে দিলেন প্রথম। তারপর ভক্তগণকে দিলেন।

২

সকলে মিছরী প্রসাদ পাইতেছেন।

শ্রীম (দীনদয়ালের প্রতি) — কে খাচ্ছেন?

দীনদয়াল — রাম।

শ্রীম — আপনি নন — রাম! বা বেশ কথা!

হাত ধুইতে সকলে ছাদে গেলেন। একটি সাধু শ্রীম-র কাছে বসিয়া রহিলেন। সকলে ফিরিয়া আসিলে শ্রীম শান্তানন্দজীর সহিত কথা কহিতেছেন। কাশী অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতীর অদ্বৈতাশ্রম, এ সব কথা। বলিলেন, কাশী মোক্ষ-ক্ষেত্র। ঠাকুর দেখেছিলেন শিব মুমূর্ষুর কানে রাম নাম শুনাইতেছেন, আর মা কচ্ কচ্ করিয়া সব বন্ধন মোচন করিয়া দিতেছেন। বলিলেন, মায়াবতীও খুব স্থান — স্বামীজীর অতি প্রিয় আর হিমালয়ের গর্ভে নিভৃত তপোবন।

শ্রীম — কলকাতার অদ্বৈতাশ্রমটিও বেশ (চার নম্বর ওয়েলিংটন লেনে)। আপনারা তো ওখানেই রয়েছেন? বেশ ভাল বাড়ি। ধ্যানঘরটি বড়ই সুন্দর। আমরা ঐ ঘরে বসেছিলাম। ঠাকুর ও মা'র ছবি আছে। কান্না পেল আমার এই ভেবে, এখানেও এসে বসেছ!

বিগত শনিবার শ্রীম একটি সাধুকে বলিয়াছিলেন, যত শীঘ্র পারা

যায় অদ্বৈতাশ্রমের ঠাকুরঘরটি দেখে আসা উচিত। বড় সুন্দর ঘর। বসবে, একটু ধ্যান করবে। সাধু তাই এই সপ্তাহে বেলুড় মঠ হইতে আসিয়া দুই তিন দিন অদ্বৈতাশ্রমে রহিয়াছেন। সেখান হইতেই এখন শ্রীম-র কাছে আসিয়াছেন।

স্বামী শান্তানন্দ জল পান করিয়া গ্লাসটা পাশে বসিবার বেঞ্চের উপর রাখিয়া দিলেন। শ্রীম ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না, ওখানে রাখুন হাইবেঞ্চের উপর। আমাদের দ্বৈতভাবে রেখেছেন কিনা — তুমি এক আর আমি এক। তাই শৌচ দরকার, অন্তর্বহিঃ শৌচের দরকার। আশ্রমে থাকলে সকলকেই এ সব মানতে হয়। ঠাকুর-সেবা আছে কিনা আশ্রমে! গাছতলায় থাকলে কিছুই করতে হয় না। আশ্রমে না পোষায়, গাছতলায় যাও।

গাছতলায় থাকলে যে পাত্রে শৌচ করে সেই পাত্রেই শিবের মাথায় জল দিচ্ছে। এতে দোষ নেই।

একজন ভক্তকে (শ্রীমকে) ঠাকুর বললেন, যাও, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস। অনেক বেলা হয়ে গেছে দেখে আবার বললেন, তা এক কাজ কর। মাথায় জল ছিটিয়ে দাও। এতেও স্নান হয়ে যাবে। ভক্তটি ইংরেজী পড়া লোক।

অন্তেবাসী হাত ধুইতে ছাদে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া শুনিতেছেন, শ্রীম সাধুভক্তদের সহিত কৌতুক রস উপভোগ করিতেছেন।

শ্রীম — ঋষিকেশের গঙ্গায় বেশ নির্মল জল। বেশ সুদৃশ্য স্থান তিন দিকে হিমালয়, এক দিকে বন। এর মাঝে সাধুদের কুটীর।

স্বামী শান্তানন্দ — ঋষিকেশে গঙ্গায় বেশ বড় বড় মাছ আছে।

শ্রীম (রঙ্গচ্ছলে) — হাঁ, দেখে বাঙালি বাবুদের (মুখ প্রসারিত করিয়া) জিভের লাল পড়ে (সকলের হাস্য)।

মাছরা generations (বহু পুরুষ) ধরে সাধুদের কাছে রয়েছে। মাছেরও অনেক generation (পুরুষ), সাধুদেরও অনেক generation (পুরুষ)।

শ্রীম (দীনদয়ালের প্রতি) — আপনারা অবশ্য গেছেন ঋষিকেশ

(স্মিত হাস্যে)?

দীনদয়াল — আজ্ঞে, না।

শ্রীম — তা'হলে যাবেন নিশ্চয়। যান না, ফস্ করে দেখে আসুন না!

একটি সাধু (স্বগত) — কি অদ্ভুত উপায় মানুষকে বলপূর্বক সৎপথে চালিত করার! শ্রীম জানেন ভক্ত যান নাই। তবুও চেষ্টা করছেন যদি পাঠাতে পারেন।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, হাঁড়ির মাছ যেমন গঙ্গায় পড়লো, এমনি হবে ওখানে গেলে। আবার এদিককার তীর্থগুলিও হয়ে যাবে — কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধনও দেখা হয়ে যাবে। তারপর যমুনা, ধ্রুবঘাট। ধ্রুবঘাটে ঠাকুর ফিরতি গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন, ভাবে। দেখেই একেবারে সমাধিস্থ পালকীতে বসে।

চৈতন্যদেব রাধাকুণ্ডে গিছলেন। তখন ওর উপর আখ ক্ষেত ছিল। উনি সমাধিস্থ হয়ে বললেন, এখানে ছিল রাধাকুণ্ড। তারপর খুঁড়ে পাওয়া গেল প্রাচীন ঘাট, ভাঙ্গা ইঁট, এই সব।

শ্রীম (স্বগত) — দেখে এলাম এক নবীন যোগী
আমাদের কানাইয়ের মত,
কাঁদছে তরুর ডাল ধরে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — চৈতন্যদেবকে বিরহ-বিহ্বল দেখে ব্রজবাসীরা বলাবলি করছে। তখন তারা তাঁকে জানে নাই। বন-জঙ্গল হয়ে পড়ে ছিল সব মুস্লিম আক্রমণে। বৃন্দাবন উদ্ধার করতে চৈতন্যদেবই প্রথম উদ্যোগ করেন। প্রথম পাঠান রাজা সুবুদ্ধি রায়কে। তারপর যান রূপ, সনাতন প্রভৃতি ছয় গোস্বামী।

শ্রীম — ঠাকুর বৃন্দাবনে মাঠ দিয়ে যেতে যেতে পালকীতে বসে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে কেঁদেছিলেন।

আমাদের বুড়ো শরীর। ইচ্ছে করলেই যাওয়া হয় না। কুম্ভে (প্রয়াগ) যাবার জন্য মন বড়ই ব্যস্ত হয়েছিল। হলো না, সাধুরা বারণ

করলেন, মহাপুরুষ মহারাজ, আরও অনেকে।

আমরা একবার ঋষিকেশে ছিলাম। প্রথমে থাকা হয় মায়াকুণ্ডে রামায়তদের ধর্মশালায়। গত (১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের) জলপ্লাবনে ওসব পাকাবাড়ি বিনষ্ট হয়ে গেছে। তার চিহ্নও নাই শুনেছি।

তারপর ছিলাম স্বর্গাশ্রমে একটি কুটীরে কম্পাউণ্ড দেয়ালের গায়ে। নির্জনবাস হল, মাধুকরীও হলো। মাইল খানেক উপরে পাহাড়ের ভিতরে একলা গিছলাম। ওখানে জংলী হাতী সব থাকে।

এখন আর সাধ নাই — মিটে গেছে। মনকে কখনও পাঠিয়ে দি ওদিকে। বড় উদ্দীপনের স্থান! সপ্তর্ষিরা ওখানে তপস্যা করেছিলেন, বলে। আবার সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমারেরও তপস্যার স্থান। ঐ তপস্যার ভাবধারা আজও চলে আসছে। কত সাধু মহাপুরুষ ওখানে ভগবানকে ডেকেছেন। কেহ কেহ দর্শন পেয়েছেন। কেহ তপস্যায় শরীর ত্যাগ করেছেন। ঐ সব ভাবপ্রবাহ এখনও জীবন্ত বিদ্যমান। একটু মনঃসংযোগ করলেই ঐ ভাবপ্রবাহে মন ভেসে যায়। তখন অনায়াসে পরমানন্দের আস্বাদ পায়। ওখানকার ভাব প্রশান্ত গম্ভীর। ওখানে যেন ভাবের সাগর। ছোট ছোট ভাবগুলি সে সাগরে ডুবে যায় — দেশহীন কালহীন সর্বহীন চিদানন্দ সাগরে মন বিলীন হয়।

কিছুক্ষণ হইতে একটি গৌরবর্ণ যুবক, বয়স বছর চব্বিশ, একপাশে বাসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া শ্রীম আবার কথা কহিতেছেন!

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — এই যে দেখছেন একে, অনেক টাকা এদের। টাকার প্রয়োজন কিসে? ঠাকুর বলতেন টাকায় অবসর দেয়। অন্যের গোলামী করতে হয় না। পেটের জন্য। সব সময় তাঁকে নিয়ে থাকা যায়। চাকরী করলে সব সময় ওতে চলে যায়। ঈশ্বরকে ডাকবে কখন?

টাকার উপযোগ সম্বন্ধে ঠাকুর এইরূপ বলতেন। প্রথম, দেবসেবা। দ্বিতীয়, next in importance (তার পরের প্রাধান্য হলো) সাধুসেবা। তৃতীয়, ভক্তসেবা। তার পরও যদি অর্থ থাকে তবে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করা উচিত। পরিবারবর্গের স্থান পঞ্চম।

ঠাকুর বলতেন, বাঁদরের চুল উঠলেও বাঁধতে জানে না। লোকের টাকা থাকলেও সদ্ব্যবহার জানে না। সব পেটে আর ভোগে খরচা করে মরে।

কেন ঠাকুর এরূপ খরচা করতে বলেছেন, তার ব্যাখ্যা স্বামীজী 'ভক্তিযোগ'-এ করেছেন। বলেছেন, ভগবানের manifestation (প্রকাশ) মানুষের মধ্যে অবতারে বেশী। তারপর সাধু, ভক্ত, দরিদ্রনারায়ণ।

জল এখানে খুঁড়লেও পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে জলের প্রকাশ বেশি — যেমন, নদী, সাগর — সেখানে জল পেতে কষ্ট করতে হয় না। অনায়াসেই জল পাওয়া যায়। সাধুভক্তে সেরূপ ভগবান বেশী প্রকাশিত।

যার যা প্রকৃতি সে তাই করবে। গীতায় তাই বলেছেন — 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।' (গীতা ৩/৩৩)।

কেহ কেহ টাকা থাকলেও ঈশ্বরচিন্তা করবে না। এমনি প্রকৃতি, ব্যবসা বাণিজ্য করে নষ্ট করে বসে। এ ব্যবস্থা সকলের জন্য নয় — যাদের কতক জ্ঞান হয়েছে তাদেরই বলা হয়েছে — ভক্তদের। অপরে শুনবে কেন এ কথা? তাদের ভোগ বাকী আছে।

প্রকৃতি ছাড়ানো বড়ই কষ্টকর। একবার আমার জ্বর হয়, এক মাস, তবুও ছাড়বে না। ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্তী এসে বললেন, 'আপনার যা ভাল লাগে তাই করুন'। তখন ঠাকুরের কথা বলতে লাগলাম। আর জ্বরও শীঘ্র আরাম হয়ে গেল। ওটা আমার প্রকৃতি হয়ে গেছে — ঠাকুরের কথা বলা। দম বন্ধ হয়ে গিছলো, মন খারাপ হয়েছিল, অন্য ডাক্তাররা কথা বন্ধ করে দেওয়ায়। তাই রোগ সারে নাই।

৩

এখন সকাল নয়টা। শ্রীম-র স্নানের জল ছাদে রৌদ্রপক্ক হইতেছে। স্নানে দেরী হইতেছে দেখিয়া সাধুরা উঠিয়া পড়িলেন, এবং প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীম সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া বিদায়

দিতেছেন। সাধুরা সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিতেছেন। শ্রীম বলিলেন, তোমরা ওয়েলিংটনে যাবে তো? তাহলে রাস্তায় যে সকল ঠাকুরের লীলাস্থল পড়বে সেগুলি দেখে যেও। ইনি (সঙ্গী সাধু) সব জানেন।

একজন সাধুর চক্ষু পরীক্ষা চলিতেছে। তার জন্য তাঁহারা ঔষধ খরিদ করিতে গেলেন, বোস ল্যাবরেটারিতে। ফিরিবার সময় ঠিক সম্মুখের বাড়িটি দেখাইয়া সঙ্গী সাধু বলিলেন, এটা হলো ভূদেব বাবুদের বাড়ি। ঠাকুর শশধর তর্কচুড়ামণিকে দেখতে গিছলেন এঁদের বাড়িতে। তখন তাঁরা থাকতেন কলেজ স্ট্রীটে। এখন সে বাড়িতে আশুতোষ দেবের প্রিন্টিং ওয়ার্কস। এই বাড়িতে গত রাত্রে বিয়ে হয়েছে। তাই নানা রঙের বাল্‌ব দেখা যাচ্ছে।

মেছুয়াবাজার দিয়া সাধুরা চলিতেছেন। প্রথম দেখিলেন নববিধান ব্রাহ্ম মন্দির। কেশববাবু প্রায়ই ঠাকুরকে এইখানে লইয়া আসিতেন। তারপর রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ি। ঠাকুর প্রথমাবস্থায় এ বাড়ির গৃহদেবতার পূজারী ছিলেন। তারপর ঈশান মুখুয্যের বাড়ি। এইগুলি সবই উত্তরের ফুটপাথে। এরপর কলেজ স্ট্রীট। শীতলা মন্দির। তার পাশেই ভূদেব চ্যাটার্জীদের পুরাতন বাড়ি। এইখানেই ঠাকুর এসেছিলেন। এবার ট্রামে উঠিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতেছেন — ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ লীলাস্থল কলিকাতা।

এখন অপরাহ্ণ সাতটা। মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে তিনজন সাধু শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, আর কয়েকজন ভক্ত। তিনি পাশেই নিজ কক্ষ অর্গলবদ্ধ করিয়া ধ্যান করিতেছেন।

স্বামী বোধাত্মানন্দ ও ব্রহ্মচারী সাধনচৈতন্যকে লইয়া স্বামী নিত্যাত্মনন্দ স্টুডেন্টস্ হোম হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বেলুড় মঠের সাধু, দেওঘর বিদ্যাপীঠে কর্ম করেন। এখন গ্রীষ্মের ছুটিতে মঠে আসিয়াছেন।

শ্রীম ছাদে আসিলেন পৌনে আটটায়। সকলে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন, তিনি যুক্তকরে 'নমস্কার নমস্কার' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া চেয়ারে বসিলেন উত্তরাস্য। সাধুরা শ্রীম-র বাম দিকে আর ভক্তগণ

সম্মুখে ও ডান দিকে বেঞ্চেতে বসা।

শ্রীম-র সহাস্য বদন। উন্নত ললাট। আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু। সুবৃহৎ সমুখঠেলা উজ্জ্বল চক্ষু দুইটিতে যেন জীবন্ত আনন্দোচ্ছ্বাস। মনটি যেন ব্রহ্মরসে ভাসমান। সাধুদের নয়ন-মনকে এই দিব্য চক্ষু দুইটি আকৃষ্ট করিয়াছে, যেমন চুম্বক আকর্ষণ করে লৌহকে।

সাধু দুইজন শ্রীম-র পরিচিত। একজনের অধ্যাত্ম জন্ম লাভ হইয়াছে শ্রীম-র শ্রীপাদপদ্ম ছায়াতে। ব্রহ্মচারী নূতন। শ্রীম প্রসন্ন বদনে ব্রহ্মচারীর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি) — আপনার কোন্ ডিস্ট্রিক্ট (জন্মস্থান)?

ব্রহ্মচারী — ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট।

শ্রীম — আপনিও বিদ্যাপীঠে থাকেন? বেশ জায়গাটি। আবার মহাতীর্থ বৈদ্যনাথ ধাম।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — মেমরা এসেছিলেন।

একজন সাধু — যাঁদের সকালে আসার কথা ছিল?

শ্রীম — হাঁ। প্রকাশানন্দের আশ্রম থেকে এসেছেন — স্যানফ্রান্‌সিস্‌কো। খুব ভক্তিমতী। জার্মান মেয়েটিও (মিস ফ্রেকার) এসেছিলেন। ইনি তত ভাল ইংরেজী বলতে পারেন না। রেঙ্গুন যাচ্ছেন নার্সিং হোমে। কর্তৃপক্ষ যা বলেন তাইতো করতে হবে। একবার বেড়িয়ে এলো আর কি!

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — আর্যসমাজের নেতা দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎ কোথায় হয়েছিল? বিদ্যাপীঠে স্বামী জগদানন্দ বলেছিলেন, হয় নাই সম্ভবত। আমরা বললাম, হয়েছিল আপনার মুখে শুনেছি। আর কথামৃত দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ আছে (১৯।৩)।

শ্রীম — ঠাকুরের মুখে শুনেছিলাম, হয়েছিল। নৈনালের ঠাকুরদের বাগানবাড়িতে। কেশববাবু সাধন-ভজন করতেন। ঐখানে দয়ানন্দ স্বামী কেশববাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন শীতকাল ছিল। ঠাকুরও সেখানে যান। 'কাপ্তান'ও ছিলেন (১৮৭৩ খ্রীঃ)।

(সহাস্যে) দয়ানন্দ সাকার মানেন না। আর কাপ্তেন একেবারে

সনাতনী। কাপ্তেন বসে সব কথা শুনছেন, আর মাঝে মাঝে, 'রাম রাম' এই ঈশ্বরীয় নাম উচ্চারণ করছেন। দয়ানন্দস্বামী বার বার শুনে রহস্য করে বললেন, তার চেয়ে 'সন্দেশ সন্দেশ' বল (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তা দেখে দয়ানন্দজী বলেছিলেন, শাস্ত্রে আমরা যা পড়েছি, যা বলি, কাজে দেখছি এই সব এঁর হয়েছে — সমাধি।

একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন দয়ানন্দজীকে, 'মহারাজ, আপকী সমাধি হুয়ী হ্যায় ক্যা?' উনি উত্তর করলেন, 'নেহি, পাণ্ডিত্যাভিমান হ্যায়।' অভিমান থাকলে সমাধি হয় না। বড় লোক বলতে হবে! সত্য কথা বলা সকলের সম্মুখে অকপটে, সকলের কাজ নয় — মহান পুরুষ মহাত্মারা কেবল পারেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুর শম্ভু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈশ্বর সামনে এলে কি চাইবে — হাসপাতাল ডিসেপেনসারী, কি জ্ঞান, ভক্তি? এর অর্থ কে বুঝবে? Present company-র (বর্তমান শ্রোতাদের) কে বোঝে? এর মানে এই — আমি ঈশ্বর, অবতাররূপে তোমার সামনে রয়েছি। এখন আমাকে নিয়ে থাক, আনন্দ কর। যখন আমি সামনে না থাকি তখন এই সব কর। ঠাকুর তাকে দেখতে গিছলেন শেষ অসুখে। তখন শম্ভুবাবু বলেন, আমি মনে করেছি, সব লিখে দিয়ে যাব গৃহদেবতার নামে। তাকে ঠাকুর ঐ কথা বললেন। শম্ভুবাবু কি ধরতে পারলেন তার অর্থ?

আর দুই তিনজনকে তীর্থ করতে বারণ করেছিলেন। বুড়ো গোপাল বদ্রী-কেদার যেতে চাইলে অনুমতি দেন নাই। আর একজন (শ্রীম) কামারপুকুর গিয়ে fascinated (মুগ্ধ) হয়ে গিছলেন। আর একবার যেতে চাইলে বলেছিলেন, না, এখন থাক। আমি ভাল হয়ে উঠি, আমার সঙ্গে যেও। এ সবের মানে এই, আমি ঈশ্বর অবতার। আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে তীর্থে! আমি তো সর্বদা থাকব না, 'but me, ye have not always'! (St. Matthew 26:11)

একটি স্ত্রীভক্ত ক্রাইস্টের মাথায় ও শরীরে মূল্যবান সুগন্ধী তেল মেখে দিচ্ছিলেন। জুডাস ইসকেরিয়েট তখন বললেন, করছো কি! এ মূল্যবান জিনিসটা বেচে টাকাটা গরীবদের দিলে কত ভাল হতো? ক্রাইস্ট প্রতিবাদ করে বললেন, না, দেও তুমি। গরীবদের দিতে পারবে, উপকার করতে পারবে সর্বদা। কিন্তু আমাকে তো পাবে না সর্বদা! 'For ye have the poor with you always; but me ye have not always!' তার পরেই ক্রাইস্টকে ধরে নিয়ে মেরে ফেললো। ঐ তেল তার গায়ে ছিল তখনও।

আহা, কি অহেতুক কৃপা! চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন দানব্রত যজ্ঞ যাঁর জন্য, সেই ঈশ্বর নিজে এসে তোমার সামনে উপস্থিত! এখন তুমি তাঁকে পূজা করে সেবা করে ধন্য হও। তা না করে বলা, সব ঠাকুরের নামে লিখে দিব। গৃহ-দেবতাই যে ঠাকুর, শম্ভুবাবু ধরতে পারেন নাই।

অবতারকে কে ধরতে পারে? যাকে ধরা দেন কেবল সে-ই ধরতে পারে। 'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।' (গীতা ১০/১৫)।

ক্রাইস্ট অন্য সময় miracle (অলৌকিক কার্য) করতেন। কিন্তু এ সময় মেরীর প্রেম ভক্তিতে তাঁর কাছে ধরা দিলেন। জুডাস্ বুঝতে পারলেন না।

ঠাকুর তাই মাঝে মাঝে বলতেন, অচেনা গাছের নাম শুনেছ? সে এক রকম আছে। লোকে তাকে চিনতে পারে না। কৃপা করে কারুকে কারুকে ধরিয়ে দিছলেন।

আর একদিন ঠাকুর চৈতন্যদেবের নাম করে গান গেয়ে নিজের পরিচয় দিছলেন। 'সে যে দীন হীন কাঙ্গালের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে। ও তোরা তাকে চিনলি না রে।'

বেলুড় মঠ, ২৯শে মে ১৯৩১ খ্রীঃ, শুক্রবার।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আপনারা ঠাকুরের বাণীর মূর্ত বিগ্রহ

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। এখন রাত্রি আটটা। আকাশে উজ্জ্বল চন্দ্রালোক। জ্যৈষ্ঠ মাস। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। তিন দিকে সামনে সাধু ভক্তগণ। স্বামী বোধাত্মানন্দ, নিত্যাত্মানন্দ, কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও নিত্যকার ভক্তগণ। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরিতামৃত বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীম — ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন, তোমার আচার কবে পচবে (হাস্য)? সন্ধ্যা হয়েছে দেখে শশধর তর্কচূড়ামণি গঙ্গার ঘাটে যাচ্ছিলেন সন্ধ্যা করতে। ঠাকুর হেসে ঐ কথা বলেন। আচারের দুটো মানে — একটা টক্ খাদ্য — pickle। আর একটা অর্থ, আচরণ, সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম — habits, rituals, observances. খাবার আচার বেশি দিন থাকলে পচে যায়। আর সমাধি হলে ধার্মিক আচরণাদিও পচে যায়, মানে খসে যায়।

সন্ধ্যা-বন্দনাদি করে কেন? সবই ভগবান লাভের জন্য। ওতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তারপর জ্ঞানপ্রাপ্তি আর তত্ত্বদর্শন। সেই ভগবান সম্মুখে বসে আছেন। তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে ও সব করতে। End-কে ছেড়ে means-কে ধরতে যাচ্ছে — প্রাপ্যকে ছেড়ে প্রাপ্তির উপায়ের পেছনে ছুটছে। শশধর ধরতে পারলেন না।

ভক্তদের কেন কাছ-ছাড়া করতেন না? তীর্থাদিতে বা অন্যত্র যেতে দিতেন না? মানে, আমি ভগবান তোমাদের সম্মুখে, আমায় নিয়ে এখন থাক। আর আমার নৃত্য গীত সমাধি এই সব দৈবী সম্পদ দেখ। এতে যা শিক্ষা হবে — হাজার তীর্থবাস তপস্যাতেও তা হবে না। যেতে হয় পরে যেও যখন আমার শরীর থাকবে না।

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।'

একজন সাধু — সাধু ব্রহ্মচারীর কর্তব্য কি, ঠাকুর কি বলতেন এ সম্বন্ধে?

শ্রীম — তাঁর চিন্তায় মগ্ন হওয়া। নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করা দর্শনের জন্য। যদি তা না পারে তবে গুরু যেমন বলেন সেই কাজ করা, নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরের সেবা বুদ্ধিতে।

অধিকারী দেখে গুরু কথা বলেন। একজনকে বললেন, তুমি তীর্থ কর। একজনকে বললেন, তুমি জীব-শিবের সেবা কর। একজনকে বললেন, তপস্যা কর, একজনকে বললেন, তুমি আমার সেবা কর। একজনকে বললেন, শাস্ত্র পড়। এইরূপ অধিকারী ভেদে সাধন।

কিন্তু আসল কাজ ঐ — 'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।' (গীতা ১২/৮)। মনপ্রাণ তাঁর ধ্যানে মগ্ন করে দাও। তা না পারলে (ধ্যান) অভ্যাস যোগ। তা না পারলে ধ্যান জপ পাঠ সেবা পূজা করা — 'মৎকর্ম'। যে সকল কাজ directly (সাক্ষাৎ ভাবে) ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে সংযুক্ত, সে সব কাজ করাকে 'মৎকর্ম' বলে। যেমন মন্দিরাদিতে দেবসেবাদি। যদি তাও না পার, তবে যা করতে মন চায় সেইরূপ শুভ কর্ম কর। কিন্তু benefit (লাভ) নিজে নিও না। যেমন আমাদের মিশনের কাজ — Altruistic works, পরোপকার ব্রত।

কিন্তু যারা অল্প দিন হয় সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য নিয়েছে তাদের পক্ষে চাঁদা তুলতে যাওয়া, মুষ্টি-ভিক্ষা করা dangerous (বিপজ্জনক)। Sights and scenes (দৃশ্য) অন্য রকম। হয়তো যুবতী মেয়ে এসে পড়লো সামনে। তার সঙ্গে দুটো কথা হ'লো। তাতে হানি হয়। যাদের হয়েছে তারাই কেউ কেউ বলেছে।

ঠাকুর তাই বলতেন, চারাগাছ বেড়া দিয়ে রক্ষা করতে হয়। তারপর তা'তে হাতীও বাঁধা যায়। আর বলতেন, টাকার জন্য হীনবুদ্ধি লোকের worship (পূজা) করতে নেই। এতে মন ছোট হয়ে যায়, মলিন হয়।

শ্রীম (ক্ষণকাল চিন্তার পর সাধুদের প্রতি) — অমুক বেশ আছে। এর মানে কি? না, আশ্রয়ের পাকা বাড়ি-ঘর সব হয়েছে। খাওয়া পরার যথেষ্ট জোগাড় হয়েছে। খুব সচ্ছল অবস্থা। আরামে আছে। একে বলে বেশ? রাম রাম! বলতে চাও বল, but to your great risk (নিজের সর্বনাশ আঁচলে বেঁধে বল)। Selling one's soul for a mess of pottage — (খাওয়া পরার আরামের জন্য আত্মবিক্রয় করা বলে একে)!

ঠাকুর এ সব hard unpalatable truths (কঠোর অরুচিকর সত্য) বলে গেছেন।

সার্জেন যখন surgical lancet (ছুরি) চালায় অপারেশনের জন্য, তখন রোগী চিৎকার করে বলে, বাপ রে গেলুম রে। কিন্তু কাটা চেরা হয়ে গেলে তখন বলে — I had a good sound sleep after many days (বহু দিনের পর আজ আমার সুনিদ্রা হয়েছে)।

কি আশ্চর্য তাঁর observation (পর্যবেক্ষণ)! একবার নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে গেছেন ঠাকুর। প্রার্থনা হয়ে গেছে। পুরুষ ও মেয়েরা সব বসেছে। মেয়েদের পায়েও বুট। ঠাকুর বলেছিলেন, এই সব দেখে আমি ভাবলাম এরা বুঝি এবার লাচবে (নাচবে)। তা নয়, দেখি সকলে চোখ বুজে রয়েছে। পরে ভক্তদের বলেছিলেন, আচ্ছা, মেয়েমানুষ কাছে থাকলে ধ্যান হয় কি করে (হাস্য)! আহা, কি observation (পর্যবেক্ষণ শক্তি)! ঠাকুর সর্বদা goal-এ (লক্ষ্যে, ব্রহ্মে) থেকে কথা কইতেন।

শ্রীম এবার আশ্রম, সাধুদের কুশল ও কার্যাদির সংবাদ লইতেছেন।

শ্রীম (একজন সাধুর প্রতি) — আপনারা হেমেন্দ্র মহারাজের (বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাপক স্বামী সদ্ভাবানন্দের) সংবাদ জানেন কি?

স্বামী বোধাত্মানন্দ — আজ্ঞে হাঁ। বিদ্যাপীঠে আসবার জন্য ব্যস্ত। চার বছর হয়ে গেল বিদেশে হাসপাতালে। এখন ভাল আছেন।

শ্রীম — কেন আসতে চায়? এখানে এসে দেখলাম কমলানন্দের

দেহ গেল। বাঙ্গালোরে তো বেশ আছে — খুব ভাল স্থান। ওখানেই থাকুক না। শরীর যখন ওখানে ভাল আছে তখন ওখানেই থাকা উচিত। ভাল হয়ে গেছি বললেই ভাল হলো না। ও সব রোগ (যক্ষ্মা) একেবারে সারে না শুনতে পাচ্ছি। ডাক্তাররা বলেন, ভাল খাদ্য, ভাল স্থান আর সম্পূর্ণ বিশ্রাম — এইগুলি হলে কিছুকাল শরীরটা থাকে। শিশুর মত রাখতে পারলে কিছু দিন বাঁচে।

আহা, মিহিজামে দেখেছি কি খাটুনিই খেটেছে! বিদ্যাপীঠ ওখানেই আরম্ভ হয় কি না। আমরা তখন ওখানে ছিলাম। এই ইনিও (অন্তেবাসী) ছিলেন। অত খেটে শরীরটা খারাপ করলো।

ওর পরিশ্রমের উপর বিদ্যাপীঠের জন্ম। ও-ই তো প্রথম এটা আরম্ভ করলে। সকালে বেরিয়েছে টাকাকড়ি জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে। আর ফিরেছে বিকালে। খেতে চারটা হয়ে যেতো। এ পর্যন্ত উপবাস। আর কত অপমান। দুই তিন ঘন্টা হয়তো বসিয়ে রাখলে, কিছু দিবে বলে। কিন্তু শেষে কিছুই দিলে না। আবার তার উপর অপমান করে বিদায় দিল। জীবন দান করে তবে বিদ্যাপীঠ গড়েছে।

শ্রীম (হেঁয়ালীর সুরে) — গয়না কোথা পেলে সই? সোনা থেকে। সোনা এলো কোথেকে? মাইন (খনি) থেকে। কি করে এলো? মাইনাররা তুলে দিয়েছে — এই সে দিন যারা চাপা পড়ে মরলো কোলারের সোনার খনিতে। এত কষ্টে তবে সোনা হলো। তা থেকে গয়না বানিয়ে এখন তুমি আরামে আনন্দে পরছো। প্রাণান্তকর কষ্টে এ সব আশ্রমাদি হয়েছে।

মিহিজাম থেকে বিদ্যাপীঠ গেল দেওঘর। আমরা রয়ে গেলাম মিহিজামেই। বেশ থাকা গিছলো অনেকদিন — আট মাস। বেশ নির্জন স্থান, উন্মুক্ত মাঠ, বন পাহাড়, আবার নির্মল আকাশ। নির্জনতা যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। অতি অল্প লোকের বাস। তাই সর্বদা ভগবানের উদ্দীপন হয়। ঋষিজন সেব্য, পবিত্র স্থান।

জামতাড়াও গিছলাম। ঠাকুরের আশ্রম আছে। সেও বেশ নির্জন স্থান। সবে আরম্ভ হয়েছে তখন। ভাব মহারাজ (স্বামী রামেশ্বরানন্দ)

করেছেন। আর একজন ছিল, কি তার নাম ব্রহ্মচারী? (অন্তেবাসী বলিলেন, হরসুন্দর।) হাঁ, বেশ লোক। রাঁধতো আর গান গাইতো। কবি লোক।

(সাধুদের প্রতি) — আপনারাও বেশ স্থানে থাকেন। মহাযোগ ক্ষেত্র। সাক্ষাৎ বাবা বৈদ্যনাথ রয়েছেন। তবে একটু সহর হয়ে গেছে। বিদ্যাপীঠ তো বাইরে। তবে খুব উদ্দীপনের স্থান। আগুন সর্বদা জ্বলছে। নিজে কষ্ট করে জ্বালাতে হয় না। কত দেশের কত কালের ভক্ত সাধু মহাপুরুষগণ এসেছেন, আসছেন। নিত্য উৎসব, আনন্দধাম। ঠাকুরও গিছলেন, বৈদ্যনাথ দর্শন করেছিলেন, দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করিয়েছিলেন। এ সব মহাতীর্থে থাকা খুব ভাগ্যের কথা।

শ্রীম কথা কহিতেছেন আর এক একবার আকাশের চাঁদ দেখিতেছেন। আজ জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী, পেনেটিতে উৎসব।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — চৈতন্যদেব ওখানে এসেছিলেন। আমরা একবার ঠাকুরের সঙ্গে গিছলাম। আর একবার যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়া হয় নাই। ফোরটিএইট ইয়ার্স আগে। তখন আপনাদের কারো জন্ম হয় নাই।

অন্তেবাসী — এই এঁর হয়েছিল — শুকলালবাবুর।

শুকলাল — তখন আমার বয়স মাত্র আট বৎসর।

শ্রীম — রঘুনাথ দাসের উৎসব। রাঘব পণ্ডিত থাকতেন ওখানে। ইনিও চৈতন্য পার্ষদ। বালক রঘুনাথ লুকিয়ে ওঁর কাছে আসতেন — রাজপুত্র। বয়স তখন ষোল। একবার নিত্যানন্দ এসে বললেন, এই চোর, তুই লুকিয়ে অমৃত পান করছিস্, তোকে দণ্ড দেব। যা, ভক্তদের চিঁড়ার মহোৎসব করে খাওয়া। সেই থেকে চলে আসছে এই উৎসব। এর বছর তিনেক পর রঘুনাথ সন্ন্যাসী হয়ে পুরী চলে গেলেন। বার বছর ছিলেন ওখানে। স্বরূপ দামোদরকে চৈতন্যদেব তাঁর শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর বৃন্দাবন পাঠালেন রূপ সনাতনের সাহায্য করতে বৃন্দাবন উদ্ধার কার্যে। রাধাকুণ্ডের তীরে বসে দিবানিশি কৃষ্ণনাম জপ করতেন। শেষের দিকে আহার ছিল

— মাত্র সামান্য একটু ঘোল। সনাতনের চাইতেও কঠোরী। কবিরাজ গোস্বামী বেশ লিখেছেন, 'রঘুর নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।' রূপ ও সনাতনের কাছে শুনে কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত লিখেছেন।

এইরূপ সব মহাপুরুষগণ ভারতের সংস্কৃতির মূলে রয়েছেন — সর্বত্যাগী মহাযোগী সব। তাইতো অজেয় এই ভারত সভ্যতা! ধন জন জীবন, সব বিলিয়ে দেন ভগবানের দর্শনের জন্য। যখন সংস্কৃতি একটু নিম্নমুখ হল অমনি একজন মহাপুরুষ এসে উপরে উঠিয়ে দেন। এখন ঠাকুর এসে উপরে তুলে ধরেছেন। বলেছেন, ভগবানদর্শন মনুষ্য-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। কতকগুলির ভিতর এই অগ্নিমন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এঁরা সব অন্তরঙ্গ পার্ষদ। এঁরা আবার অপরদের দিয়েছেন। এইরূপে চলে পরম্পরা। একেবারে নিচে নামতে দেন না ভগবান ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে। (সাধুদের প্রতি) এই আপনারা সব ঠাকুরের বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ।

শ্রীম ক্লান্ত। খুব গ্রীষ্ম। বয়স আশির কাছে। তাই মাঝে মাঝে হাই তুলিতেছেন। চেয়ারে ঠেশ দিয়া বসিয়াছেন। কখনও চাঁদ দেখেন। মাঝে মাঝে শীতল হাওয়ার এক একটা দমকা প্রবাহ চলিতেছে। তখনই শ্রীম যেন উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেছেন আর ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। দেহের সঙ্গে যেন আত্মশক্তির সংগ্রাম চলিতেছে।

আজ চাঁদ খুব উজ্জ্বল। আকাশ নির্মল। মাঝে মাঝে এক এক খণ্ড শুভ্র মেঘদল আকাশের গায়ে যেন পুষ্পাঞ্জলির মত বিচরণ করিতেছে। অথবা যেন অনন্ত সমুদ্রে মীনবৎ বিহার করিতেছে আনন্দে। ছাদটিতে বসিলে বাহিরের কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল নির্মল আকাশ, স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রমা, আর তাহার মনোমুগ্ধকর অপূর্ব সুষমা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এই চাঁদ আমাদের পরম বন্ধু। ইনি কলঙ্কযুক্ত হয়েও নিষ্কলঙ্ক শ্রীরামকৃষ্ণ-শশীকে দর্শন করেছেন। তাই আমাদের আত্মীয় — বন্ধু।

এ স্থানটি সাধুগণের উপযুক্ত। বহির্জগতের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক

নাই। এখানে বসে মনটি — 'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ' হয়ে যায় আপনি। ছড়ান মন কুড়িয়ে আসে। (গীতা ৬/২৫)।

অমৃত — এই বাড়ির মত বাড়ি হয় না।

শ্রীম (রহস্য করিয়া) — আপনারা ভাড়া নিন্ না তা'হলে? (অমৃত চুপ)

শ্রীম (ক্লান্তির সহিত) — ঠাকুরবাড়ি থেকে এখানে এসেছি। আর নড়তে ইচ্ছে হয় না।

শ্রীম দেখিতেছেন চন্দ্রমাতে শ্রীরামকৃষ্ণকে। আর সাধুরা দেখিতেছেন নিজেদের মন। এই মন স্তব্ধ করিয়া, নির্মল করিয়া তাহাতে দেখিতে হইবে শ্রীরামকৃষ্ণ-চন্দ্রকে। কি কঠিন কার্য! কঠিন হউক, দেখা চাই এই জীবনে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন — এই হউক আমাদের পণ।

শ্রীম-র নিজ হস্তে দেওয়া তিনটি লেংড়া আম প্রসাদ পাইয়া সাধুরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। তাঁহারা বৌবাজার যাইবেন। রাস্তা দিয়া চলিতেছেন আর ভাবিতেছেন 'আগে ঈশ্বর পরে জগৎ'। আগে জগৎ পরে ঈশ্বর নয়। সর্বাগ্রে তাঁহার দর্শনের চেষ্টা এখন হইতেই করিতে হবে। দর্শন নয় তো মরণ, এই প্রতিজ্ঞা!

বেলুড় মঠ।
২৯শে মে ১৯৩১ খ্রীঃ, জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩৩৮ সাল।
শুক্রবার, শুক্লা ত্রয়োদশী।।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সাধুসঙ্গ যেমন মরূদ্যান

১

আজ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, পুরীতে দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দিনে প্রাতঃস্মরণীয়া ভবানীর প্রধান নায়িকা রাণী রাসমণি দেবী দক্ষিণেশ্বরে ব্রহ্মশক্তি মহাকালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নবযুবকরূপে এই দিনেই প্রথম শুভাগমন করেন দর্শকের ভূমিকায়, পরে তিনি এই মন্দিরে প্রথম সেবকরূপে কর্ম করেন। তারপর এইখানেই বিভিন্ন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ত্রিশ বৎসর অবস্থানপূর্বক অবতার-লীলা প্রকট করেন। প্রতি বৎসরই এই দিনে ওখানে স্নান-মেলা উৎসব সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। আজ তাই শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেমিক সাধুভক্তগণ এই পুণ্যভূমিতে গমন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ আচার্য শ্রীম আজ এই উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই, শরীর অসুস্থ। তাই ভক্তদের অনেককেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। শ্রীম ব্যাকুলভাবে ভক্তগণের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করিতেছেন। অনেকে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাদিগের নিকট সারাদিনের উৎসবের কর্মসূচি শুনিবেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা নিবাসী ঈশ্বরপ্রেমিকগণও কেহ কেহ আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন। অনেক লোক, সকলেই চারতলার ছাদে বসিয়াছেন।

এখন অপরাহ্ন পাঁচটা। অন্তেবাসী অদ্বৈতাশ্রম হইতে আসিয়াছেন। প্রবীণ ভক্ত শুকলাল, বড় জিতেন, অমৃত প্রভৃতিও আসিয়াছেন।

শ্রীম নিজ কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। প্রায় সাড়ে ছয়টায় তিনি সিঁড়ির ঘরে আসিলেন এবং কুঁজা হইতে গ্লাসে জল গড়াইতেছেন।

তাঁহার পরনে লালপেড়ে ধুতি, গায়ে ডবল ভাঁজ করা কাপড়, পায়ে কাল চটি জুতা। অন্তেবাসী ছাদ হইতে শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন। শ্রীম ইঙ্গিতে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ছাদে জোড়া বেঞ্চের উপর একখানা সতরঞ্চি পাতা। একজন সাধু ইহাতে বসিয়া ভাবিতেছেন, সাধু ও ভক্তগণের জন্য শ্রীম-র কত ভাবনা। তাঁহারা আসিয়া বসিবেন তাই পূর্ব হইতেই আসন পাতিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীম ঘর হইতে বাহির হইয়া ছাদে আসিয়াছেন —হাতে একখানা কম্বলাসন। ভক্তরা সকলেই দাঁড়াইয়া শ্রীমকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি যুক্ত করে, 'নমস্কার নমস্কার, বসতে আজ্ঞা হউক' বলিয়া আসনখানা তাঁহার বসিবার চেয়ারে রাখিয়া দাঁড়াইয়া অন্তেবাসীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আজ আপনারা দক্ষিণেশ্বর গিছলেন কি? অন্তেবাসী উত্তর করিলেন, আজ্ঞে না। ডাক্তার চক্ষু পরীক্ষা করবার জন্য আমার চোখে ঔষধ দিয়েছেন তাই যাওয়া হয় নাই। তা'ছাড়া অদ্বৈতাশ্রমে আমি আর শান্তানন্দজী ছিলাম। শান্তানন্দজীর সহিত ঐ আশ্রমের সকলেই গিয়েছিলেন। আমি ছিলাম প্রহরী। ম্যানেজার স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ ফিরে এলে আমি এখানে এসেছি। স্বামী রাঘবানন্দ গিয়েছিলেন।

শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে আগত ভক্তদের নিকট হইতে আজের স্নানমেলা উৎসবের সংবাদ লইতেছেন। তাহার পর পুনরায় অন্তেবাসীর সহিত কথোপকথন হইতেছে।

শ্রীম — আচ্ছা, জগদানন্দ কোথায় আছেন?

অন্তেবাসী — বেলুড় মঠে।

শ্রীম — শান্তানন্দ?

অন্তেবাসী — অদ্বৈতাশ্রমে ছিলেন। আজ দক্ষিণেশ্বর থেকে মঠে গেছেন।

শ্রীম — শান্তানন্দের বয়স বলে পঁয়তাল্লিশ। আমি দেখছি সেই ১৮।১৯ বৎসরের ছোকরা।

অন্তেবাসী — এখন সাতচল্লিশ চলছে।

শ্রীম (বিস্ময়ে) — তাহলে আরো বেশী।

অন্তেবাসী — দেখতে ছেলেমানুষের মত! আবার serious moments-ও (গম্ভীর ভাব) আছে। খুব সাধন ভজন করেন regularly (নিয়মিতরূপে), আলস্য নাই। রুটিন follow (অনুসরণ) করেন strictly (সুদৃঢ়ভাবে) যেখানেই থাকুন। তিনি অতি সামান্য জিনিসপত্র রাখেন, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে। খুব মিষ্ট স্বভাব। কিন্তু ভিতরে খুব তেজ। কাশীতে নূতন সাধুভক্তদের নিয়ে গঙ্গাস্নান করতে যান, আর বিশ্বনাথ, অন্য দেবদেবী দর্শন করান। সাধুভক্তদের মালা গেঁধে দেন আর কমণ্ডলুতে 'রাল' লাগিয়ে দেন। আবার exercise-ও (ব্যায়াম) করেন।

শ্রীম — কি exercise (ব্যায়াম)?

অন্তেবাসী — হঠযোগের আসন। এতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় — বাতাদি হয় না।

শ্রীম — ওমা, আমার যে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না! দেখাও দেখি দুই একটা!

অন্তেবাসী দুইটি আসন দেখাইলেন। একটি, চিৎ হইয়া শুইয়া হাত লম্বা করিয়া পিছনের দিকে রাখিয়া, তারপর ধীরে ধীরে মাথা ও শরীরটাকে তুলিয়া দুই হাতে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া, নাসিকা দুই হাঁটুর ভিতর রাখিয়া। আর একটি, চিৎ হইয়া শুইয়া সমানভাবে দুই পা তুলিয়া শিরের উপর দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া।

আবার কথা হইতেছে।

শ্রীম — জগদানন্দ ধ্যানজপ কি রকম করেন?

অন্তেবাসী — ওঁর ভাব অন্যরকম। উনি একটানা একটা ভাব নিয়ে থাকেন।

শ্রীম — ওঁর পড়াশোনাই বেশী।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে হাঁ। যদি কেউ পড়তে চায় তবে শাস্ত্র পড়ান। সেধে গিয়ে পড়ান না। কেউ কথা কইলে কথা কন। নিজে

নিজে একটু আধটু পড়েন আর নিজের ভাবে থাকেন। বিদ্যাপীঠে ওঁর ঘরে একটা পুরানো পঞ্জিকা পড়ে ছিল। উনি ওটাই পড়ে শেষ করে ফেলেন। তারপর আমাদের সঙ্গে সুন্দর আলোচনা করেন জ্যোতিষ সম্বন্ধে।

শ্রীম — ওঁর শরীর ভাল নয়।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে হাঁ, ডায়বেটিস্ হয়েছে! কিন্তু সর্বদা তাঁর মুখে হাসি। কেউ নিন্দা করলেও গ্রাহ্য করেন না। ইনি সব খবর রাখেন জগতের — রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, যুদ্ধাদির সব সংবাদ বলতে পারেন। নিত্য খবরের কাগজ পড়েন। দেশের ও বিদেশের সব খবর রাখেন। যে যেমন তার সঙ্গে তেমন কথা বলেন। বেদান্তশাস্ত্রে অনুপ্রবেশ আছে। ভিতরে খুব ভক্তি বাইরে জ্ঞান।

শ্রীম — শান্তানন্দ পড়েন না বুঝি?

অন্তেবাসী — পড়েন অল্প, যেমন কথামৃত, উদ্বোধন, প্রবুদ্ধ ভারত, এই রকম। সিদ্ধান্তবাক্য সব পড়েন, ঠাকুর-মা-স্বামীজী মহারাজদের কথা। ধ্যানজপের বড় নিষ্ঠা। ওঁর নামটির মতই নিজের স্বভাবটি।

শ্রীম — আরো কেউ কেউ সাধন-ভজন নিয়ে বাইরে থাকেন, কাজে তেমন আসেন না — স্বপ্রকাশানন্দ, তন্ময়ানন্দ, মোক্ষদানন্দ, মোক্ষানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, তপানন্দ, গিরীশানন্দ — আর কে? জপানন্দ, সিদ্ধানন্দ আর মেদিনীপুর থাকেন, কি নাম তাঁর? হাঁ, চারু। সুরেশও বুঝি থাকেন। আর একটি আছেন গঙ্গারাম। খুব কঠোরী। তিনি last (শেষ) কোথায় ছিলেন শুনেছিলাম — হাঁ, বৃন্দাবনে। উনি পশ্চিমের সাধুদের সঙ্গে খুব মিশেন। ওঁরা অনেকে তাঁর কাছে ঠাকুরের নাম শুনেছেন।

অন্তেবাসী — আজকাল অনেক সাধুই ঠাকুরের নাম জানেন। আর আমাদের দেখেও সাধুরা অবাক হন। বলেন, বাবা, এ আবার কি রকম সাধু — সব রকম কাজ করে — পড়ায়, কাগজ লেখে, হাসপাতাল করে, রিলিফ করে, আবার ধ্যানভজন শাস্ত্রপাঠও করে!

পোষাক দেখেও বলেন, বাবুও নয় আবার তাঁদের মত সাধুও নয়, মাঝামাঝি।

শ্রীম — হাঁ, সমুদ্রকোপে সাধুরা বলেছিলেন শর্বানন্দকে দেখে — পায়ে বুট ও মোজা পরা ছিল। বলেছিলেন, আরে য়হ ক্যায়সা মহাত্মা (হাস্য)!

অন্তেবাসী — সমুদ্রকোপ কোথায়?

শ্রীম — প্রয়াগে, last (বিগত) কুম্ভে। ওঁরা তো দেখেন নাই অমন বুট-মোজা পরা সাধু, তাই অবাক হন। সাধুরাই এসে আমাদের এই সব খবর দিলেন। কলিতে এই রকম হবে।

অন্তেবাসী — আমি দেওঘরে বৈদ্যনাথের মন্দিরে রোজ যাই। সন্ধ্যাবেলার ধ্যানজপ ওখানেই বসে করি। এই পোষাক পরা ছিল — গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবী, মাথায় টুপি আর চাদর। পার্বতী মন্দিরের পাশের মন্দিরের বারান্দায় বসে একদিন ধ্যানজপ করছি। তখন একটি কাশ্মীরী সাধু এসে সামনে দাঁড়ালেন — নেংটি পরা, লম্বা চুল মাথায়, হাতে চিম্‌টা। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবুজী, পার্বতীকা মন্দির কৌন হ্যায়?' আমি বললাম, 'ম্যয় সাধু হুঁ'। তখন বললেন, 'ওঁ নমো নারায়ণায়। গুরু স্থান কাঁহা?' আমি বললুম — 'বেলুড় মঠ।' তিনি বললেন, 'ম্যয় উধরভী গিয়া থা, আচ্ছা মঠ হ্যায়।'

শ্রীম — কি রকম বসা ছিলে, আসনে?

অন্তেবাসী — না, পাথরের মেঝেতে। মাথাও মুণ্ডিত ছিল।

শ্রীম — তা হলে 'বাবুজী' বললেন কেন 'বাবাজী' বলেন নাই তো?

অন্তেবাসী — আমি যেন শুনলাম 'বাবুজী'। ও স্থানটাতে তেমন আলো ছিল না।

শ্রীম — তাই হবে, দেখতে পান নাই ভাল করে।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — নিখিলানন্দ, অশোকানন্দ এঁরা বুঝি new generation (নূতন যুগের লোক); সীতাপতি মহারাজ (স্বামী রাঘবানন্দ) বুঝি

back-number (পুরানো মাল)!

আহিরীটোলা হইতে দুই জন ভক্ত যুবক আসিয়াছে। তাহারা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতে গেলে শ্রীম বাধা দিয়া অন্তেবাসীকে দেখাইয়া বলিলেন, এঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করুন। ইনি সাধু। সাধুকে প্রণাম করলে জ্ঞানভক্তি লাভ হয়, ঠাকুর বলতেন। অন্তেবাসীকে প্রণাম করিয়া যুবকদ্বয় শ্রীম-র ডান হাতে বেঞ্চেতে বসিল।

শ্রীম (অন্তেবাসীকে দেখাইয়া যুবকদের প্রতি) — এই দর্শন করুন সাধু, আপনারা যা হবার জন্য চেষ্টা করছেন। এই সেই সাধু। এঁরা প্রথমে কত struggle (সংগ্রাম) করেছেন। এখানে ছিলেন, মঠে যেতে কত ওজর আপত্তি। বলতেন, ওখানে গেলে এখানে আসার leisure (অবসর) হবে না — কত repentance (অনুশোচনা)! অষ্টম্ কষ্টম্ কেটে গিয়ে এই অবস্থা এখন। এখন আবার exercise (ব্যায়াম) করবারও সময় পান (হাস্য)।

জনৈক ভক্ত (স্বগত) — খুব ভরসার কথা — অষ্টম্ কষ্টম্ কেটে গেছে বলছেন।

২

একজন যুবক বিদ্যার্থী, তাহার দাদা ও দুই জন বন্ধুর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্তেবাসী আহ্লাদের সহিত বিদ্যার্থীর সহিত আলাপ করিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — তোমার সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে হাঁ। অদ্বৈতাশ্রমে থাকে, বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে। সাধু —

শ্রীম (মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া) — সাধুর candidate (উমেদার)?

অন্তেবাসী — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম (বিদ্যার্থীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) — উপাধিটা (চশমাটা) ন্যাও তো? (নিবিষ্ট মনে মুখমণ্ডলে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া)

আচ্ছা, তুমি কি গান্ধী ক্যাপ পরেছিলে?

বিদ্যার্থী — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম — কতদিন?

বিদ্যার্থী — ছয় মাস।

শ্রীম — বেশ, বেশ। Noble enterprise (মহৎ প্রচেষ্টা)। যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে, ঠাকুর বলতেন।

গান্ধী মহাত্মা শুধু খদ্দর করেন না — রাম নামও প্রচার করেন নিত্য।

তাঁকে arrest (বন্দী) করতে এসেছে। আশ্রমের লোক বলছেন উনি আহ্নিক করছেন। ওরা অপেক্ষা করছে। উনি এক ঘন্টা ধরে ধ্যান জপ ও পূজা করে প্রসন্ন মনে arrested (বন্দী) হয়ে তাদের সঙ্গে চলে গেলেন। কোনও সঙ্কোচ, ভয়, দ্বিধা, ঘৃণা নেই। আশ্চর্য লোক — অবতার-প্রায়! আমরা judge (বিচারক) নই, কিন্তু মনে হয় অবতার-প্রায়।

নিত্য রাম নাম করেন — 'পতিতপাবন সীতারাম'। 'সীতারাম' মানে ঈশ্বর। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত, তাঁকেই রাম বলা হয়।

ঠাকুরও ঠিক এই কথা বলেছিলেন — 'ভক্তের জাত নাই — ভক্তরা সব এক জাত।' Problem of untouchability solve (অস্পৃশ্যতা সমস্যার সমাধান) করতে হলে এই ঠিক পথ — ভক্তি প্রচার করা। 'পতিতপাবন রাম' — এই নাম দিয়ে এই problem solve (এই সমস্যার সমাধান) হবে।

বিদ্যার্থী — আজকের দিনে ঠাকুরের একটু কিছু কথা বলুন।

শ্রীম বিদ্যার্থীর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তবুও তাহার কথায় মনোযোগ দেন নাই। দ্বিতীয়বার তিনি অতিশয় বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন।

শ্রীম — এও তাঁরই কথা। তাঁর কথা ছাড়া তো আমরা কিছু

বলি না। তাঁর কথা শুনলে কাজ করতে হবে। সন্ধ্যার সময় এখন সব ছেড়ে ধ্যান জপ করতে হবে।

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যিনি, তিনিই রাম, এই তাঁর একটি কথা।

বাজনার বোল হাতে আনতে হবে, এই তাঁর আর একটি কথা। (বিরক্তির সহিত) তুমি বকে যাও। আমরা এ কান দিয়ে ঢুকাবো আর ও কান দিয়ে বের করে দিব। তা'হলে কেমন করে হয়? তাঁর কথা শুনলে কাজ করতে হবে।

(একটু চিন্তার পর) বেদে আছে অন্তেবাসী — 'অন্তেবাসী' মানে শিষ্য, বলছে, 'উপনিষদং ভো ব্রূহি'। আচার্য উত্তর করলেন, এই তো বললাম উপনিষদ্। শিষ্যের মনে এ কথা লাগছে না।

বাংলায় বললেই কি উপনিষদ্ হলো না? এও উপনিষদ্। তাঁর (ঠাকুরের) কথা সব বেদ, উপনিষদ্। যে কথায় মানুষের মনকে টেনে উপরে তুলে দেয় — ঈশ্বরে, যাতে মানুষ দেবতা হয়, তাই উপনিষদ্।

একটি যুবকের প্রবেশ। ইনি পূর্ববঙ্গের লোক। শ্রীম তাঁহাকে দেখিয়া রহস্যচ্ছলে পূর্ববঙ্গের ভাষায় অভ্যর্থনা করিতেছেন, আসুন আসুন, বসুন। যুবক বলিলেন, মেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে নিচে বসে আছেন দর্শনের জন্য। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন ক'জন? যুবক বলিলেন, একজন, সঙ্গে দু'টি ছেলে। শ্রীম একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, বলুন আসতে। এই সাধু আছেন! যুবক স্ত্রী-পুত্র লইয়া উপরে আসিয়াছেন।

যুবক সস্ত্রীক ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীমকে নমস্কার করিতে প্রস্তুত হইলেন। শ্রীম বিরক্ত হইয়া ভর্ৎসনার সুরে বাধা দিয়া বলিলেন, সে কি, সাধুকে নমস্কার করুন — সাক্ষাৎ নারায়ণ! (স্ত্রীর প্রতি) আসুন মা আসুন, নমস্কার করুন, এই সাধু। (যুবকের প্রতি) করুন, নমস্কার করুন সাধুকে। একেই বলে, they seeing see not; and hearing they hear not — চোখ থাকতে কানা আর কান থাকতে কালা।

পতিপত্নী অপ্রস্তুত হইয়া সাধুকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন। শ্রীম পুনরায় সাবধান করিয়া বলিলেন, এরূপ নয় — সাধুর পায়ে মাথা স্পর্শ করে প্রণাম করতে হয়। প্রথমে যুবক তাই করিলেন। সাধু

সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন এই সাড়ম্বর প্রণামে। তাই স্থির হইয়া বসিয়া ইষ্ট স্মরণ করিতেছেন। শ্রীম প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, 'জয় গুরু, জয় গুরু'। যুবকের স্ত্রীও ঐ ভাবে প্রণাম করিলে শ্রীম উচ্চারণ করিলেন, 'মা ব্রহ্মময়ী, মা ব্রহ্মময়ী'।

সাধু (স্বগত) — কি আশ্চর্য! শ্রীম তো কখনও এরূপ করেন না! কোন স্ত্রীভক্ত ছাদে আসিতে পারেন না। এমন কি বাড়ির বালিকাদেরও আসা নিষেধ। আজ এরূপ বিপরীত ব্যবহার করিলেন কেন? শ্রীমই একদিন ঁকালীঘাটে প্রদক্ষিণের সময় ভীড়ে আমাকে বুকের উপর টেনে নিয়েছিলেন পাছে প্রদক্ষিণরতা স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ হয়। আজ তাঁর এই অভিনব ব্যবহার কেন? ইনিই তো আমার ধর্ম-জীবনের জনক! অত কড়া শাসন তাঁর। শ্রীম-র 'জয় গুরু, জয় গুরু' ও 'মা ব্রহ্মময়ী, মা ব্রহ্মময়ী' এই মহামন্ত্রদ্বয় গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে সাধুর কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার সঙ্কোচ নিমেষে বিদূরিত হইল। তাঁহার মন উচ্চভূমিতে আরূঢ়।

পতিপত্নী তৎপর শ্রীমকে ঐরূপ প্রণাম করিতেছেন। শ্রীম বাধা দিয়া বলিলেন, পায়ে কেন মা?

সাধু ও ভক্তগণকে বলিতেছেন, আপনারা আসুন, ঘরে গিয়ে ঠাকুর দর্শন করি। আর দম্পতিকে বলিলেন, আপনারা ও দিকে (তুলসীকুঞ্জে) বেড়ান একটু, ঐ ছাদে।

শ্রীম-র শয়নকক্ষের পূর্ব দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা ও পার্ষদদের ছবি বিলম্বিত। আরো দেবতা ও নরদেবতার ছবিও রহিয়াছে। শ্রীম নিজ হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া ঠাকুর-দেবতাদের দীপ দর্শন করাইতেছেন। অন্তেবাসী লণ্ঠনটি চাহিয়া নিজ হাতে লইলেন। শ্রীম বলিলেন, হাঁ, দেখাও সকলকে। তিনি ছাদে চলিয়া গেলেন।

অন্তেবাসীর সহিত ভক্তগণ দীপ সহায়ে সকল দেবদেবীর ছবি দর্শন করিতেছেন। ভক্তগণ কেহ কেহ বাহিরে ছাদে শ্রীম-র কাছে যাইতে চাহিলেন। অন্তেবাসী বারণ করিলেন। শ্রীম ভক্তদম্পতির সহিত দু'চারটি ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন একান্তে।

কিছুক্ষণ পর অন্তেবাসী ঘর হইতে শুনিলেন, শ্রীম দম্পতিকে বলিতেছেন, আপনারা এখানে (ছাদের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে) দাঁড়ান। ওঁরা যখন (পূর্বমুখী) ছাদে আসবেন, আপনারা তখন এখান দিয়ে, বাম দিক দিয়ে টিনের ঘরের গা ঘেঁষে, বের হয়ে যাবেন।

এই কথা শুনিয়া অন্তেবাসী ভক্তদের লইয়া ছাদে বাহির হইলেন। তিনি সিঁড়ির উপর হ্যারিকেন রাখিতেছিলেন। শ্রীম ছাদ হইতে বলিলেন, আলোটা নিয়ে এসো, তুলসীতলায় দেখাতে হবে।

অন্তেবাসী আলো তুলসীতলায় দেখাইলেন। শ্রীম সকলকে বলিলেন, এবার ধ্যানজপ করুন বসে। তিনি আলো লইয়া সিঁড়ির কাছে গিয়া ভক্ত-দম্পতিকে বিদায় দিলেন।

সাধুভক্তগণ তুলসীকুঞ্জে প্রণাম করিয়া পার্শ্বের টবের 'তপোবনে' বসিয়া জপ-ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম আসিয়া সকলের পশ্চাতে বসিলেন ক্ষুদ্র কম্বলাসনে। একজন ভক্ত শ্রীম-র সামনে একটু ডান পাশে বসিয়াছিলেন। হাঁচি আসায় উনি উঠিয়া গেলেন। পরে শ্রীম-র পশ্চাতে বসিলেন জলের ট্যাঙ্কের কাছে।

সকলেই ধ্যান করিতেছেন। একজন ভাবিতেছেন, কি সৌভাগ্য আমাদের — অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ মহাপুরুষ শ্রীম-র সহিত আমরা বসিয়া ঈশ্বরচিন্তার চেষ্টা করিতেছি! কি প্রশান্ত সময়! আকাশে পূর্ণচন্দ্র। সাধুভক্তগণ তাহারই সুশীতল সুষমায় নিমজ্জিত। পাঁচ মাইল সম্মুখে ঁদক্ষিণেশ্বর, অবতারের লীলাস্থল। আর পাঁচ মাইল পশ্চাতে ঁকালীঘাট, দেবলীলা ভূমি। বামে পতিতপাবনী সুরধুনী। আর শিরোপরি উজ্জ্বল নভোমণ্ডল — তাহার জ্যোতির্ময় ললাটে 'নক্ষত্রাণামহং শশী'।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিত্যকার ভক্তগণ আসিয়া নীরবে ধ্যানে যোগদান করিলেন। অনেক ভক্ত একসঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। উত্তরের ছাদ লোকে পরিপূর্ণ।

৩

অনেকক্ষণ পর শ্রীম প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন — আজ খুব গরম, এই কথা বলিতে বলিতে। অন্তেবাসীর কানের কাছে বলিলেন, এদের নিয়ে ঠাকুরবাড়ি যেতে হবে। অন্তেবাসীও উঠিয়া আসিলেন। শ্রীম ছাদের দক্ষিণ দিকে চেয়ারে কম্বলাসনখানা রাখিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আবার বলিলেন, বড় গরম। একটু পর ঘর হইতে ছাদে আসিয়া তিনি নিজের আসনে বসিয়াছেন, উত্তরাস্য। তাঁহার বাঁ হাতে জোড়া বেঞ্চেতে অন্তেবাসী বসা। সামনে ও ডান হাতে শুকলাল, অমৃত প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়াছেন। উত্তর প্রান্তে কেহ কেহ এখনও ধ্যানরত। তাই শ্রীম আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি)— কৈ সে চশমাওয়ালা ভক্তটি?

অন্তেবাসী — ঐ তুলসীকুঞ্জে ধ্যানমগ্ন।

শ্রীম (প্রসন্ন স্মিতহাস্যে) — দেখবে সকলের শেষে উঠবে। After the home thrash (তিরস্কারের পর) সকলের শেষে আসবে।

এই সব কথা light (সামান্য) মনে করে। এ সবই তাঁরই কথা।

সার্জেন যখন surgical lancet (ছুরি) চালায়, রোগীর তখন কত আপত্তি, কত কষ্ট। তারপর রক্তপুঁজ বের হয়ে যায়, তখন বেশ আরামে নিদ্রা যায়। ডাক্তারকে তখন বলে, Sir, I had a good sound sleep — really a good sound sleep — মশায় সত্যি করে বলছি আমার বড়ই সুনিদ্রা হয়েছিল। প্রথমে কত ওজর আপত্তি, গালাগাল চীৎকার। এখন বেশ আরাম।

এই সব তাঁর (ঠাকুরের) saving truths trifle (সঞ্জীবনী মহাবাক্যসমূহ তুচ্ছ) মনে করে।

ভক্তগণ একে একে তুলসীকুঞ্জ হইতে উঠিয়া আসিয়া শ্রীম-র কাছে বেঞ্চেতে বসিয়াছেন।

শ্রীম অন্তেবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈ, সে বুঝি আসে নাই? অন্তেবাসী উত্তর করিলেন, ঐ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে। শ্রীম অতি

আহ্লাদের সহিত বলিলেন, দেখলে?

বিদ্যার্থী শ্রীম-র কথা পালন করিয়াছে — অনেকক্ষণ ধ্যান করিয়াছে দেখিয়া বড়ই প্রসন্ন হইয়াছেন। বিদ্যার্থী নিকটে আসিতেই শ্রীম সস্নেহে তাহাকে বলিলেন, বসো ওখানে বসো।

কিছুক্ষণ পর শ্রীম আহিরীটোলার যুবক ভক্ত দুইজনকে বলিলেন, আপনারা এঁদের নিয়ে যান ওখানে (ঠাকুরবাড়িতে)। সকলের প্রতি, বিশেষ করিয়া বিদ্যার্থীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীম বলিলেন, রাম নাম হয় সেখানে, আর ঠাকুরের আরতি হয়। আরতি হয়তো হয়ে গেছে। রাম নাম শুনবে আর একটু বসবে। তারপর প্রসাদ নিয়ে চলে যাবে বাড়ি, যদি ও দিক হয়। সকলে রওনা হইলেন।

অন্তেবাসী বিদ্যার্থীকে বলিলেন, ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুরের ব্যবহৃত পাদুকার নিত্য পূজা হয়। তুমি তা দর্শন স্পর্শন ও প্রণাম করে যেও। শ্রীম তাহাকে অত্যন্ত আদর করিয়া বলিলেন, অন্য একদিন এসো। বিদ্যার্থী আনন্দে উত্তর করিল, যে আজ্ঞে, আসবো!

বিদ্যার্থী, তাহার দুই সঙ্গীবন্ধু, দাদা ও আহেরীটোলার যুবক ভক্ত দুইজন যাইবার সময় সাধুকে পাদস্পর্শ করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া গেল। শ্রীম ইহা দেখিয়া মুচকি হাসিলেন। তাঁহার আজের শিক্ষা ফলপ্রসু হইয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্বে পতিপত্নী শ্রীম-র আদেশে অন্তেবাসীর পায়ে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে, অন্তেবাসী অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া ভাবিতেছিলেন — কেন আজ এইরূপ ব্যবহার করিলেন! ঐ ভাবনার স্পন্দন এখনও অন্তেবাসীর মনের নিভৃতে সজাগ রহিয়াছে। শ্রীম উহা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এখন তার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কেশব সেনকে ঠাকুর বলেছিলেন, সাধুকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে ভক্তিলাভ হয়। ইংরাজী পড়ায় ও সব উঠে গিছল। তিনি এসেছেনই মানুষ হয়ে এই জন্যে, যাতে জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস লাভ করে লোক সুখ শান্তিতে সংসারে থাকতে পারে। বলতেন, এই সংসার-মরুভূমিতে সাধুসঙ্গ যেন oasis (মরূদ্যান)।

সাধুকে আশ্রয় করে সংসারে ভক্তগণ থাকবে। চণ্ডীতে এই কথা দেবগণ বলছেন, 'ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি' — মা, তোমাকে আশ্রয় করে যারা রয়েছেন অর্থাৎ সাধুগণ — তাঁরাই জগতের জনগণের আশ্রয়। এ সব কথা কি কেবল বইতেই থাকবে? তিনি যেকালে বলেছেন সাধুর পা ছুঁলে ভক্তিলাভ হয়, তখন ইহা বেদবাণী — Gospel Truth, এতে সাধু ও ভক্ত উভয়েরই কল্যাণ।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — সাধুর দু'কাজ — নিজের মুক্তি ও অপরের মুক্তির ভাবনা। কেবল নিজের মুক্তির কথা ভাবলে চলবে না — বরং অপরের মুক্তির কথা ভাবতে হবে আগে।

সন্ন্যাসী জগৎগুরু। অত বড় responsibility (দায়িত্ব) তাঁর। সারা জগৎই তাঁর আপনার — 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' — সাধু সর্বদা যোগে থাকবে। তা হলেই, অপরকে দিয়েও, নিজের প্রচুর থাকবে। সাধু ও ভক্তের এ সম্বন্ধ অনন্তকাল থেকে চলে আসছে। সাধু মানে সর্বত্যাগী, যিনি সব ছেড়ে চেষ্টা করছেন ভগবানকে লাভ করতে। আর ভক্ত, যেমন পাণ্ডবগণ —তাঁরা সংসারে আছেন, ভোগও করছেন আবার ভগবানকেও চান। সাধুর কেবল যোগ, ভক্তের যোগ ভোগ।

সাধুরা নিজে যোগী হয়ে, আদর্শ জীবন যাপন করে ভক্তদের জ্ঞান ভক্তি লাভে সহায়তা করবেন। ভক্তরা সাধুদের প্রণাম করবে, পূজা করবে, সেবা করবে।

সাধু ভগবানের সচল বিগ্রহ। গীতায় ভগবান এই কথা বলেছেন — 'জ্ঞানী তু আত্মৈব মে মতম্' (৭/১৮) — জ্ঞানী অর্থাৎ সর্বত্যাগী সাধু আমার নিজের রূপ। তাইতো সাধুদের প্রণাম করবার সময় লোকে বলে, 'ওঁ নমো নারায়ণায়'। সকলের ভিতরই নারায়ণ রয়েছেন, কিন্তু সাধুর ভিতর তাঁর প্রকাশ বেশী। তাই সাধু জগৎপূজ্য।

পূজা নিলেই প্রতিদান করতে হয়। সে প্রতিদান, জ্ঞান ভক্তি যাতে বৃদ্ধি হয় ভক্তদের, এই শুভেচ্ছা ও চেষ্টা।

যতক্ষণ দেহবুদ্ধি আছে ততক্ষণ এই আদান প্রদান করতে হয়।

দেহবুদ্ধির বিলোপ হলে তখন আর কোন কর্তব্য নেই — সে দায় ভগবানের। ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন —

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীতা ৯/২২)

অন্য সব চিন্তা, সব কাজ ছেড়ে একমনে যে ভগবান লাভের জন্য চেষ্টা করছে — এইরূপ নিত্য যোগীগণের দেহযাত্রা নির্বাহের ভার আমার।

সংসারে গৃহে থাকলেই পাঁচটা কাজ এসে পড়ে। তাতে 'অনন্যচিন্তা' হয় না। যে এইরূপ গৃহ সংসার ছেড়ে পথে দাঁড়িয়েছে, তার পক্ষে 'অনন্যচিন্তা'র অভ্যাস সহজ। তাঁকেই সাধু বলে। এ সব general rules (সাধারণ নিয়ম) — তার ব্যতিক্রমও হয়। ঘরে থেকেও কারুকে দিয়ে 'অনন্য চিন্তা' করিয়ে নেন।

বেলুড় মঠ।
৩১শে মে, ১৯৩১ খ্রীঃ।
রবিবার।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ঠাকুর দ্বারে দাঁড়িয়ে — হাতে অমৃত ভাণ্ড

১

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। আজ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। শ্রীম-র সম্মুখে ও ডান হাতে বেঞ্চেতে ভক্তগণ বসা। নিত্যকার ভক্তগণ ছাড়াও আজ অনেক অভ্যাগত ভক্ত ও ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন। শ্রীম-র বাম হাতে জোড়া বেঞ্চের উপর বসা স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, পরে স্বামী রাঘবানন্দ। শ্রীম কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন।

ইহারই মধ্যে ধীরে ধীরে একটি যুবক প্রবেশ করিল। তাহার বয়স বছর কুড়ি-একুশ। খাকী সার্ট পরা। সে আসিয়া শ্রীম-র ডান হাতে বসিয়াছে — উকিল ললিত বাঁড়ুয্যের ছেলের পাশে। ছেলেটি প্রণাম করিলে শ্রীম তাহার সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — এই দর্শন করুন সাধু। আপনি তো সাধু হতে চান! এঁদের প্রণাম করলে, সেবা করলে সাধু হওয়া যায়। আপনারা তো তাই-ই করছেন, গদাধর আশ্রমে তো রোজ যাচ্ছেন?

যুবক — আজ্ঞে না, রোজ পারি না যেতে, সময় হয় না।

শ্রীম — কেন?

যুবক — কাজ করতে হচ্ছে।

শ্রীম — কি কাজ, কোথায়?

যুবক — কোচিং স্কুলে একটা কাজ। আর একটা 'টুইশন' আছে। প্রমথ তর্কভূষণের নাতিকে পড়াতে হচ্ছে রাত্রে।

শ্রীম — কত টাকা পান?

যুবক — চল্লিশ টাকা আর কুড়ি টাকা।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি)— অবসর কোথায় তাহলে! একটা করলেই তো খরচার টাকা উঠে যায়! কোচিং স্কুলের কর্ম রাখলে হয়। ওটা আবার কেন? কত দিন যাচ্ছেন?

যুবক — দিন পনের।

স্বামী রাঘবানন্দ প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম — এটা ছেড়ে ওটা রাখলেই যথেষ্ট।

যুবক — একটায় চলে না, খরচা —

শ্রীম (কথা শেষ না হইতে, বাধা দিয়া) — রাখুন রাখুন। (চক্ষু উপরে তুলিয়া শ্রীম কি স্মরণ করিতেছেন)। হাঁ, selling the soul for a mess of pottage — পেটের জন্য soul-কে (আত্মাকে) বিক্রয় করা। 'Soul' (আত্মা) মানে spirituality (ধর্মজীবন)। এমন যৌবন তাঁর সেবায় না দিয়ে কুটুম্ব পোষণ? মানুষ জন্ম, যৌবন তাঁর সেবায় না গেলে মিছে। 'মনুষ্যত্ব মুমুক্ষুত্ব মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ' — তিনটেই আছে। এমন সুযোগ আর জীবনে হবে না! মনুষ্যত্বও হতে পারে, মুমুক্ষুত্বও হতে পারে। এমন মহাপুরুষ সংশ্রয় আর হবে না আবার অবতার না আসা পর্যন্ত। ঠাকুর এসেছেন কি না, ভগবান মানুষ শরীর নিয়ে এসেছেন এখন। এখন হাওয়া বাতাসে তাঁর ভাব ছড়িয়ে আছে। মাহেন্দ্রক্ষণ এই সময়। এখনও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তগণ কেহ কেহ রয়েছেন। এর advantage (সুযোগ) নেওয়া উচিত। ছেড়ে দিন এটা। (ব্যঙ্গ করে) চ-লে-না। সাধুসঙ্গ সাধুসেবা বেশ তো করছিলেন? গদাধর আশ্রম ও (বেলুড়) মঠে যাওয়া বেশ হচ্ছিল!

ঠাকুর বলেছিলেন নরেন্দ্রকে, যখন অন্নবস্ত্রের অভাবে পড়েছিল — ডাল ভাতের যোগাড় হতে পারে, মা বললেন। এর বেশি নয়। নরেন্দ্রর খুব কষ্ট তখন — বাবা মারা গেছেন। বড় পরিবার, ভার পড়েছে তার উপর। তখন ঠাকুরকে বলেছিলেন জগদম্বাকে বলতে। তাতেই ঠাকুর বললেন, মা বলেছেন, ডাল ভাত পর্যন্ত হলে হয়, এর বেশী নয়। ডাল ভাতের ব্যবস্থা মানে মোটামুটি জীবন-ধারণের

ব্যবস্থা।

নরেন্দ্রকে বলেছিলেন মানে humanity-কে (মানব জাতিকে) বলেছেন। যারা ভগবানকে চায় অমন লোকদের জন্য এই ব্যবস্থা। যারা সংসার ভোগ করবে তাদের জন্য নয়। তারা করুক যা ইচ্ছে তাই, সময় হয় নাই তাদের এখনও। কিন্তু যাদের কতক চৈতন্য হয়েছে, কিছু সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা করেছে যারা, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা, ডাল ভাতের ব্যবস্থা। কেন এ ব্যবস্থা? তা নইলে সময় হবে কি করে তাঁকে ডাকবার? সব সময়ই চলে যাবে অর্থোপার্জনে আর পরিবার পোষণে। ভক্তরা চাল বাড়াবে না, তাদের life (জীবন ধারণ) হবে সরল। বাকী সময় তাঁ'তে দিবে।

শ্রীম (স্বগত) — Selling the soul for a mess of pottage — পেটের জন্য আত্মবিক্রয়, ভগবানকে বিসর্জন। ছি, ছি!

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — কি দরকার সোনা-দানার? সোনা দাও, দানা দাও — দায় পড়েছে। সোনার জানালা হবে ঘরের (মুচকি হাস্য)!

(সহাস্যে) একজন বলেছিল, তার ছেলে হয়েছে। এর অনেক ঐশ্বর্য হবে, বাড়ি ঘর হবে, তাতে সোনার জানালা হবে (হাস্য)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুরের সব উপদেশ practical (ব্যবহারানুকূল)। কিসে ভক্তদের অবসর হয় সর্বদা সেই ভাবনা, আর উপদেশও সেই জন্য। অবসর না হলে তাঁর চিন্তা হবে কি করে? তারজন্যই সংসারে জড়িয়ে না পড়ে সর্বদা সেই লক্ষ্য রাখতেন। নরেন্দ্রকেও সেই জন্য ডাল ভাতের কথা বললেন। এর বেশি নয়।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও এ সব। কখন সাধুসঙ্গ হবে, মঠে যাওয়া হবে, সব সময় যদি ঐ ভাবতে হয়, তিনি এত সব মঠ আশ্রম করলেন কেন? এ বাংলা দেশে এ সব ছিল না — ছিল যত নেড়া-নেড়ীর দল। যত নেড়া তত নেড়ী — যেখানে নেড়া সেখানে নেড়ী, আর তাদের আড্ডা-আখড়াগুলি ছিল। তাই তো ঠাকুর অত সব মঠ আশ্রম করলেন! (একজন সাধুকে

দেখাইয়া) আর এই সব থাকেন ওখানে। এঁরা ঈশ্বর বই কিছুই চান না। তাঁরই জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন এঁরা! কি না ছিল এঁদের, বিদ্যা বুদ্ধি, ঐশ্বর্য — সবই ছিল! কিন্তু সব ছেড়েছেন ঈশ্বরের জন্য। কোথায় পাবে অমন সাধু! এঁরা কেবল স্বাতী নক্ষত্রের নির্মল জল খাবেন। অন্য জল ছোঁবেনও না। যায় যাক শরীর প্রাণ, তবুও অন্য জল খাবেন না। ফটিক-জল চাই — বৃষ্টির নির্মল জল। তা'তে আবার স্বাতী নক্ষত্রের জল। তখন আকাশ একেবারে নির্মল হয়। আহা, কেমন সব সাধু — চতুর্দশ ভুবন তুচ্ছ করেছেন এঁরা। কেবল ঈশ্বরের প্রেমরস চাই, আর কিছু না। যেমন চাতক কেবল ফটিক-জল খায়।

তিনি এ সব আয়োজন করলেন কেন? তার advantage (সুযোগ) নিতে হবে না! তিনি নিজে এসে এই সব সর্বত্যাগী সাধু তৈরি করে গেছেন জগতের কল্যাণের জন্য।

যখন লোক সংসারের দুঃখ কষ্টে অস্থির — রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যাদিতে অশেষ ভাবে নিপীড়িত হয়ে শান্তির পথ দেখতে পায় না, তখন তিনি আসেন God-man, অবতার হয়ে। তিনি এসে নূতন জগৎ তৈরি করেন — নূতন মানুষ, নূতন সমাজ। তা'তে আছে শান্তি, সুখ, সমাধি। এখন ঠাকুর এসেছেন শাশ্বত শান্তি-সুখের বন্যা নিয়ে। যত পার উপভোগ কর এই অতুল দিব্য সম্পদ।

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য — এই সকল God-men এসেছিলেন জগতের সঙ্কট সময়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন এই বর্তমান জড়বাদ থেকে লোককে ত্রাণ করতে। এই মহামানবগণ এসে message (আশার বাণী) দেন — এই দুঃখ দৈন্য থেকে পরিত্রাণের উপায় আছে। বলেন, ভগবানের শরণাগত হও — 'আমায় ধর'। আমি তোমাকে এই উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ দুঃখময় সংসার-সমুদ্র থেকে পরমানন্দ ধামে নিয়ে যাব। সেখানে চিরশান্তি, চিরসুখ বিদ্যমান — 'তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্' (গীতা ১৮/৬২)।

এই ক্ষণে ঠাকুর এসে বলেছেন, 'আমায় ধর', 'আমার ধ্যান কর'। আর প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে। যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান-ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য শান্তি সুখ সমাধি — এ সব আমার ঐশ্বর্য।'

তাঁদের সব কথাই humanity-র জন্য, উপলক্ষ হন অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গ ভক্তগণ।

দেখনা, ক্রাইস্ট এসেও এই মহাবাণীই প্রচার করেছেন। বলেছিলেন, 'Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light'(St. Mark 11:28-30). সংসারানলে বিদগ্ধ জনগণ আমার কথা শোন। আমি তোমাদিগকে সুখশান্তি প্রদান করবো।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বেশী কিছু করতে হবে না। সামান্য একটু কিছু করলেই হবে এই সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, মঠে যাওয়া।

২

শ্রীম অনতিদীর্ঘকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা প্রসঙ্গ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — 'Free will, free will' (স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চিন্তা) করে লোক — কোথায় free will (স্বাধীন চিন্তা)? তার সঙ্গে আবার একটা champion horse (শক্তিমান অশ্ব) জুতে দিয়েছে। পূর্বে ট্রাম দুটো ঘোড়াতেই টানতো। রাস্তার মোড়ে আর একটা additional (অতিরিক্ত) ঘোড়া জুতে দেওয়া হতো। মোড় পার হলে ঐ ঘোড়াটা খুলে নিত। ওটাকে চ্যাম্পিয়ন হর্স বলা হতো।

তেমনি মানুষ যখন নিজের বুদ্ধিতে আর সংসারে তাল রাখতে পারে না, তখন তাঁর সঙ্গে নিজেকে যোগ করে দেয়। তা' হলেই অনায়াসে turning (মোড়) পার হয়ে যেতে পারে। মানুষের জীবনে

কত cross road (মোড়) পার হতে হয়। তাঁর সঙ্গে যোগ হলে অনায়াসে সকল সঙ্কট পার হওয়া যায়। তাঁর সঙ্গে যোগ হওয়া মানে তাঁর মহাবাক্য, saving truths, পালন করা।

রান্না ভাত, সব তৈয়ার। বাবুরা একটু চেষ্টা করে খাবেন কেবল। তাতেও নারাজ। এমনি বিকার!

অবতার এসে মানুষের সব problems solve (সমস্যার সমাধান) করে গেছেন। একটা problem-ও (সমস্যাও) বাকী নাই যা solved (সমাধান করা) হয় নাই। সোজা পথ। তাঁকে (ঠাকুরকে) ধরলেই একেবারে goal-এ (গন্তব্যস্থানে) পৌঁছে যাবে। তাই ঠাকুর বলেছেন, 'আমায় ধর'।

এইভাবে ঠাকুর Problem of Liberty solve (জীবের স্বতন্ত্রতার অভাব রূপ সমস্যার সমাধান) করে গেছেন। Liberty-কেই (জীবের স্বতন্ত্রতাকেই) বুঝি free will (স্বাধীন ইচ্ছা) বলা হয়। এই অহঙ্কারটাই যত গোলমাল বাধায়, নীচে নামিয়ে দেয়। এটাকে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ করে দিলে আর ভয় নাই। তখন ঈশ্বরের বৃহৎ অহঙ্কারের সঙ্গে জীবের ক্ষুদ্র অহঙ্কারটা মিশে যায়। যেমন জংলী গোলাপ ভাল জাতীয় গোলাপের সঙ্গে যুক্ত ক'রে গ্রাফট্ বা কলম করা হয়। তখন আর জংলী গোলাপ থাকে না, ভাল গোলাপ হয়ে যায়!

অহঙ্কারটা যাবার নয়। জীবের অহঙ্কার যায় না, ঠাকুর বলতেন, হাজার চেষ্টা করলেও। এটাকে ভগবানের সঙ্গে যোগ করা — 'দাস আমি', 'সন্তান আমি' হয়ে থাকা। যেমন faithful (বিশ্বস্ত) কর্মচারী মনিবের কাজ করছে। লাভ হল তাতেও হর্ষ নাই, লোকসান্ তাতেও বিমর্ষ নাই। লাভও মনিবের লোকসানও মনিবের। সে কেবল কাজ করে যাবে। মনিব সন্তুষ্ট হয়ে যা দিবে তাতেই সে খুশি।

এই করে problem of necessity-ও (প্রয়োজনরূপ সমস্যাও) solve (সমাধান) করে গেছেন ঠাকুর। যারা মানুষ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যের দিকে — ভগবান লাভের দিকে নজর দিবে, যারা শাশ্বত সুখ-শান্তি চাইবে, তাদের জন্য ব্যবস্থা করে গেছেন। বলেছেন, নেহাৎ

যা না হলে নয়, দেহ রক্ষা হয় না, কেবল তাই নেবে। যত বেশী নেবে তত বেশী গোলমালে পড়তে হবে। তাতেই নষ্ট হয় চিত্তের শান্তি সুখ।

তাই নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করে জগদম্বা, ঠাকুরের মুখ দিয়ে, humanity-কে (জীবগণকে) বললেন, 'ডাল ভাত হলেই হলো, এর বেশী নয়।' বাকী সময় ঈশ্বরের চিন্তা কর, তাঁর সেবা কর, সাধুসঙ্গ সাধুসেবা কর। তাঁর agent (ভৃত্য) হয়ে নিষ্কাম কর্ম কর — কোনও benefit (ভোগ) না নিয়ে।

শ্রীম আবার কি ভাবিতেছেন। সাধু ও ভক্তগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা জগৎ ভুলিয়া কথামৃত পানে মত্ত — ক্ষণকালের বিরামও অসহনীয়। তাই প্রয়োজন বুঝিয়া শ্রীম আবার কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন। এবার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন, কি করিয়া সংসারের শাস্ত্রীয় সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া গৃহাশ্রমী একজন সাধক, জীবনের অপরার্ধে ভগবানের শরণাগত হইয়া, সকল অভাব অশান্তি বিদূরিত করিয়া, পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বিধুবাবু কাশী থেকে পুত্র-পৌত্রাদিকে লিখেছিলেন, 'আমি এখান থেকে আশীর্বাদ করছি তোমাদের সকলের মঙ্গল হউক।'

উনি আমাদের পাড়ার লোক। অনেকগুলি ছেলেকে মানুষ করে কাশীবাস করেছিলেন। একটি ছেলে ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তার মেয়ের বিয়ে। ছেলে লিখেছিল — 'বাবা বিয়েতে আপনাকে আসতেই হবে।' উনি এলেন না। ঐ আশীর্বাদ জানালেন।

তাঁর তখন বয়স পঞ্চান্ন হবে। Manhood (প্রৌঢ়)। আমাদের তখন কম বয়স। আমরা এই কথা শুনে তখন মনে করেছিলাম লোকটি বড়ই নিষ্ঠুর। এখন দেখছি তা নয়, পাকা লোক। সাধুসঙ্গ করেছেন কি না! ভেবেছেন, ওদের কাজ ওরাই করে নেবে — আমি কেন মিছিমিছি যাই interfere (বাধা প্রদান) করতে! যদি গিয়ে বলতেন, সামান্য ভাবে করে ফেল, অত শতর দরকরা কি, অমনি

objection (আপত্তি) হবে। তাই লিখেছেন, তোমরা যেমন ভাল বোঝ তেমনি করে ফেল।

আহা, সাধুসঙ্গ করেছেন কি না, তাই অত জ্ঞান! এঁরাই হলেন যথার্থ মানুষ! বাজনার বোল হাতে এনেছেন এঁরা।

শ্রীম আবার কি ভাবিতেছেন আর মুচকি হাসিতেছেন। ধীরে ধীরে গভীর হাস্যরসের অবতারণা করিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি, লক্ষ্য শুকলাল) — আমদের এই স্কুল-বাড়িতে একটা বিয়ে হয়েছিল নিচে (চোখে মুখে হাস্য)। পূর্ববঙ্গের লোক সব। গিন্নী বললেন, এ কাপড়ে হবে না। কর্তা সারাদিন খেটে হয়রান — রেগে উত্তর করলে, (শ্রীম পূর্ববঙ্গের ভাষা ও স্বরের অনুকরণ করিয়া বলিতেছেন) কি হারামজাদি। তোকে জুতাইমু; পারবো না আমি আর কিছু দিতে (সকলের উচ্চহাস্য)। (হাস্যরসে আপ্লুত হইয়া) তারপর পাঁচজন মধ্যস্থ হয়ে কর্তাকে শান্ত করে। 'জুতাইমু হারামজাদি' (শ্রীম-র পেট ফাটা হাস্য)!

একজন ভক্ত (স্বগত) — বাবা এ যেন বহুরূপী — এই অত গম্ভীর ঈশ্বর তত্ত্বের ব্যাখ্যা এনার, এই বালকের মত রঙ্গরস! পাকা শিক্ষক বটে! অত উঁচুতে শ্রোতাগণ মন রাখতে পারছেন না ভেবে এই রঙ্গরসের অবতারণা করলেন।

হাসি থামিল, ঝড়ের পর যেন প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিল। পুনরায় স্বভাব-গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া শ্রীম কথামৃত বিতরণ করিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — আর একটি বুড়োকে দেখেছিলাম। তিনিও কাশীবাসী — সঙ্গে বিধবা কন্যা। আমাদের বয়স তখন সতের। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার ঠিক দশ বছর আগে। আমরা তখন গাজীপুর গিছলাম এক বন্ধুর সঙ্গে। কাশী কাছে জেনে বন্ধুকে বললাম, চল কাশী দেখে আসা যাক্, এতো কাছে যখন এলাম। একদিন বের হওয়া গেল। পৌঁছুতে হয়ে গেল বেলা দু'টো। কাশীতে আছেন বন্ধুর দাদামশায় (ঠাকুরদাদা) আর বিধবা পিসিমা। বৃদ্ধের

বয়স আশি। আমাদের দেখে খুবই আহ্লাদ প্রকাশ করলেন। রান্নাবান্না হলো আবার। আমাদের কত আদর যত্ন করে খাওয়ালেন। যখন সব শেষ হলো আর আমরাও সুস্থ হয়েছি তখন বলছেন, 'দেখ্ হরে, বাড়িতে বলে দিবি, আমাকে যেন আর কোনও চিঠিপত্র না দেয়। আমি এতকাল সব করেছি — সব জোগাড় করে রেখে এসেছি। এখন আবার আমাকে কেন জ্বালাতন — এর এ হয়েছে ওর ও হয়েছে! খবরদার, বলবি আমাকে আর চিঠি না দেয়।'

(সহাস্যে) শুনেই তো আমরা একেবারে অবাক্! কত যত্ন, কত আদর, তারপরই এই উগ্র মূর্তি! এরপরই পলায়ন। এখন বুঝেছি, এঁরাই আদর্শ পুরুষ।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — But seek ye first the Kingdom of God and his righteousness! (St. Matthew 6:33) আগে ভগবান, আগে ধর্ম, তারপর অন্য সব।

স্বামী রাঘবানন্দ (শ্রীম-র প্রতি) — ঐ দেখুন, স্বাতী নক্ষত্র উঠেছে আকাশে।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — ঐ দেখ স্বাতী নক্ষত্র, উনি দেখাচ্ছেন। আর আমাদের মুখ দিয়ে তিনি (ঈশ্বর) এই সব কথা কইছেন।

শ্রীম (স্বগত) — 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'
(গীতা ৯/১৮)

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — আমরা সুহৃৎ তাই আমাদের মুখে দিয়ে বলালেন। তিনিই সব কারণ। আমি ও উনি, সবই তিনি। তিনিই আমার মুখ দিয়ে তোমাকে এই সব কথা বলালেন। আবার তিনিই এঁর ভিতর দিয়ে স্বাতী নক্ষত্র দেখালেন। ছেড়ে দাও old clinging to superstition (জন্মগত কুসংস্কার)।

তিনি আর আমি আলাদা নয়, সবই তিনি। আরম্ভ করতে হয় দু'টিতে — তুমি এক, আমি এক। তারপর একটি — সব তিনি।

(স্বগত) The old superstition (পুরাতন সংস্কার)!

'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা'। তুমিই সব। তুমিই আবার 'পরাপরাণাং

পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী’। তুমি সকলের বীজ, তুমিই প্রধান, তুমিই পরমেশ্বরী।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — আবার আছে ঃ

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্।। (গীতা ৯/১৬)।

আরও আছে, ‘পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।’
(গীতা ৯/১৭)।

দেখুন, তিনিই সব। হোম, ঘি, আবার যা দিয়ে (ঢালার অভিনয় করিয়া) অমন করে (অর্পণ) তাও তিনি।

ঠাকুর বললেন কেন, রামের ইচ্ছায়ই সব হয়? গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না তাঁর ইচ্ছা ছাড়া। তাঁতী তাঁর ইচ্ছায় জেলে গেল আবার তাঁর ইচ্ছায় মুক্ত হল। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাই তো ঠাকুর বলতেন, আমি কি বিচার করবো? দেখছি, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন, আবার তিনিই সব করছেন, করাচ্ছেন।

৩

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — গানে আছে, ‘ভেঙ্গে বালির বাঁধ পুরাবো মনের সাধ।’ বালির বাঁধ মানে সংসার বন্ধন।

ভেঙ্গে ফেল এই old superstition (প্রাচীন সংস্কার)। তুমি মনে করছো বড় শক্ত কাজ। মোটেই তা নয়। দেখতেই দেখায় একটা প্রকাণ্ড কাজ। এটা যে বালির বাঁধ! এক ধাক্কায় ভেঙ্গে ফেল।

একজন সাধু (স্বগত) — অহো, কি অদ্ভুত শক্তি এঁদের! দেখ, এই যুবকের মনটাকে কি করে টেনে উপরে তুলে দিলেন — সব বাঁধ ভেঙ্গে! অবতারের শক্তি। আমাদের মনকেও এই করে উপরে উঠিয়ে দিয়েছেন সব বাঁধ ভেঙ্গে! ধন্য আমরা!

শ্রীম (সকলের প্রতি) — যে ঘরে বিকারের রোগী সেই ঘরেই জলের জালা, আচারের তেঁতুল!

শ্রীম (উত্তেজিতভাবে যুবকের প্রতি) — ভেঙ্গে ফেল এই বালির

বাঁধ! উঠ উপরে উঠ, অমৃতের অধিকারী হও!

Last though not least — সময় গত, ওঠ জাগ অমৃতের অধিকারী!

ভগবান এসেছেন দ্বারে — মানুষ হয়ে ঘরে ঘরে ফিরছেন। হাতে অমৃত ভাণ্ড। নাও সকলে নাও যত পার — বিনামূল্যে বিতরণ হচ্ছে। খেয়ে অমর হয়ে যাও!

এটা বালির বাঁধ, this old superstition — এই সংসার বন্ধন! এটা ভাঙ্গলেই অমর।

এ যৌবন বৃথা যাবে তাঁর সেবায় না লেগে!

দেহ ধারণের জন্য ডাল ভাত হলেই হল। এর জোগাড় করে বাকী সময় কেবল তাঁর চিন্তা, তাঁর সেবা।

'এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে — হরে মুরারে হরে মুরারে।' কি সুন্দর গান।

ডাকছেন তিনি — ওঠ, মোহ নিদ্রা ভেঙ্গে ফেল। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' হয়ে যাও, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, রাজ রাজেশ্বরের ব্যাটা!

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন — কি ভাবিতেছেন। তারপর আবার কথা চলিল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এখন সুবিধা কত মঠে যাওয়ার! আমরা যখন যেতাম তখন না ছিল বাস, না ছিল স্টীমার। হেঁটে হেঁটে যাওয়া। আবার (নৌকা ভীতির জন্য) নৌকায় উঠবার যো নেই (হাস্য)। এখন যদি যৌবন থাকতো, দেখাতাম কি করে করতে হয় সাধুসঙ্গ, সাধুদর্শন!

একদিনের একটি scene (দৃশ্য) বেশ মনে পড়ে। হেঁটে হেঁটে (আলমবাজার) মঠে যাচ্ছি। এক হাতে সন্দেশ আর ফুল। রাস্তায় এক স্থানে এগুলি হাত থেকে নামিয়ে বিশ্রাম করলাম।

আর একদিন গেছি দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর ছোট খাটটিতে শোয়া। গ্রীষ্মকাল — একেবারে গলদঘর্ম। মণি মল্লিক মেঝেতে বসা। ঠাকুর

তাঁকে বলছেন, তাইতো বলি এই সব ইংলিশম্যানরা যেকালে আসছে, এর (ঠাকুরের) ভিতর কিছু আছে (হাস্য)। কত করে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — যেভাবে (অজ্ঞানে, মোহে) beginning (জন্ম আরম্ভ) end-ও (মৃত্যুও) সেই ভাবেই হবে।

‘আলিবাবা’তে আছে, একজন প্রার্থনা করছে — আমায় যদি কিছু দিবে, তবে তিনটে বাঁদী দাও। আমি যখন জল আনবো — ভিস্তি কিনা, তখন ওরা আমায় হাওয়া করবে (হাস্য)। জানে না, যখন বাঁদী হবে তখন আর জল তুলতে হবে না।

শ্রীম (আনমনা ভাবে শুকলালের প্রতি) — ছেলেপুলে কতদিন দেখা? যতদিন না লায়েক হয়েছে। যেই লায়েক হলো অমনি ছেড়ে দাও (রোজগার) করে খাক।

একজন ভক্ত বসে আছে বিমর্ষভাবে। দেখে মা ঠাকরুণ জিজ্ঞেস করলেন, এমনভাবে রয়েছো কেন? ভক্ত বললে, ছেলেদের কর্ম হয় নাই, বড় পরিবার, সংসারে কষ্ট। শুনে মা তীব্রস্বরে বললেন, কেন কুলিগিরি করুক না? তারাও রোজগার করে খায়! এদিকে তো করুণার সাগর! কিন্তু কর্তব্যের সময় ভীষণা!

স্বামী রাঘবানন্দ — দু’জন ভদ্রলোক রিকসা টানছে — মডার্ণ রিভিউতে লিখেছে।

শ্রীম — বেশ, খুব ভাল, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ডাকে যদি, আরো ভাল। ঈশ্বরকে না ডাকলে কিছুই নয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুরের উপদেশ সব প্র্যাকটিকেল (বাস্তব)। কিসে ভক্তদের অবসর হয় ঈশ্বরচিন্তা করবার, সর্বদা সেই কথা ভাবতেন। আর ঐরূপ উপদেশ দিতেন। এক একজনের ‘কেস্’ এক এক রকম। আর দৃষ্টান্ত দিতেন এই সব, বলতেন, দেখ mother-bird-এর (পক্ষীমাতার) কত চিন্তা বাচ্চারা যখন ছোট, নিজের ভার যখন নিজে নিতে পারছে না। যেই বড় হল, কাছে গেলেই অমনি মারছে ঠোক্কর। প্রথম কত চিন্তা কত যত্ন করে এনে খাবার মুখে

দিচ্ছে। যেই চরে খেতে শিখলো, অমনি আর কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — Infinite Potentialities (অনন্ত শক্তি) রয়েছে ভিতরে। আর misuse (নষ্ট) করো না।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একজন বলেছিল, মশায় এ সব (পাখী ও বাচ্চার) কথা জানি। অমনি ঠাকুর এক ধমক দিলেন। বললেন, শুধু শুনলে কি হবে — কিম্বা পড়লে! ধারণা করতে হয়। যেমন বাজনার বোল মুখস্থ আছে, কিন্তু হাতে আনতে পারছে না। তা'তে কি লাভ হবে? হাতে আনলে তখন আনন্দ!

একজন ভক্ত (স্বগত) — সংসারাসক্তি থেকে মনকে উঠিয়ে ঈশ্বরে নিবিষ্ট করার কি অদ্ভুত কৌশল এই দৈবী আচার্যদের! প্রথমে যুক্তিবিদ্ধ করেন সংশয়াপন্ন নিম্ন মনটিকে। তারপর দু' আঙ্গুলে ধরে উঠিয়ে দেন উপরে, আদর্শে — ঈশ্বরে। প্রথমে আঘাত, তারপর সঞ্জীবনী প্রলেপ!

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — তাঁর কথা আগাগোড়া সন্ন্যাসের। কতকগুলির এই জন্মেই হবে। কতকগুলির পরজন্মে হবে। নয়তো কয় জন্ম পরে হবে। সকলের ভিতরই একই বীজ ঢুকিয়ে গেছেন, সন্ন্যাসের।

যেমন কলার ভিতর কুইনাইন। তার কাজ হবেই হবে। যারা (গৃহস্থরা) সোজা শুনলে ভয় পায়, তাদের বলেছেন একটু ঘুরিয়ে। কতকগুলিকে direct স্পষ্ট করে বলেছেন খোলাখুলিভাবে।

ঠাকুর ডারউইনকে (Darwin) মানতেন এটা আমরা জানতাম না। এখন দেখছি তিনি ডারউইনের evolution (ক্রমবিকাশ) মানতেন।

অমোঘ বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তার কাজ একদিন হবেই হবে।

খানিকক্ষণ নীরব। আবার কথামৃত বর্ষণ। এবার প্রদীপ্ত পুরুষকারের পর অহৈতুকী কৃপার কথা উঠিল।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কৃপাসিদ্ধ, স্বপ্নসিদ্ধ, হঠাৎসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ। আরো আছে, নিত্যসিদ্ধ, যেমন নরেন্দ্র, সিদ্ধের সিদ্ধ,

যেমন ঠাকুর।

সাধনসিদ্ধই বেশী, এটাই হলো রাজপথ। তপস্যা করা, ব্যাকুল হয়ে সাধন করা, কাঁদা, চেষ্টা, প্রার্থনা এই সব করে করে তাঁর দর্শন লাভ করা।

হঠাৎসিদ্ধ যে, সে এ জন্মে কিছুই করে নাই, কিন্তু হঠাৎ তাঁর দর্শন লাভ হয়ে গেল!

স্বপ্নেও কেউ কেউ তাঁর দর্শন লাভ করেছে! জাগ্রতাবস্থায় দর্শন লাভ হয় নাই।

কৃপাসিদ্ধ, এর কথা অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে। রাম লক্ষ্মণ নদী পার হবেন, খেয়াতে। মাঝি বললো, ঠাকুর তোমরা নৌকোতে বসো, কিন্তু পা ঝুলিয়ে রাখ বাইরে, নৌকোতে লাগিও না। তোমাদের পা ছুঁয়ে আমার কাঠের নৌকো সোনা হয়ে গেলে, আমার ছেলেপুলে না খেয়ে মরবে। নৌকোতে নদী পার করে রোজগার করি। সোনা হয়ে গেলে আর তা দিয়ে এ কাজ হবে না। আর একবার তোমাদের মত দুজনকে পার করতে গিয়ে নৌকো সোনা হয়ে গিছলো। তাতে বড়ই বিপদে পড়েছিলাম (হাস্য)।

এটর্নি বীরেন বসু কিছুক্ষণ আসিয়া বসিয়া আছেন শ্রীম-র ডানহাতের বেঞ্চেতে। সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত। মৃতসঞ্জীবনীরূপ কথামৃত বর্ষণে মন একাগ্র হওয়ায় বিঘ্নমূর্তি তন্দ্রাদেবী আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল। তাঁহার পাশে বসা অমৃত। তাঁহার দশাও তদ্রূপ! আচার্য শ্রীম-র দৃষ্টি সর্বত্র। তিনি কথারূপী অমৃতবাণে বীরেনকে তন্দ্রা-কুম্ভীরের কবল হইতে বিমুক্ত করিতেছেন।

শ্রীম (বীরেনের প্রতি) — শুনছেন বীরেনবাবু, আমাদের একটি ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিলেন, ঈশান মুখুয্যের ছেলে শ্রীশ মুখুয্যে। ঈশান মুখুয্যে একদিন ঠাকুরকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে গেছি। আমি শ্রীশকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলাম। অমন শান্ত লোক আর দেখা যায় না। ঠাকুর দেখে বললেন, কি আশ্চর্য, এমন শান্ত লোক কি করে উকিল হল! তখন সে আলীপুরে ওকালতি

করতো। ওমা, এর ক'মাস পরেই মুন্সেফ হয়ে গেল। তাঁর দৃষ্টি পড়েছে কিনা, ভগবানের কৃপা হয়েছে, তাই আর ওকালতি করতে হল না। শেষে জেলা জজ্ হয়েছিল। সেদিন শরীর গেল। দু'ভাই ছিল — শ্রীশ সেকেণ্ড।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ইনি যখন এটর্নির কাজ আরম্ভ করেন, তার কিছুদিন পরই জাস্টিস্ রেঙ্কিনের কাছে apply (দরখাস্ত) করেছিলেন রেজিস্ট্রারের কর্মের জন্য। রেঙ্কিন বললেন, তুমি তো বেশ কাজ করছো। ওটাই কর। ইনি উত্তর করলেন, না এ কাজ আমার ভাল লাগে না। রেঙ্কিন জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? ইনি বললেন, এ কাজে suggestio Falsi আর Suppretio Verai — অসত্য কথন আর সত্য গোপন রয়েছে। রেঙ্কিন শুনে মুচকি হাসলেন। উনি জানেন, এই ব্যক্তি আনকোরা উকিল, টাকা পেলে এ সব নীতিজ্ঞান ভুলে যাবে, তাই হেসেছেন। উনি এঁর কথা বেশ appreciate (উপলব্ধি) করেছিলেন।

তা ইনি বলবেন না এ কথা? তিনি যে ঠাকুরকে চিন্তা করছেন। কি বলেন বীরেনবাবু — 'সাজেস্সিও ফলসাই' আর 'সাপ্রেসিও ভেরাই' (বীরেনের সলজ্জ হাস্য)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — উকিলরা, এটর্নিরা টাকা হাতে পেলে আর ছাড়তে চায় না! নানা রকম ফন্দি করে দেখবে ওটা রাখতে পারে কিনা। Client-এর (মক্কেলের) টাকা ছাড়তে চায় না। সেদিন কে একজনের দু'বছর জেল হয়ে গেল। (বীরেনের প্রতি) কি নাম তাঁর?

অমৃত — ধীরেন গুপ্ত।

শ্রীম — কি?

বীরেন — ধীরেন গুপ্ত।

শ্রীম — মুস্কিল। Client-এর (মক্কেলের) টাকা ছাড়তে চায় না। এমনি টান্। তাই তো ঠাকুর উকিলদের সেবা গ্রহণ করতে পারতেন না। মিথ্যা কথা কয়ে উপার্জন করে বলে। আর ডাক্তাররা

উপার্জন করে লোককে কষ্ট দিয়ে। তাই তাদের সেবাও নিতেন না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, টাকার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার হয় যদি ভগবানের সেবায় লাগে — সাধু ভক্তের সেবায় লাগে। আর সদুপায়ে উপার্জন হয় যদি।

বলতেন, টাকা সদুপায়ে উপার্জন করা উচিত, ন্যায্যভাবে। কি হবে টাকা জমিয়ে এর সদ্ব্যবহার না জানলে? ঠাকুর বলতেন, বানরের চুল হলেও বাঁধতে জানে না। মানে বুদ্ধিহীন, তাই ব্যবহার জানে না। তাই ক্রাইস্ট বলতেন, 'But lay up for yourselves treasures in heaven' — পরকালের জন্য ধন সঞ্চয় কর, আর এখানে থাকে তো দেবসেবা, সাধুসেবা, দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় লাগিয়ে দাও।

স্বামী রাঘবানন্দ কি অবান্তর প্রসঙ্গ উঠাইতে চেষ্টা করিলে, শ্রীম বাধা দিয়া কথাপ্রবাহ অব্যাহত রাখিয়া বলিলেন, ঠাকুরের সব কথাই humanity-র (মানবের) শিক্ষার জন্য — বলেছেন কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে। তিনি বলেছিলেন কিনা, এখানকার সব কিছুই তোমাদের শিক্ষার জন্য মা করাচ্ছেন।

(যুবকের প্রতি) — রাত হয়ে গেল। তুমি তা'হলে ওঠ, যেতে হবে দূরে। প্রণাম করিয়া যুবক বিদায় হইল।

বেলুড় মঠ।
৩১শে মে, ১৯৩১ খ্রীঃ, রবিবার।

ষড়বিংশ অধ্যায়

বজ্রকঠোর কুসুমকোমল সাধুর হৃদয়

মর্টন স্কুল। সেই চারতলার ছাদ। রাত্রি প্রায় নয়টা। শ্রীম সাধু-ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। আর অকাতরে কথামৃত পরিবেশন করিতেছেন সন্তাপিত জনগণকে। পুরীতে আজ জগন্নাথের স্নানযাত্রা।

আজ পূর্ণিমা। আকাশের চাঁদের কিরণ শ্রীম-র মুখমণ্ডলে পতিত হওয়ায় শ্রীম-র স্বাভাবিক ব্রহ্মোজ্জ্বল বদনমণ্ডলে এক অপার্থিব আকর্ষণ ও সৌন্দর্য প্রকটিত। একজন ভক্ত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন অনিমেষ নয়নে। ভাবিতেছেন, সংসারে যথার্থ সুখী এই মহাপুরুষগণ, যাঁহারা নিয়ত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, আর অপরকেও অকাতরে ঐ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিতে সহায়তা করেন।

শ্রীম কিছুকাল ধরিয়া চন্দ্রমা দর্শন করিতেছেন। একটি ভক্ত ললিতবাবুর ছেলেকে বলিতেছেন, একটু সরে বস। ছেলে সরলো না দেখে শ্রীম বলিতেছেন, হাঁ, সর না একটু, ইনি বলছেন যেকালে।

কালেজে দেখতে পেতাম একজন বলছে সরতে। সে সরবে না। ট্রামগাড়ীতে সরতে বললে সরে না। কিন্তু এক একজন দাঁড়িয়ে ওঠে, বলে, বসুন আপনি। আমি এই এমনি চলে যাব। কি সুন্দর ভাবটি! রেলেতেও দেখা যায় কেউ কেউ লোকজন এলে নিজের জায়গা ছেড়ে দেয়। বলে, আপনি বসুন। আমি যাব কাশী বৃন্দাবন; এর পর শুয়ে যাব। আপনি তো এই টুকুন যাবেন, তা ভাল করে যান। আহা, কি মধুর কথা, প্রাণ শীতল হয়ে যায়।

হিমাংশু ঠাকুরবাড়ি হইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে কেষ্ট। শ্রীম হিমাংশুকে জিজ্ঞসা করিলেন, আরতি হয়ে গেল? কয়টি ছোকরা

গিছলো? তারা বসেছিল? প্রসাদ পেয়েছিল? রামনাম হয়েছিল? শ্রীম-র সকল প্রশ্নের উত্তরেই হিমাংশু বলিতে লাগিলেন আজ্ঞে, হাঁ।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আজকাল ঠাকুরবাড়িতে মঠের মত সম্পূর্ণ আরতি, স্তব ও দেবীর প্রণাম হয়। তারপর হয় সম্পূর্ণ রামনাম কীর্তন।

(হিমাংশুর প্রতি) — মুখস্থ বলতে পার — 'ভয়হর মঙ্গল —?

হিমাংশু কোনও রকমে বলিলেন। শ্রীমও সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন।

শ্রীম নিজে নিজে গাহিতেছেন, 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। পতিত পাবন সীতা রাম'।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — 'পতিত পাবন' রাম মানে, যাদের দেখবার কেউ নাই, রাম দেখেন তাদের। 'রাম' মানে, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত সেই সত্য বস্তু — বেদে যাঁকে পরব্রহ্ম বলেছেন ঋষিরা, তিনি। এটি একটি মহাসত্য। মানুষ যদি এ মহাবাক্যটি স্মরণ রাখে, তা হলে আর তার ভয় নাই। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছাড়া স্মরণ রাখার উপায় নেই। তাঁর মহামায়াতে সব ভুলিয়ে দেন। ঠাকুর তাই humanity-কে (মনুষ্যজাতিকে) শিখিয়েছিলেন — প্রার্থনা কর সর্বদা, 'মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' তাঁর কৃপায় যদি কেউ তাঁকে স্মরণ রাখতে পারে, তা হলে সে এই উত্তাল তরঙ্গময় সংসার-সমুদ্রে 'লাইফ-বেল্ট' পেল। তখন তার আর ভয় নাই। সে ডুববে না। শুধু তাই নয়, সে অপরকে আবার ভরসা দিয়ে বাঁচাবে। কারণ — 'ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি' (চণ্ডী - দেবীমাহাত্ম ১১/২৯) — দেবগণ দেবীকে বলছেন, মা তোমাকে যাঁরা আশ্রয় করেন, তাঁরা জগতের আশ্রয়।

'সব লাল হো জায়েগা ' — রণজিৎ সিং বলেছিলেন, ভারতের ম্যাপে একটি লাল patch (প্রলেপ চিহ্ন) দেখে। এর মানে, সমগ্র ভারত ব্রিটিশের অধীন হয়ে যাবে। ম্যাপে সব লাল রং ব্রিটিশ রাজ্যের চিহ্ন।

তেমনি রামনামে, ভগবানের নামে সব দুঃখ দূর হয়ে যায়।

সকলে শান্তি লাভ করে। অশান্ত মানুষ প্রশান্ত হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ভগবান মানুষ হয়ে বলেছিলেন, Before Abraham was I am (St. John 8:58) — সৃষ্টির পূর্ব থেকে আমি রয়েছি। আমি অনাদি অনন্ত, আমিই সত্য স্বরূপ — 'সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ' (ছান্দোগ্য ৬/২/১), আর বলেছিলেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ' (গীতা ১৮/৬৬)। তার প্র্যাক্‌টিকেল সাধনও বলেছেন, 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ' (গীতা ৮/৭)। সর্ব কালে সর্ব কাজে, আমায় স্মরণ করার অভ্যাস করলে বেঁচে যাবে। কেন? তা'হলে 'নিবসিষ্যসি ময্যেব' (গীতা ১২/৮) — আমাতেই নিবাস করবে — আদর্শ ভুল হবে না। আদর্শ কি? মানুষকে দেবতা হতে হবে। উপায়, আমায় চিন্তা করা। যেমন কুমুরে পোকা হয়ে যায় আরশোলা, ওটাকে ভেবে ভেবে, তেমনি ভগবান-চিন্তা করতে করতে মানুষই ভগবান হয়ে যায় — 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুন্ডক ৩/২/৯)। অর্জুনের ক্ষত্রিয় প্রকৃতি। যুদ্ধ অর্থাৎ কর্ম তাঁকে করতেই হবে। ঈশ্বরের দাস হয়ে, শরণাগত হয়ে কর্ম করলেই চিত্ত শুদ্ধ হয়ে মুক্তি লাভ হবে — ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হবে। তিনিই কর্তা, মানুষ অকর্তা, এ মহাসত্য ভুলে যায় মানুষ, সর্বদা শাস্ত্র ও গুরুবচন চিন্তা না করলে। গুরুবাক্য স্মরণ রাখার নামই তপস্যা। অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে জগৎকে এই সহজ পথ বলে দিয়েছেন।

ঠাকুরও বললেন, 'আমার ধ্যান কর, — তা'হলে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।' জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, এ সব তাঁর ঐশ্বর্য। এ যদি লাভ হল, তা'হলে আর কি করে ভ্রান্ত হবে?

যুগে যুগে ঈশ্বর মানুষ-শরীর নিয়ে এসে দেখিয়ে যান সহজ পথ — যাতে সকল কাজের ভিতর থেকেও ভগবানকে ধরে থাকতে পারে। তাঁর কৃপা হলেই মানুষ এই সব কথার মত আচরণ করতে পারে।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — সাধুরা তাই বাইরে অত কঠোর। ঢিলে হলে ধর্ম-জীবন যাপন করা কঠিন। তাঁরা 'বুলডগের' মত

কামড়ে ধরেন আদর্শকে। মরে যাবে তবুও আদর্শ ছাড়বে না।

স্বামী রাঘবানন্দ — বিজ্ঞান-স্বামীর মা বলেছিলেন, ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) বুঝি গিছলে? ঐ সাধু আমার ছেলেটার মাথা গরম করে দিয়েছে। মা চান, ছেলে সংসার করুক। ছেলে মা'র কথা শুনছে না।

শ্রীম — ওঁর মা বুঝি একবার এলাহাবাদে গিছলেন। ওঁর আশ্রমেই গিয়ে উঠেছিলেন। কয়েক দিন আছেন বেশ আনন্দে। একদিন তিনি বললেন, 'কবে যাচ্ছ মা?' মা তো শুনে অবাক্। উত্তর করলেন, 'বাবা আরও দিন কয়েক আমায় থাকতেই দাও না?'

সাধু এমনি বজ্রের মত কঠোর, আবার কুসুমের চাইতেও কোমল — 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমানীব।' Principle-এর (নীতির) কাছে একেবারে নির্মম। এমনি গোঁ না থাকলে ধর্ম হয় না। মহামায়া সর্বদা নাড়াচাড়া দেন। দেখেন, পাকা হয়েছে কিনা। স্নেহ মহাশত্রু ধর্মজীবনের।

স — কখনও শ্রীম-র কাছে থাকে কখনও বাড়ি যায়। এখন বাড়িতে আছে কয়েক দিন।

শ্রীম — স — কোথায়? বাড়িতেই রয়েছে?

স্বামী রাঘবানন্দ — ওর মায়ের অসুখ। মাঝে মাঝে 'ফিট্' হয়। বড় ভাই মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে, তখন স — মায়ের পক্ষ নেয়।

শ্রীম — বড় ভাই বিয়ে করেছে?

স্বামী রাঘবানন্দ — আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীম (সহাস্যে) — স — থাকলে মায়ের পার্টি strong (শক্তিশালী) হয়।

স্বামী রাঘবানন্দ — বড় ভাই প্রায়ই তাকে ঠাট্টা করে বলে — 'আমরা বিষয়ী লোক, তুমি কি ক'রে খাবে আমাদের অন্ন'?

শ্রীম — ও বুঝি ওদের এ সব কথা বলে জ্যাঠামী করে? তাই ওঁরা ঐরূপ বলেন।

(মুচ্‌কি হাস্যে) আচ্ছা, ও লম্বাচুল রেখেছে কেন মেয়েদের মত

— এতো ধর্মধ্বজা!

(সহাস্যে) আমার চাদর ছিল না। তখন কয়েক দিন নামাবলী গায়ে দিলাম। ভক্তদের বলেছিলাম স — যেকালে লম্বা চুল রেখেছে ধর্মধ্বজা, আমিও নামাবলী গায়ে দিব ধর্মধ্বজা (হাস্য)। বালানন্দের ওখানে ছিল দিনকতক, ওরা চুল রাখে। ওখান থেকেই শিখেছে ওটা।

একজন ভক্ত — স — বলে, সংসারীদের থেকে আলাদা করবার চিহ্নস্বরূপ এই লম্বাচুল।

একজন সাধু — তা হলেই ধর্মধ্বজা।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন আর নিজে নিজে হাসিতেছেন। কিছুক্ষণ পর আবার রঙ্গরস পরিবেশন করিতেছেন।

শ্রীম (সহাস্যে) — পুরানোকে কেউ ভালবাসে না, কেউ চায় না। সবই নূতনের খদ্দের। আমরা সেদিন নববিধান চার্চে গিছলাম, একটা নূতন রিডিং রুম হয়েছে, সেটা দেখতে। একটা কাগজ দেখার ইচ্ছা হল। দেখি, ওটা আর একজন পড়ছে।

সকলেই current number (নূতন সংখ্যাটা) চায় — ব্যাক নাম্বার পুরানোটা চায় না। হয়তো ওতে more interesting (আরো আনন্দজনক) বিষয় রয়েছে, তবুও ওটা নেবে না (হাস্য)। লোকে গিয়ে বলে, ওটা কোথায় অর্থাৎ current issue (শেষের সংখ্যাটা)? ব্যাক নাম্বারটা সামনে পড়ে আছে, ওটা ছোঁবে না।

সংসারের এই নিয়ম, নূতন চায়। মহামায়ার এই ভেলকীর জন্যই জগৎ চলছে। এতে জগৎ বাড়ছেও। এই নিত্য নূতনের বাসনার জন্য লোক ছুটাছুটি করছে। এই বাসনাই ইন্ধন। এই সব লোক মনে করে ঈশ্বর ব্যাক নাম্বার। তা'তে রুচি হয় না। সামনে পড়ে থাকলে যেমন লোক নেয় না ব্যাক নাম্বার। বুদ্ধি উল্টিয়ে দেন মা। সত্যকে, ঈশ্বরকে মিথ্যা করে দেন — মিথ্যাকে, জগৎকে সত্যরূপে সামনে ধরেন। কিন্তু যারা তাঁর কৃপায় ঈশ্বরকে ধরে থাকে, তারা দেখতে পায় তিনি চির নবীন, অফুরন্ত রসসাগর। আবার চির পুরাতন, সকল কারণের কারণ।

শুকলাল বাড়ি যাইবেন বেলেঘাটায়, উঠিলেন। শ্রীম তাঁহাকে বলিলেন, এবার যাবেন বুঝি? এই চাঁদ দেখতে দেখতে যান। এই চাঁদ ঠাকুরকে দর্শন করেছেন, তাই আমাদের পরমাত্মীয়। আবার তিনিই এই চাঁদ হয়েছেন — 'নক্ষত্রাণামহং শশী।' (গীতা ১০/২১)

একজন সাধু — এখন ক'টা বেজেছে? জনৈক ভক্ত বলিলেন, ন'টা।

স্বামী রাঘবানন্দ (শ্রীম-র প্রতি) — ইনি এতরাত্রে মঠে যেতে চান।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাঁ, এঁকে একটু প্রসাদ দাও, জগবন্ধুকে — রাবড়িটা সবই এঁকে দিয়ে দাও।

শ্রীম নিজেই উঠিয়া অন্তেবাসীকে সঙ্গে লইয়া নিজের ঘরে গেলেন। রাবড়ি আর সন্দেশ নিজ হাতে খাইতে দিলেন। খাওয়া শেষ হইলে বলিতেছেন, এই চাঁদ দেখতে দেখতে মঠে যাও। গোপীরা কৃষ্ণ-দর্শনের পর এই চাঁদ দেখতে দেখতে যেতেন।

অন্তেবাসী ও শুকলাল আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া চলিতেছেন আর চাঁদ দেখিতেছেন। হ্যারিসন রোডের কাছে আসিলে, শুকলাল অন্তেবাসীকে রাত্রির আহারের মত মিষ্টান্নাদি জলযোগ করাইয়া, পাথেয় দিয়া ট্রামে তুলিয়া দিলেন। তিনি হাওড়া স্টেশনে বাসে চড়িয়া বেলুড় মঠে পৌঁছিলেন রাত্রি সোওয়া দশটায়। সাধুদের আহার শেষ হইয়াছে। 'জয় গুরুমহারাজকী জয়' — এই ধ্বনি শোনা যাইতেছে।

বেলুড় মঠ। সম্মুখে গঙ্গা। উত্তরে দক্ষিণেশ্বর। চাঁদের আলোতে গঙ্গার জল গলিত রূপার মত চক্ চক্ করিতেছে। সব নীরব। একটি সাধু গভীর রজনী পর্যন্ত একাকী ভাবিতেছেন — আজও শ্রীম বলিলেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তিনি দধি মন্থন করিয়া হাতে মাখন লইয়া ডাকিতেছেন — এই নাও অমৃত, খেয়ে অমর হয়ে যাও — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ।'

বেলুড় মঠ, ৩১শে মে, ১৯৩১ খ্রী।
রবিবার, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, ১৩৩৮ সাল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

তাই সাবধান আর সর্বদা প্রার্থনা

ঠাকুর বাড়ি। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। এখন প্রভাত পাঁচটা। শ্রীম দ্বিতলের নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইলেন দক্ষিণ দরজা দিয়া। গায়ে ওয়ার ফ্লানেলের পাঞ্জাবী, পরণে গামছা। শরীর শীর্ণ। উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়। প্রসন্ন বদন। প্রাতঃকৃত্য সমাপনের জন্য তিনি একতলায় নামিতেছেন।

আজ ৯ই মে ১৯৩২ খ্রীঃ মঙ্গলবার, বৈশাখ শুক্লা চতুর্থী, ১৩৩৮ সাল।

সুখেন্দু অনেকক্ষণ ধরিয়া শৌচাগারে। শ্রীম তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আসুন, আমরা যাব। কণ্ঠস্বর বড় করুণ — যেন বালকের ভাব — পরমহংস অবস্থা।

শ্রীম কলতলায় পাউডার দিয়া মুখ ধুইতেছেন। তারপর জিভছোলা দিয়া জিহ্বা পরিষ্কার করিলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ঠাকুর জিভ্‌ছোলা ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। তদবধি উহা নিত্য ব্যবহার করেন।

অন্তেবাসী পাশের গলিতে বেড়াইতেছিলেন। বাড়িতে ঢুকিতেই শ্রীম বলিলেন, যান এবার আপনারা। প্রাতঃকৃত্য সেরে নিন্‌। এখন সব খালি। অন্তেবাসী রাত্রিতে এখানে ছিলেন।

শ্রীম-র দৌহিত্র লালু আসিয়া সংবাদ দিল, গত রাত্রিতে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। মর্টন স্কুলের বাড়িতে, শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পৌত্র অরুণের বিবাহ ছিল। শ্রীম যান নাই। তিনি সকল সংবাদ লইতেছেন। তারপর লালুকে একটা গামছা দিলেন কাচিতে।

তিনতলার ছাদে বসিয়া একজন সাধু মনোরঞ্জনের সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। শ্রীম আসিয়া উপস্থিত, হাতে কথামৃতের প্রুফ,

'শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সংবাদ'। পঞ্চম ভাগ ছাপা হইতেছে। অন্তেবাসীর হাতে ঐ প্রুফ দিয়া বলিলেন, আপনি একবার দেখে দিন।

ঠাকুরঘরের ছাদ মেরামত হইবে। শ্রীম মনোরঞ্জন ও বলাইকে নিয়া সে বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। একটি সমস্যা — ঠাকুর, ঘরে যেমন আছেন তেমনি থাকিবেন। অথচ ছাদ মেরামত করা চাই।

অন্তেবাসী প্রুফ দেখিয়া শ্রীম-র হাতে দিয়া বলিলেন, এখন মঠে যাব।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাঁ, কিছু মিষ্টি নাই, আন না, দাও এঁকে খেতে।

হাঁ, এঁকেও দেখাও দিকিন্, খিলানে ফাট আছে কি না।

অন্তেবাসী — হাঁ, একটু আছে।

শ্রীম — না, যেকালে ইঁট ঝুলে পড়ে নাই, ওটা সামান্য।

শ্রীম এখন 'নাটমন্দিরে'। ছাদে যাওয়ার দরজায় পিছন দিয়া কম্বল-আসনে বসিয়াছেন দক্ষিণাস্য। শ্রীম-র বাম হাতে বসা অন্তেবাসী, পশ্চিমাস্য। কথোপকথন হইতেছে।

শ্রীম — দেওঘরে খুব গরম।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে হাঁ, খুব গরম। এক শ' আঠার পর্যন্ত আমি রেকর্ড করেছি। বৃষ্টি পড়ায় এখন একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। আপনি একবার যাবেন চেঞ্জে? বিদ্যাপীঠেই থাকবেন। সুব্যবস্থা অনায়াসে হবে। সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ পরম আহ্লাদে সেবা করবেন।

শ্রীম — এখন কোথায় যাই বল — মৃত্যুশয্যায়। এই বেদনাটা বড়ই কষ্ট দিচ্ছে। এখন আর অন্য কাজ করতে দিবেন না। হাঁ, অন্য চিন্তা করতে দিবেন না। বলছেন, সব ছেড়ে আমার চিন্তা খালি কর। নানান খানা করতে বারণ করছেন।

অন্তেবাসী — আচ্ছা, বই লিখতে গেলে যদি যন্ত্রণা বাড়ে, তা হলে বই নাই বা লিখলেন? 'কথামৃত' চার ভাগ তো রয়েছে। লোক এইগুলিরই সাধন করুক না! সাধারণ লোক খালি রেফারেন্স খোঁজে — সমাজসেবা, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোথায় কি

বলেছেন ঠাকুর। সাধনের কথায় পূর্ণ, তা দেখবে না।

শ্রীম — চার ভাগই সব সাধনের কথা।

তবে ওদেরও কল্যাণ হবে। কি করবে, সকলে তো এক ক্লাসে পড়ে না। যাকে যেখানে রেখেছেন তিনি। থাক্ থাক্ আছে।

কারো এমনি potentiality (শক্তি) আছে যে, তাকে যদি বি.এ. ক্লাসে বসিয়ে দেয়, সেখানেও সে বেশ পারবে। কিন্তু দিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। কেরমে কেরমে (ক্রমে ক্রমে) এগুবে। যেকালে দিচ্ছে না, বুঝতে হবে এর অর্থ আছে।

সকলে কি ধরতে পারে ঐ message (বাণী)! 'সা রে গা মা পা ধা নি' — ঠাকুর বলেছেন, সব 'নি' থেকে। অপরে 'নি'তে সর্বদা থাকতে পারে না।

তবে কেন সমাধিস্থ পুরুষ নিচে নেমে আসেন? — না, তাঁকে দেখে, তাঁর সঙ্গে মিশে, তাঁর সেবা করে, লোকদের সাহস হবে, ভরসা হবে। 'নি'তে সর্বদা থাকলে শরীর থাকে কই?

তাঁর message (বাণী) সকলে ধরতে পারে না।

Verily I say unto you, They have their reward. ক্রাইস্ট বলেছিলেন, যেমনি কর্ম তেমনি ফল নিশ্চয় পাবে।

He that is able to receive it, let him receive it — এ-ও ক্রাইস্টের কথা। যাদের শক্তি আছে তারাই ধরতে পারে কথার অর্থ। সকলে কি আর পারে?

একজন সাধু — কৌষিতকী উপনিষদে আছে এই কথা। মহর্ষি কশ্যপ ইন্দ্র ও বিরোচনকে একই উপদেশ দিলেন — 'অক্ষিণী যো পুরুষঃ স ব্রহ্ম'। বিরোচন বুঝলেন, দেহই ব্রহ্ম। ইন্দ্র বুঝলেন, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম।

শ্রীম — সন্ন্যাসের আদর্শ বড় কঠিন। ঠাকুরের উপদেশ আগাগোড়া সন্ন্যাসের। 'কথামৃতে' আগাগোড়া সন্ন্যাস।

তবে কতকগুলিকে direct (সোজাসুজি) বলেছেন, তারা ধরতে পারবে বলে। কতকগুলিকে indirect (ঘুরিয়ে) বলেছেন, তারা ভয়

পাবে বলে। এ যেন কলার ভিতর কুইনাইন। তাঁর কথা সব সন্ন্যাসের কথা।

কেবল সন্ন্যাস বড় কঠিন — যেন নির্জলা একাদশী।

(সহাস্যে) ঠাকুর বলেছিলেন, গোষ্ঠ বড় মুস্কিলে পড়েছে। বৃন্দাবনে সে বৃকোদ ভেক নিয়েছে। বৈষ্ণব মতে, উহা সন্ন্যাস। এখন সন্ন্যাস রাখতে পারছে না। তাই এর কাছে যায়, ওর কাছে যায় ব্যবস্থার জন্য ভেক ত্যাগের। পণ্ডিতরা বলেন, তা হয় না। শেষে কে একজন বুঝি বললে, হাঁ হবে। তবে এতো কাহণ কড়ি দিতে হবে। সে কড়ি কড়িকাঠের মত উঁচু (হাস্য)। গোষ্ঠ অনেক কষ্টে তা জোগাড় করলে — determined (দৃঢ় সংকল্প) কিনা। তারপর ভেক ছাড়ে।

এমনি আদর্শ। তাইতো এত কঠিন নিয়ম ছিল। বার বছর old sights and scenes-এর (পূর্বাশ্রমের) কাছ থেকে দূরে থাকবে। এর কাছে থাকলেই মনকে টেনে নিচে নামিয়ে দেয়।

তা' না করে চাঁদার খাতা নিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘোরা। যুবতী মেয়েদের দেখা, তাদের সঙ্গে কথা কওয়া। হয়তো, শেষে একটা মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো।

তাই সর্বদা শাস্ত্র বলছেন, 'সঙ্গং ত্যক্ত্বা' — অর্থাৎ old association (পূর্বের সংশ্রব) ছেড়ে দূরে থাক। Environment-এর influence (পরিবেশের প্রভাব) খুব বেশী। মন কাঁচা। তাই মনকে টেনে নিয়ে যায় ভোগের দিকে।

তবে যাঁর ভগবান-দর্শন হয়েছে তাঁর ভয় নাই। তাঁর মন তিনি সর্বদা একভাবে রাখতে পারেন। সৎ গুরু যিনি, তিনি এই সব point out (দেখিয়ে সাবধান) করেন। তাঁর insight (অন্তর্দৃষ্টি) আছে।

একজন ভক্ত (স্বগত) — অন্তর্দৃষ্টি মানে কি পরমাত্মাতে দৃষ্টি? শ্রীম কথার সঙ্গে সঙ্গে মনকে পরমাত্মায় পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন। কি শক্তি!

অন্তেবাসী — আচ্ছা, এই insight (আত্মদৃষ্টি) গুরু কৃপাতেই তো লাভ হয়?

শ্রীম — হাঁ, গুরু বই এই দৃষ্টি কার আছে? শিষ্যের মন কাঁচা।

যিনি নিজের মনকে নিজে জানেন, তিনি তো সিদ্ধ পুরুষ। নির্জনে ধ্যান করলে নিজের মনের ভিতর কি আছে তা ধরা পড়ে। সংস্কারগুলি তখন জাগ্রত হয়। ভাল হলে ধরে থাকা। খারাপ হলে সাবধান হওয়া ঐগুলি থেকে।

ঠাকুর বলেছেন, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক। এখন আত্মা অর্থে ব্রহ্মাই বল আর ঈশ্বরই বল। মন বুদ্ধি শুদ্ধ হলে, মনের mindness (মনত্ব) থাকে না, বুদ্ধির বুদ্ধিত্ব থাকে না। একমাত্র আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরই থাকেন। তাই বলেছেন এই কথা। কাঁচা মন থাকলেই সংশয়। আর 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'।

'জ্ঞান জ্ঞান' করে লোক। জ্ঞান অর্থে কি কতকগুলি পড়া জ্ঞান, শাস্ত্র জ্ঞান? It is a misnomer (এটা শব্দের অপপ্রয়োগ)। জ্ঞান মানে ঈশ্বরকে জানা — দর্শন করা।

পাঁচ জনে মিলে একটা কিছু করছে বা বলছে। এতেই ভুলে যায় মানুষ। কত drawback (বিঘ্ন) আছে।

ঠাকুর বলতেন, ঐ ঘাটে ডুব দিলে বাণলিঙ্গ শিব পাওয়া যায়। এখন রাস্তায় আটকে গেল যেতে যেতে। ডুব দেওয়া আর হলো না। যেমন এখান থেকে একজন শ্যামবাজার যাচ্ছে। রাস্তায় যাত্রা গান হচ্ছে দেখে, গলিতে ঢুকে তাই দেখতে লাগলো। আর যাওয়া হলো না।

তাই সর্বদা সাবধান, আর প্রার্থনা। Old environments (পূর্ব সংস্কার) টানে। তাই অত কড়া নিয়ম। কর্ম, ভোগ-বাসনা এই সব মনকে টেনে নীচে নামিয়ে দেয়।

অন্তেবাসীর হাতে প্রসাদী ফল মিষ্টির ঠোঙ্গা। একটু মুখে দিতেছেন আর এই গুরুগম্ভীর কথা শুনিতেছেন। প্রসাদ প্রায় সবটা রহিয়া গিয়াছে। তাই শ্রীম বলিলেন, তুমি এটা সব খেয়ে ফেল।

শ্রীম উঠিয়া পায়চারী করিতেছেন। শরীর আধখানা লাল পেড়ে কাপড়ে ঢাকা। অন্তেবাসী তাড়াতাড়ি খাইয়া শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরঘরে চুপি দিতেই শ্রীম বললেন, হাঁ ঠাকুরকে প্রণাম করে যাও।

অন্তেবাসী কাপড় ছাড়া নয় বলিয়া 'নাটমন্দিরে' সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ পাদুকা ঠাকুর পরেছিলেন? শ্রীম বলিলেন, হাঁ। শ্যামপুকুরে চার পাঁচ দিন পায়ে দিছলেন — আমরা নিয়ে গিছলাম।

'আসি' বলিয়া তিনি মঠে রওনা হইলেন। শ্রীম বলিলেন, হাঁ, আবার এসো। শ্রীম বিনয়ের জন্য বৈদ্যনাথের পেঁড়া প্রসাদ দিলেন। অন্তেবাসী রাস্তায় চলিতেছেন আর ভাবিতেছেন শ্রীম-র উপদেশ — 'সর্বদা সাবধান আর প্রার্থনা'।

বেলুড় মঠ।
৯ই মে ১৯৩২ খ্রীঃ, মঙ্গলবার।
বৈশাখ, শুক্লা চতুর্থী, ১৩৩৮ সাল।

পরিশিষ্ট

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম-র দ্বিতীয় দর্শনে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সংসারের সব কাজ করবে কিন্তু মন ফেলে রাখবে ঈশ্বরে। বলিয়াছিলেন, বড় ঘরের দাসীর মত সকলের সেবা করবে। কিন্তু মন পড়ে থাকবে ঈশ্বরে। মনে করবে এরা আমার কেউ নয়। আমিও এদের কেউ নই। ঈশ্বরই আমার এবং এদের অনন্তকালের বন্ধু।

ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করিয়া সংসারে থাকিলে চিত্তে সর্বদা শান্তি সুখ ও আনন্দ থাকে। শ্রীকৃষ্ণও গীতামুখে অর্জুনকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, যাহার মন ঈশ্বরে নাই তাহার বুদ্ধি ও সদ্ভাবনাও নাই। যেখানে সদ্ভাবনা নাই সেখানে শান্তি নাই। যাহার শান্তি নাই তাহার সুখ নাই।

অর্জুনকে আবার বলিলেন, ভগবান সকলের মধ্যে অবস্থান করেন এবং মানুষের মন-বুদ্ধিকে পরিচালনা করেন। তুমি সর্বপ্রকারে তাঁহার শরণাগত হও। তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় হৃদয়ে সর্বদা পরম শান্তি উপভোগ করিতে পারিবে আর শাশ্বত স্থান লাভ করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় শ্রীম বুঝিয়াছিলেন, শাশ্বত শান্তি ও সুখের খনি শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে। তাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায়, আর নিজের চেষ্টায় ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত ভালবাসা অর্জন করিয়া সর্বাবস্থায় হৃদয়ে শান্তি সুখ আনন্দ উপভোগ করিতেন। সাংসারিক নানা কর্ম ও বিপত্তির ভিতর আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার হৃদয়ে সর্বদা শান্তি বিরাজ করিত।

একবার কোনও নিকটতম আত্মীয়ের কঠিন রোগের সময়ও নিত্য সমাগত সাধু ভক্তমণ্ডলীর নিকট তিনি তাঁহার স্বভাসিদ্ধ প্রশান্ত মনে

ভগবদগুণগান কীর্তন করিয়াছিলেন দীর্ঘকাল ধরিয়া। শ্রীম-র সেই সময়ের চেহারা, চোখ-মুখাদি দেখিয়া এবং তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর উপদেশ-বাণী শুনিয়া ঘুণাক্ষরেও কেহ বুঝিতে পারিত না যে বাড়িতে নিচের তলায় এই বিপদ।

তাঁহার দৈনন্দিন কর্মজীবনেও দেখিয়াছি, কখনও তাঁহার মন হইতে ঈশ্বরজ্ঞান বিলুপ্ত হইত না। বিদ্যালয়ের পরিচালনার নানাবিধ সমস্যার সম্মুখেও তাঁহার মন প্রশান্ত থাকিত।

নিত্য সান্ধ্য সভায় তাঁহার মুখ হইতে ঈশ্বরীয় গুণগান যেন নির্ঝরের মত প্রবাহিত হইত। আর তাহাতে সংসারসন্তপ্ত ভক্তগণের চিত্ত শান্ত হইয়া যাইত।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও আশীর্বাদে শ্রীম নিজেকে অকর্তা জানিয়া ঠিক কর্তার মত সর্ব কার্য সম্পাদন করিতেন। অশান্তির যথেষ্ট কারণ থাকিলেও তাহা শ্রীম-র মনে স্থান পাইত না। ভক্তরা অবাক হইয়া ভাবিতেন অশান্তির বিকট মূর্তিকে প্রশান্ত সমুদ্রে অগাধ জলে কি করিয়া শ্রীম নিমেষে নিমজ্জিত ও বিলীন করিয়া দেন।

মানুষ যদি মনে করে কায়মনোবাক্যে, সে শ্রীভগবানের দাস এবং দাসবৎ স্বেচ্ছায় সংসারের ভোগ গ্রহণ না করে, যতটা না নিলে শরীর ধারণ হয় না, কেবল ততটা ভোগ নেয় এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, — যেমন বড় ঘরের দাসী মনিব-গৃহিণীর প্রদত্ত আহার বস্ত্র বাসস্থান লইয়া সন্তুষ্ট থাকে, — তাহা হইলেই সর্বদা শান্তি বিরাজ করিতে পারে।

যথার্থ ভক্তগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, ভগবানই কর্তা মানুষ অকর্তা। তাই তাঁহারা ভগবানের প্রদত্ত এই শরীর-মন-বুদ্ধিরূপ যন্ত্র দ্বারা উপার্জিত সমগ্র শুভাশুভ ফল ভগবানে অর্পণ করেন। যেমন কোনও বিশ্বস্ত কর্মচারী সর্বান্তঃকরণে মনিবের কর্ম করে আর ভাবে, এই কর্ম লাভ হইলেও মনিবের লাভ, লোকসান হইলেও মনিবেরই লোকসান। আমি যন্ত্র মাত্র। ভক্ত মনে করেন, আমি যন্ত্র ঈশ্বর যন্ত্রী। এই যন্ত্রের দ্বারা কৃত ফলের মালিক মনিব, যন্ত্র নহে। এইরূপ বুদ্ধিতে

সর্বকর্ম সম্পাদন করিলে চিত্তে সর্বদা শান্তি থাকে।

সংসারের ঘোর ঝঞ্ঝাবাতেও শ্রীম-র এই দাসীবৎ, যন্ত্রবৎ আচরণের জন্য তাঁহার চিত্তে শান্তি সুখ আনন্দ বিরাজ করিত।

সাধারণ লোকের চিত্তে শান্তি স্থায়ী হয় না কেন? তাহার কারণ এই, তাহারা মনে করে, জগৎ আগে পরে ঈশ্বর। এইজন্যই তাহাদের অশান্তি। সত্যকার ভক্ত মনে করে আগে ঈশ্বর পরে জগৎ।

ঈশ্বরবিমুখী ব্যক্তিগণ মনে করে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানাদির সুব্যবস্থা হইয়া গেলেই শান্তি। হাঁ, শান্তি বটে, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী! মানুষের মনের স্বাভাবিক কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিগুলির দমন না হইলে কি করিয়া শান্তি সম্ভব? তাই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, বর্তমান সময়ে বিশেষ করিয়া, ধনসম্পদে অতি ঐশ্বর্যবান জাতির লোকেরাও অশান্ত।

ভারতের ঋষিগণ সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন মানুষের এই স্থূল শরীর ছাড়াও আরও দুইটি শরীর পর পর রহিয়াছে — সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর। তাহার পর মহাকারণ বা অন্তর্যামী।

স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, — এই তিনটি শরীরেরই আহার চাই। স্থূল শরীরের আহার অন্ন-বস্ত্রাদি। সূক্ষ্ম শরীরের আহার বিদ্যাদি উপার্জন — যাহার দ্বারা বিচারশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি। আর কারণ শরীরের আহার, জীবের ভগবানের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা। ইহাকেই সাধারণ কথায় বলে — পূজা পাঠ জপ ধ্যান। এই তৃতীয়টি দিয়া শান্তির অফুরন্ত খনি মহাকারণের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। ঋষিরা তাই উপদেশ দিয়াছেন —

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥ (ঈশাবাস্যোপনিষদ-১)

বর্তমান জগতের পরাক্রান্ত রাজশক্তি ঋষিদের এই ব্যবস্থার অপপ্রয়োগ করার জন্যই বাহ্য জাগতিক বিষয়ে বুদ্ধির অতি উৎকর্ষ লাভ করিয়াও অশান্ত। তাহারা দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দেওয়ায় কামক্রোধলোভাদিকে বশীভূত করিতে সমর্থ নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ পরম সুহৃদরূপে জগতের অতি ঐশ্বর্যশালী

আমেরিকাবাসীদিগকে এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তোমরা এখন ঐশ্বর্য ও জাগতিক ভোগের চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছ। দেখিতেছ ইহাতে চিত্ত শান্ত না হইয়া দিন দিন অশান্ত হইতেছে। এই অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিবার এই একটি উপায়। বন্ধুগণ, তোমরা এখন আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ কর। তাহা হইলে এই অতুল ঐশ্বর্যের ভিতর থাকিয়াও অধৈর্য হইবে না, মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারিবে। কাম-ক্রোধাদি রিপুর সীমানার বাহিরে মনকে লইয়া গিয়া শান্তির খনি পরমাত্মার সহিত মিলিত করিয়া দিতে পরিবে। তখন কাম-ক্রোধাদি তোমাদের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবে না, তোমাদের মনকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

ঋষিদের এই মহাবাণী যুগে যুগে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট আদি দেবমানবগণ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। এই সেদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও সেই প্রতিধ্বনিতে আপনার কণ্ঠস্বর মিলাইয়া দিয়াছেন। তিনি স্নেহময়ী জননীর মত আকুল প্রাণে ব্যাকুল অন্তরে জগৎবাসীকে বলিতেছেন — জগতের মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া সর্ব কার্য কর। উপলক্ষ্য নরেন্দ্র ও মহেন্দ্র।

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদদিগকে দেখিয়াছি, শাশ্বত শান্তি-সুখ অন্বেষীকে তাঁহারা সর্ব্বদা এই উপদেশ দিতেছেন — আগে ঈশ্বর পরে জগৎ। আগে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার লুপ্ত নিত্য নিজ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর। আগে তুমি নিজে শান্তি লাভ কর, পরে অপরকে এই শান্তিলাভের উপদেশ দাও, শান্তিলাভে সহায়তা কর।

লিগ্-অব-নেশানস্, ইউনাইটেড নেশানস্ অত চেষ্টা করিয়াও কেন জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ? লিগ-অব-নেশানস্ রণে ভঙ্গ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইউনাইটেড নেশানসের ঐ দুরবস্থা অদূরে দেখা যাইতেছে। যাহারা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা কি নিজের ভিতর শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে? তাহারা, কি কাম-ক্রোধ-লোভাদি মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে দমন করিতে পারিয়াছে?

যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে কি করিয়া জগতের শান্তি দিতে পারিবে? তাহাদের এই চেষ্টা আপাত শ্রুতিমধুর হইলেও বস্তুতঃ বিফল চেষ্টা।

নেপোলিয়ান সেন্ট হেলেনাতে বলিয়াছিলেন, আলেকজাণ্ডার, সিজার ও আমার সাম্রাজ্য আমাদের জীবিতাবস্থাতেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে কিন্তু ক্রাইস্টের সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুতে আরম্ভ হইয়াছে। আর দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। কে শুনে তাঁহার এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ?

ভারতীয় ঋষিগণ বলেন, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় না। ঈশ্বর আর সাম্রাজ্য একসঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে। কারণ এই বিশ্বসাম্রাজ্যের একমাত্র অধিপতি ঈশ্বর। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিষ্ফল।

পশ্চাত্যের মনীষীগণ — ম্যাকসমূলার, রোমাঁ রোলাঁ, এ্যালডাস্ হাক্সলি প্রভৃতি, ভারতের ঋষিদের চিরাচরিত ব্যবস্থাই অবশেষে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন, জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠা তাঁহারাই করিতে পারিবেন যাঁহারা নিজে শান্তিলাভ করিয়া, নিজের স্বরূপ জানিয়া ঋষিত্বপদ লাভ করিয়াছেন, সর্বজীবে শ্রীভগবানকে দেখিতে পাইয়াছেন। ভারতের আদর্শ সম্রাটগণও ঋষি ছিলেন।

ব্যক্তির, জাতির ও জগতের শান্তিলাভের পথ এই সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নূতনভাবে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীম দর্শনে তাঁহার ঐ উপদেশেরই প্রতিধ্বনি শ্রীম-র মুখে শুনিতে পাইবে। শ্রীম বলিতেছেন, আগে ঈশ্বরে ভক্তিলাভ কর। আগে নিজে শান্ত হও। পরে অপরকে বা জগতকে শান্ত কর।

শ্রীম দর্শনের সপ্তম ভাগের বৈশিষ্ট্য এই — আগে ঈশ্বর পরে জগৎ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট

(শ্রীম ট্রাস্ট)-এর

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিগত ১৯৬৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীম-ট্রাস্ট স্থাপিত হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য জনতা-জনার্দনের সেবা এবং ভারতীয় ঋষি ও মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক জনজীবনের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পারমার্থিক পুনরুজ্জীবন, — বিশেষভাবে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পরমপ্রিয় পার্ষদ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) মহোদয়ের দৈনন্দিন কথোপকথনের সংকলন পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া এক বিরাট জ্ঞান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান। 'শ্রীম-দর্শন'-রূপ পবিত্র সাগরসঙ্গমে অবগাহন করিয়া সংসার-দাবানলে জর্জরিত অগণিত মানবের জীবনে নব চেতনালাভের সুযোগ প্রদান।

এই ট্রাস্ট আইন সম্মতভাবে রেজেস্ট্রীকৃত ও আয়কর বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত। সুতরাং এই জনকল্যাণ-প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য করিলে সেই দানের উপর কোন আয়কর দিতে হয় না।

যে কোন দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়।

'শ্রীম-দর্শন'এর হিন্দী এবং ইংরেজী অনুবাদও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

প্রধান কার্যালয় ঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট (শ্রীম-ট্রাস্ট)

৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি

চণ্ডীগড়

প্রকাশকের নিবেদন*

শ্রীম-দর্শনের অনুবাদ হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। হিন্দী শ্রীম-দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেইরূপ শ্রীম-দর্শনের ইংরাজী অনুবাদ 'M.' the Apostle and the Evangelist-এরও প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে। ক্রমশঃ বাকী খণ্ডগুলি অনুদিত হইয়া পর পর প্রকাশিত হইবে।

যে কোন বন্ধু যে কোন ভাবে এই শ্রীম-দর্শন প্রকাশনের সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

বিনীতা
ঈশ্বর দেবী গুপ্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রীম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চণ্ডীগড়

* প্রথম সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

শ্রীম-দর্শনের এই সপ্তম ভাগে অন্যান্য ভাগের মত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশেরই প্রতিধ্বনি শ্রীম-র মুখে শুনিতে পাইবেন। শ্রীম বলিতেছেন, আগে ঈশ্বরে ভক্তিলাভ কর, আগে নিজে শান্ত হও, পরে অপরকে বা জগতকে শান্ত কর।

এ ভাগের বৈশিষ্ট্য এই — আগে ঈশ্বর পরে সব।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
ঋষিকেশ (তুলসী মঠ)
শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি, ১৩৭৭
১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সেবাসংযম-প্রতিমা মা ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

সকল ধর্মের মিলনমন্দির জগন্নাথ পুরী ১০

তৃতীয় অধ্যায়

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সন্দেশ ২৪

চতুর্থ অধ্যায়

'বেশ করেছ বেশ করেছ বেশ করেছ' ৩৬

পঞ্চম অধ্যায়

এখানে পেলা নাই ৪২

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বর ও বিশ্বশান্তি ৫৫

সপ্তম অধ্যায়

জীবশিব সেবায় নিয়োজিত ব্রহ্মজ্ঞ নরেন্দ্র ৬৪

অষ্টম অধ্যায়

সন্ধিস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ ৭৫

নবম অধ্যায়

মঠের শিক্ষাই ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ ৮২

দশম অধ্যায়

কাব্যরস ও ব্রহ্মানন্দ — কালিদাস ও শেক্সপীয়র ১০০

একাদশ অধ্যায়

স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মরণে ১১২

দ্বাদশ অধ্যায়

বিস্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ ১১৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেদ যেন বোবার গোঙানি ১২৭

চতুর্দশ অধ্যায়

সুখও আমার নয় দুঃখও আমার নয় ১৩৮

পঞ্চদশ অধ্যায়

সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয় বিপদে ১৪৯

ষোড়শ অধ্যায়

সেই অভাব পূর্ণ হলো ঠাকুরের দর্শনে ১৫৬

সপ্তদশ অধ্যায়

অস্পৃশ্য রস্‌কের উদ্ধার ১৬৬

অষ্টাদশ অধ্যায়

তীর্থ ও তপস্যা — ঋষিকেশ ও স্বর্গাশ্রম ১৮০

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিশ্রান্তির অবসরে ১৯৬

বিংশ অধ্যায়

যাবৎ কায়া তাবৎ মহামায়া ২১২

একবিংশ অধ্যায়

বিজয়ায় সাধু সম্মিলনে ২২৩

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আমায় ছেড়ে কোথায় যাবে তীর্থে ২৩৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আপনারা ঠাকুরের বাণীর মূর্ত বিগ্রহ ২৪৭

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সাধুসঙ্গ যেমন মরূদ্যান ২৫৪

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ঠাকুর দ্বারে দাঁড়িয়ে, হাতে অমৃত ভাণ্ড ২৬৮

ষড়বিংশ অধ্যায়

বজ্রকঠোর কুসুমকোমল সাধুর হৃদয় ২৮৪

সপ্তবিংশ অধ্যায়

তাই সাবধান আর সর্বদা প্রার্থনা ২৯০

পরিশিষ্ট ২৯৬

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

(সপ্তম ভাগ)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রী ম ট্রাস্ট

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট

৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চণ্ডীগড় - ১৬০০১৮

প্রকাশক ঃ
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রী ম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চন্ডীগড় - ১৬০০১৮
ফোন ঃ ০১৭২-২৭২৪৪৬০
Website : http://www.kathamritra.org

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

পঞ্চম সংস্করণ
নাগপঞ্চমী
২৭শে আষাঢ়, ১৪১৬
(১২ই জুলাই, ২০০৯)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি - ১১০০১৯
ফোন ঃ ০১১-৪১৬০৩৯৯৬ / ৯২১৩১৩৪৪৮৭

মুদ্রক ঃ
শ্রী অরবিন্দ গুপ্ত
প্রিন্ট ল্যান্ড, কাশ্মীরি গেট, দিল্লী
ফোন ঃ ০৯৯১১৩৮৬৭১৬/০৯৮১০০৮৬৭১৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা (Subsidised)

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

(সপ্তম ভাগ)

শ্রীম - দর্শন ❁ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

৮

নিবেদন

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খন্ডে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর স্বামীজীপ্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর আছে 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃত'-র ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

শ্রীমতি ঈশ্বরদেবী গুপ্তা শ্রীম-দর্শনের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন যাহাতে হিন্দী ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন। পরে এই গ্রন্থ 'M - the Apostle and the Evangelist' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত ধরমপাল গুপ্ত মহাশয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্বভার 'শ্রী ম ট্রাস্ট'-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি ট্রাস্ট এই গ্রন্থরাজি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ ও ভক্ত সমাজ অক্লান্ত সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কল্পতরু দিবস

১৬ই পৌষ, ১৪১৪ — বিনীত

(১লা জানুয়ারী, ২০০৮) — প্রকাশক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজ্যপাদ্য স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ যখন শ্রীম-দর্শন রচনায় হিমালয়ের কোলে হৃষিকেশের 'তুলসী মঠ' আশ্রমে সাধনারত ছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলীন পরমারাধ্য স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজও ঐ মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদপুষ্ট সৌভাগ্যবান তাপস স্বামী সারদেশানন্দজী তাঁকে এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের এই অকৃপণ স্নেহপরায়ণ সহায়তায় শ্রীম-দর্শন রচনা সম্ভবপর হয়। শ্রী ম ট্রাস্ট এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সেবকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই অপরিশোধ্য ঋণ স্মরণ করেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাজা মহারাজ)

জন্ম ১৮৬৩, মহাসমাধি ১৯২২

স্বামী বিবেকানন্দ (স্বামীজী)

জন্ম ১৮৬৩, মহাসমাধি ১৯০২

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী

জন্ম ১৮৫৩, মহাসমাধি ১৯২০